বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
২

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড ॥

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

ধ্যানস্থ দেখে বললুম, ও নরেন্দ্র। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই এক রূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছ। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। বচনবাগীশরা বক্তৃতা করুক। নাম যশ আর কামিনীকাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর থাক। আমরা যেন ব্রহ্মলাভের জন্যে—ব্রহ্ম হওয়ার জন্যে দৃঢ়ব্রত হই।

বিবেকানন্দ

গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যা।

বিবেকানন্দ

ভূমিকা

জন্ম থেকে শুরু করে আমেরিকায় রওনা হওয়া পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে প্রথম পাড়ি।

'ইংলণ্ড আমরা ধর্মবলে জয় করব, অধিকার করব ধর্মবলে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সভাসমিতি করে কি এ দুর্দান্ত অসুরের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে? অসুরকে দেবতা করতে হবে। আমার এই এখন মহামন্ত্র, ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়। তাতেই দেশের কল্যাণ। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আমাদেরও সমস্ত জগৎ জুড়ে আমাদের ধর্মাদর্শগুলি প্রচার করতে হবে।'

সমস্ত জগৎকে বলতে হবে হিন্দুর ঈশ্বর সর্বভূতময়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা। মানুষ ছাড়া তিনি কিছু নন। সমত্বদর্শনই হিন্দুর ঈশ্বর-আরাধনা। যে আত্ম-সাদৃশ্যে সর্বত্র সমান দেখে সেই ঈশ্বরে পরমযুক্ত। তাই হিন্দুর বেদান্তই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি। মনুষ্যপ্রীতিই ঈশ্বর ভক্তির মূল।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন পূজিছে ঈশ্বর॥

'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। খালি পেটে ধর্ম হয় না, বলতেন না গুরুদেব? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, আমরা আজ চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দুপা দিয়ে দলেছি। এরা না উঠলে দেশ জাগবে না। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলি সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোনো বড় কাজ হয় না। তোরা সব কী করলি বল দেখি? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলি না? আর জন্মে এসে বেদান্তফেদান্ত পড়িস—এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা।'

বিবেকানন্দের ডাক তাই পরম বিস্তারের ডাক। বিবেকানন্দের গৌরব সত্যের গৌরব, প্রেমের গৌরব, মঙ্গলের গৌরব, কঠিনবীর্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের গৌরব।

অচিন্ত্যকুমার

আঠারোশ তিরানব্বুই সালের একত্রিশে মে জাহাজ ছাড়ল স্বামীজির। তাঁর বয়েস তখন ত্রিশ বছর সাড়ে চার মাস।

দণ্ড কমণ্ডলু আর কৌপীন যাঁর একমাত্র সম্বল জাহাজে তাঁকে এক বিস্তীর্ণ লটবহর সামলাতে হচ্ছে, পোশাকের আর বিছানার, ট্রাঙ্ক আর ওয়ার্ডরোববোঝাই যত বিচিত্র আচ্ছাদন। এ সব কি আমার কর্ম! এ সবের তদারক করতে-করতেই কি সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, মহাকালের নির্দেশ পালন করতে চলেছি—আর ঠাকুর বলে দিয়েছেন, যখন যেমন তখন তেমন।

অন্তর্জ্যোতির্ময় দীর্ঘদেহ পুরুষ, সিংহের মত বিচরণ করছে। স্বয়ং কাপ্তেন পর্যন্ত আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না। নিজের থেকে জুড়ে দিয়েছে গল্প, জাহাজের কলকব্জা এটা-সেটা সব বোঝাচ্ছে সযত্নে আর সবতাতেই স্বামীজির শিক্ষার্থীর মত কৌতূহল। যাত্রীদের সঙ্গেও আলাপ জমে গেছে, আলাপের থেকে অবধারিত বন্ধুত্ব। বিদেশী খাদ্য বিদেশী রীতি-পদ্ধতি বিদেশী পরিবেশ, তবু খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হল না। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ মনের কাছে কোনো সংস্কারই বন্ধন নয়।

সাতদিন পরে কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছুল। পুরো একদিন থামবে। স্বামীজি শহর দেখতে বেরুলেন। গাড়ি করে গেলেন প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দিরে যেখানে বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তি—পরিনির্বাণমূর্তি—শুয়ে আছে। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন বুদ্ধকে।

মানুষকেই বড় করেছেন বুদ্ধ, মানুষের মুখকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন দেবতার দিক থেকে, ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজের দিকে, আত্ম-শক্তির দিকে। মানুষ হীন নয় দৈবাধীন নয়, মানুষ তার উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে মহীয়ান।

নিরন্তর চেষ্টা নিরন্তর আগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। হীনবল হীনসাহস না হওয়া। 'কখনো হীনসাহস হবিনি। খেতে শুতে পরতে, গাইতে বাজাতে, কলরোলে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি।

ভাববি আমি কার সন্তান? তবে কেন আমার এই দুর্বলতা? হীনবুদ্ধি হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। এমনি অভিমান সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে মনে কখনো দুর্বলতা আসবে না। মহাবীরকে স্মরণ করবি। তাহলেই মহামায়া কৃপা করবেন।'

বনপথ দিয়ে যাচ্ছেন নারদ, কাহিনী বলছেন স্বামীজি, দেখতে পেলেন একাসনে বসে এক যোগী ধ্যান করছে নিশ্চল হয়ে। তার চারদিকে ছোট-বড় বিচিত্র উইয়ের ঢিবি উঠে গেছে। তবু স্থান বদল নেই যোগীর, এমন অনন্যলক্ষ সাধনা। নারদকে দেখতে পেয়ে যোগী জিগগেস করলে, প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?

নারদ বললে, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি।

তাহলে দয়া করে নারায়ণকে জিগগেস করবেন, আমার আর মুক্তির দেরি কত? সানুনয়ে বললে সেই যোগী।

কতদূর এগিয়েছেন নারদ, আরেক জনের সঙ্গে দেখা। তার সাধন-ভজন কিছু নেই ধ্যান-সমাধির সে ধার ধারে না! সে শুধু লম্ফ-ঝম্ফ করছে আর গান গাইছে। সে গানেও না আছে সুর না আছে তালমান। কণ্ঠস্বরও বিকৃত-কর্কশ। নারদকে দেখে উল্লসিত হয়ে সে জিগগেস, করলে কোথায় চলেছেন প্রভু?

বৈকুণ্ঠে।

বাঃ, তাহলে একবার জিগগেস করবেন তো ভগবানকে, আমার মুক্তির আর কতদিন!

বৈকুণ্ঠ থেকে তারপর যখন ফিরছেন নারদ, সেই বল্মীকস্তূপাবৃত যোগীর সঙ্গে ফের দেখা। যোগী জিগগেস করল, আমার কথা বলেছিলেন নারায়ণকে?

বলেছিলাম।

কি বললেন নারায়ণ?

বললেন, আরো চার জন্ম লাগবে।

আরো চার জন্ম ? বিলাপ করতে লাগল যোগী। এত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এত ক্লেশকৃচ্ছ্র, এত একাগ্রসংযোগ, চারদিকে বল্মীকস্তূপ উঠে গেল, তবু এখনো চার জন্ম বাকি ? যোগী আর্তনাদ করতে লাগল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে সেই নাচুনে লোকটার সঙ্গে দেখা।

কি হে দেবর্ষি, আমার কথা জিগগেস করেছিলে ভগবানকে ?

করেছিলাম।

কি বললেন ? আরো কত জন্ম ?

তোমার সামনে এই তেঁতুল গাছ দেখতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

এর কত পাতা পারছ গুনতে ?

ওরে বাবা, অসংখ্য অগণন—

ও গাছে যত পাতা, ভগবান বললেন, তোমার তত জন্ম বাকি।

আনন্দে নৃত্য করতে লাগল সেই লোক। বলতে লাগল, এত শিগগির ? এত শিগগির ? এত কম জন্ম ? এত অল্প সময় ?

নারদ বিমূঢ়ের মত রইল তাকিয়ে।

সেই লোকটা বলতে লাগল, তবু আমি যে আমি, আমারো তো একদিন মুক্তি হবে, আমিও একদিন পাব সেই পরমপদ। কি মজা! হোক লক্ষ জন্ম, হোক কোটি জন্ম, কোটি-কোটি জন্ম, তবু একদিন আমারো তো হবে সেই অধিকার, তাইতেই আমি কৃতার্থ। আমি কিছুতেই নিরুদ্যম্ নই আমার যাত্রায়, কিছুতেই অবসাদ নেই আমার অধ্যবসায়ে—

বৎস, দৈববাণী হল, এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে উদ্যমশীল যে অধ্যবসায় সম্পন্ন উচ্চতম ফল শুধু তারই প্রাপ্য।

কলম্বো থেকে পেনাঙ, পেনাঙ থেকে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে নামলেন স্বামীজি। গেলেন বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে। কত জাত ও চেহারার পাম-গাছই না এখানে লালিত হচ্ছে। এই সেই রুটিফলের গাছ। মাদ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত এখানেও তেমনি ম্যাঙ্গোস্টিন! ম্যাঙ্গোর সঙ্গে ম্যাঙ্গোস্টিনের কি তুলনা হয় ? আম্র হচ্ছে অমৃতের নামান্তর।

সিঙ্গাপুর থেকে হংকং। হংকঙেই বিশাল চীনের প্রথম আভাস,

এই সেই চীন, স্বপ্ন আর রূপকথার রাজ্য। কে জানে তাদের কর্মচাঞ্চল্যই হয়তো রূপকথা, তাদের কর্মনৈপুণ্যই বুঝি স্বপ্নের মত। জাহাজ পারে নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গেই শয়ে-শয়ে নৌকো এসে হাজির, ডাঙায় নিয়ে যাবে। আর সেই সব নৌকোর মাঝি মেয়ে। নৌকোও অদ্ভুত, দুটো করে হাল। মেয়ে মাঝি একটা হাল হাত দিয়ে আরেকটা হাল পা দিয়ে চালাচ্ছে এক সঙ্গে, ছন্দের এতটুকুও হেরফের হচ্ছে না। আর সব চেয়ে মজা, তাদের পিঠে একটা করে ছেলে বাঁধা, মার যেটা কনিষ্ঠ। ছেলেগুলোর একটুও ভয় নেই, একটুও কান্নাকাটা করছে না, বরং দিব্যি হাত-পা নাড়ছে, তাকাচ্ছে মিটমিট করে। প্রাণপণ শক্তিতে মা-রা নৌকো চালাচ্ছে, বোঝা সরাচ্ছে, এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় লাফিয়ে পড়ছে, যে কোনো মুহূর্তে শিশুটার টিকিওলা মাথাটা গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, তাতে মা ও শিশুর কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে মা যে তাকে একটু করে ভাতের মণ্ড খেতে দিচ্ছে তাইতেই শিশু মহাপ্রসন্ন।

যে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার আর ভয় কি, অভাব কি। রাখতে হলেও মা ফেলতে হলেও মা। মায়ের কাছে যদি আঘাত পাই মায়ের কাছেই আবার উপশম পাব।

এই প্রথম উপলব্ধি হল স্বামীজির, চীন কত দরিদ্র, ভারতবর্ষেরই মত। সভ্যতার যারা ভিত্তি তারা যে সোপান ধরে উঠতে পারছে না উচ্চচূড়ে তার কারণই হচ্ছে দারিদ্র্য, সবচেয়ে যা কঠিন শৃঙ্খল। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় যারা উদ্‌ভ্রান্ত তাদের অন্য চিন্তা করবার সময় কোথায়? পেটে যার ভাত নেই মাথায় তার কি থাকবে?

হংকং থেকে ক্যাণ্টন। শুনলেন এখানে অনেক চীনে মঠ আছে, একটা কোথাও দেখে আসি। খোঁজ নিয়ে জানলেন বিদেশীদের সেই মঠে ঢোকবার অধিকার নেই। অধিকার নেই? স্বামীজির রোক চাপল। কি হয় যদি বিদেশী কেউ ঢোকে? স্বামীজির দোভাষী বললে, খুন করে ফেলে। চলোই না দেখি না, কেমন খুন করে। যারা মঠবাসী তারা বুদ্ধাশ্রয়ী আর তারা নিশ্চয়ই জানে বুদ্ধের জন্ম

হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষ। যদি তাদেরকে জানানো হয় তিনি সেই ভারতবর্ষের একজন হিন্দু সাধু তবে নিশ্চয়ই তারা ছেড়ে দেবে দরজা, আমাকে মনে করবে তাদের সহোদর-সগোত্র।

দোভাষী তবু দ্বিধা করতে লাগল। স্বামীজি বললেন, 'আগেই পালাই কেন, দেখি না তাদের কেমন অভ্যর্থনা।'

কেমন অভ্যর্থনা? ফটকের কাছে যেতেই চার-চারজন মঠবাসী হাতে গদা নিয়ে মার-মার শব্দে তেড়ে এল।

ঐ, ঐ দেখুন। ভীতব্যস্ত দোভাষী পালাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

তার হাত চেপে ধরলেন স্বামীজি। বললেন, 'পালাতে চাও পালাবে, আমি একাই মরব, কিন্তু যাবার আগে বলে যাও চীনে ভাষায় ভারতবর্ষের যোগীকে কি বলে?'

অস্ফুটস্বরে সেই প্রতিশব্দটা উচ্চারণ করে দোভাষী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল।

দূর হতে শঙ্খের ধ্বনির মত ঘোষণা করলেন স্বামীজি, আমি যোগী, আমি ভারতবর্ষের যোগী।

সাপের ফণায় ধুলো পড়ল। যে হাত প্রহারে উদ্যত ছিল তা প্রণামে অবনত হল। আপনি যোগী? আসুন আসুন আমাদের মঠে। আমাদের ধন্য করুন।

মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল দেখে দোভাষী এগুলো ধীরে ধীরে।

বিচিত্রশব্দে লোকগুলো কোলাহল করতে লাগল। একবর্ণ বোঝেন স্বামীজির সাধ্য কি।

শুধু একটা কথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। সে কথাটা হচ্ছে 'কবচ', আর তাদের হাতের ভঙ্গি থেকে অনুমান করতে পারছেন, হিন্দু যোগীর কাছে তারা কবচ চাইছে।

দোভাষীকে জিগগেস করলেন স্বামীজি, 'কবচ কথাটার কি মানে? কি চাইছে ওরা?'

'ওরা কবচই চাইছে, মন্ত্রপূত কবচ, যাতে করে ওরা ভূতপ্রেত বা অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে পারে নিজেদের। আর কিছু নয়, আপনার কাছ থেকেই ওরা ত্রাণ চায় আশ্রয় চায়।'

এই কথা? স্বামীজি পকেট থেকে শাদা কাগজ বের করলেন ও তাকে ভাঁজ করে টুকরো-টুকরো করলেন ও প্রতিটি টুকরোতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন, ওঁ, তত্ত্বাতীত সত্যের যা ঘনীভূত মন্ত্র। প্রত্যেককে দিলেন একটি টুকরো। প্রত্যেকে শ্রদ্ধানত মাথায় তা গ্রহণ করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে, মঠের মধ্যে নিয়ে চলল।

মঠের মধ্যে অগণিত সংস্কৃত পুঁথি, আর কি আশ্চর্য, সেই সব সংস্কৃত বাংলা অক্ষরে লেখা। বৌদ্ধদের যে দারুময় মূর্তি সাজানো আছে, সব যেন বাঙালির মুখ। কত বাঙালি ভিক্ষু না এসেছিল চীনে বুদ্ধের অনির্বাণ নির্বাণবাণীর দীপ নিয়ে। তারা আজও জ্বলছে, আজও জাগছে স্বামীজির চোখে। স্বামীজিকে প্রসন্ননেত্রে আশীর্বাদ করছে।

ক্যান্টন থেকে আবার হংকঙে ফিরলেন স্বামীজি, হংকং থেকে জাপানের অভিমুখে।

প্রথমে নাগাসাকি। নাগাসাকি থেকে কোবে। কোবেতে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে ট্রেন নিলেন, উদ্দেশ্য শুধু বন্দর নয় মধ্যবর্তী প্রদেশটাও একটু দেখি। ওসাকা, কিয়োটো আর টোকিয়ো ঘুরলেন। সমস্ত দেশ শিল্পে-বাণিজ্যে যন্ত্রে-অস্ত্রে চিত্রে-স্থাপত্যে জেগে উঠেছে, মেতে উঠেছে। বড়-বড় পা ফেলে সঙ্গ ধরেছে পশ্চিমের। কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ হিত হবে, সভ্যতার আবাস থেকে দারিদ্র্য নির্বাসিত হবে সমস্ত জাতি এই এক লক্ষ্যে প্রেরিত। ধর্মেও পিছিয়ে নেই। আর আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত মন্ত্র বাংলা হরফে লেখা।

যা কিছু সৎ আর মহৎ, জাপানীদের কাছে, ভারতবর্ষই তার স্বপ্নরাজ্য!

কি করছ তোমরা? ইয়াকোহামায় এসে তার মাদ্রাজী শিষ্যদের লিখছেন স্বামীজি: সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস একবার এদের দেখে যাও, তারপর গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও। ভারতবর্ষের যেন ভীমরতি ধরেছে। দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! হাজার বছরের কুসংস্কারের বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছ, শুধু খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পুরোতগুলির

আহাম্মকির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিরাম অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কী বলো দেখি।

এস, মানুষ হও। আরো লিখছেন বিবেকানন্দ : তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো ? দেশের মানুষকে ভালোবাসো ? তা হলে দুষ্টু পুরোতগুলোকে আগে দূর করে দাও। যাতে আমাদের দেশের উন্নতি হয় তার জন্য লাগো প্রাণপণে। পেছনে চেয়ো না, কাঁদুক প্রিয়জন ; শুধু সামনের দিকে তাকাও, সামনের দিকে এগোও, হোক পথ চড়াই, হোক গন্তব্যস্থল দূরদূরান্তে। সামনে বাড়ো।

ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। কে আছ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেবে, নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার করবে আর যারা পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে পশুর পদবীতে নেমে এসেছে তাদের মানুষ করবার ব্রত নেবে !

ধীর স্তব্ধ অথচ দৃঢ়—এই তিনমন্ত্র সার করে কাজ করো। মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইয়াকোহামা থেকে জাহাজ ছাড়ল। থামল ভ্যানকুভার। কানাডার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে—বৃটিশ কলাম্বিয়া নামে যে দ্বীপ আছে তারই রাজধানী। এখান থেকেই যেতে হবে শিকাগো, ট্রেনে করে, কানাডার ভিতর দিয়ে।

হাড়ে-দাঁত-বসানো শীত। সমস্ত জাহাজ প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে এসেছেন। জামাকাপড় মন্দ ছিল না কিন্তু এই তীক্ষ্ণদংষ্ট্র শীতের কাছে যৎসামান্য। কেউ অনুমানও করতে পারেনি জুন-জুলাই মাসেই এমনি বরফ-গলা ঠাণ্ডা পড়বে।

একটানা ট্রেনে তিন দিনের দিন শিকাগোতে এসে নামলেন স্বামীজি। পথভ্রষ্ট শিশু যেমন করে তাকায় তেমনি করে তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কোন দিকে যাবেন, কোথায় উঠবেন, কি করে সামলাবেন এ সব মালপত্র ! তখন শিকাগোতে ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার বা বিশ্বমেলা বসেছে, তাই শহরে বিস্তর লোকের আমদানি। তাদের

চোখের সামনে স্বামীজি এক কিম্ভূত-কিম্ভুত। গায়ে আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি, এ কি কোনো সার্কাসের ক্লাউন না সাপুড়ে-বাজিকর! রাস্তার ছোঁড়াগুলো পিছনে লাগল, হাততালি দিতে লাগল, কেউ কেউ বা কাটতে লাগল টিটকিরি। যেন অজানা দেশের পথভোলা এক পাগল এসে উপস্থিত হয়েছে। একে শীত তায় অনাহার তায় এ উৎপাত।

'একটা হোটেলে নিয়ে যেতে পারো?' পথের একটা মুটেকে জিগগেস করলেন স্বামীজি: 'হ্যাঁ, যে কোনো হোটেল, যেটা সব চেয়ে কাছে?'

কত ভাড়া দেবেন? ভাড়ার হার আমি কি কিছু জানি? যা ন্যায্য তাই দেব অনায়াসে। ন্যায্য? যা চার আনা তাই মুটেদের ন্যায়ে চার টাকায় দাঁড়াল। লুব্ধের ন্যায় আর ক্ষুব্ধের ন্যায় কি এক?

সমস্ত রাস্তা একটা মূর্তিমান তামাসা হয়ে, আশেপাশের লোক-জনের প্রচুর হাসি আমোদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোরাক জুগিয়ে অবশেষে পৌঁছুলেন এক হোটেলে। বিরক্ত বিধ্বস্ত বিলীনস্বপ্ন। থাকতে দেবে এখানে? দেব। কিন্তু টাকা দিতে পারবে তো?

দেখি যত দিন পারি। একটা চুরুটের দাম আট আনা। আমেরিকায় টাকা তো নয় খোলামকুচি। এক কণা মাটি রাখেনি যেখান থেকে সোনা না উৎপন্ন হয়। যেমন বিস্তীর্ণ দেশ তেমনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তুমিও দাও মাটিও দেবে। তুমিও ঢালো মাটিও অঢেল দেবে। এত অপর্যাপ্ত যে একটা কুলির দিনে অন্তত দশটাকা রোজগার।

নোটে-নগদে একশো উনাশি পাউণ্ড ছিল স্বামীজির কাছে, এরই মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড বেরিয়ে গেছে। হোটেলেই এক পাউণ্ড করে দৈনিক খরচ। তারপর যে পারছে ঠকিয়ে নিচ্ছে দুহাতে। এরকম ভাবে চললে কদিন পরেই তো ফতুর। তারপর কি আমি ভিক্ষায় বেরুব? আমেরিকায় ভিক্ষুক নেই, ভিক্ষেয় বেরুলে সটান শ্রীঘর। বিদেশে এসে কি শেষে জেলে যেতে হবে?

অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন স্বামীজি। তারপর খবর নিয়ে জানলেন শিকাগোর ধর্মসভা আরম্ভ হতে এখনো ঢের দেরি। এখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি, সভা বসবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এত আগে না

এলেও চলত। তা ছাড়া, বক্তৃতা যে দিতে চাও তোমার ডেলিগেটের টিকিট কই? ডেলিগেটের টিকিটই বা কি যাকে-তাকে দেওয়া যায়? তার জন্যে উপযুক্ত সার্টিফিকেট চাই। তা তোমার আছে? আর থাকলেই বা কি। সে টিকিট দেবার দিনও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর উপায় নেই, স্বস্থানে প্রস্থান করো।

যারা তাঁকে পাঠিয়েছে, ভেবে-চিন্তে নিয়মশৃঙ্খলার রাস্তা ধরে পাঠায়নি। ভেবেছে স্বামী বিবেকানন্দ একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সভার রুদ্ধদ্বার খুলে যাবে, সে সভা যতই মদমত্ত হোক আর সে দরজা হোক যতই উদ্ধত-উত্তুঙ্গ। কিন্তু আইনকানুনের যে কত বায়নাক্কা তা কারু জানা ছিল না। নিজেও সাংসারিক রীতিনীতির ধার ধারেননি স্বামীজি, তিনিও এসব বিষয় দেখেননি তলিয়ে। কিন্তু এখন দেখলেন অনেক লাল ফিতের জটিলতা, অনেক পত্র-পাত্রিকার জঞ্জাল।

তবে আর কি। ঘরের ছেলে আবার বিবরে ফিরে যাই।

কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি এ আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এসেছি? আর কেউ কি আমাকে নিয়ে আসেনি হাত ধরে? আমি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছি না বলে আর কেউ কি আমাকে দেখছেন না?

আমিও তবে দেখে যাব শেষ পর্যন্ত।

৪৬

কপূর্রতলার রাজা এসেছেন শিকাগোতে। তাঁকে কেষ্টবিষ্টু ঠাউরে শিকাগোর সমাজ খুব মাতামাতি শুরু করেছে। তিনিও এমন একখানা ভাব করে আছেন যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। দেদার টাকা ওড়াচ্ছেন ফুর্তিতে। বইয়ে দিয়েছেন বিলাসের বন্যা।

ওয়ার্লর্ডস ফেয়ারে গিয়েছেন একদিন, স্বামীজির সঙ্গে দেখা। কে কোথাকার পথের ফকির, মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাজা, কথাও কইলেন না।

ধুতি-পরা এক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মাথায় পাগলামির ছিট, হাতের নখে কাগজে ছবি এঁকে বিক্রি করছে সেই মেলায়। রাজার অহঙ্কার

দেখে সে বেজায় খেপে গিয়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘুরছে চারদিকে, তাদের কয়েকজনকে জড়ো করে সেই পাগল রাজার নামে কেচ্ছা কাটতে লাগল। নানারকম মুখরোচক কাহিনী, শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। রিপোর্টারদের লোভ হল এই সব কাহিনীর কিছু পাঠকসমাজে পরিবেশন করি। লুফে নেবে সংবাদ-ক্ষুধাতুরের দল। কিন্তু এই পাগলাটে লোকটাকে এ সব কাহিনীর স্রষ্টা বলে প্রচার করলে সত্যের মত শোনাবে না। ঐ কে একজন এসেছে না ভারতবর্ষ থেকে, রাজার স্বদেশ থেকে? সৌম্যদর্শন, অনেক জ্ঞানের কথা বলে, ইংরেজি-জানা শিক্ষিত—স্বামীজিকেই নির্দিষ্ট করল সকলে—ওঁরই নামে চালিয়ে দেওয়া যাক। তা হলেই লোকে নেবে, সত্যের গন্ধ শুঁকে ঝুঁকে পড়বে কৌতূহলে।

হলও তাই। খবরের কাগজের দুই স্তম্ভ বোঝাই বেরুল রাজার কুকীর্তির গল্প। এ সব কার বলা? আজেবাজে লোক নয়, ভারতবাসী এক বিখ্যাত পণ্ডিত, দূরস্থ নয় ইহাগত, নাম বিবেকানন্দ। কপূর্রতলাকে নামাবার জন্যে স্বামীজিকে এরা স্বর্গে তুলল, আবার যখন দরকার হবে স্বামীজিকে করা যাবে কুপোকাৎ। সে পাগল মারাঠি যা যা বলেছিল সব এনে বসাল স্বামীজির মুখে, স্থানে অস্থানে একটু বা রং চড়িয়ে। ফলে কপূর্রতলার খ্যাতি উড়ে গেল কর্পূরের মত। আর কে সেই পণ্ডিত? হোটেলে ভিড় বাড়তে লাগল রিপোর্টারদের।

আমাকে দিয়েই আমার এক স্বদেশবাসীর অপযশ করানো হল? একেই বলে সংবাদপত্রের সত্য। স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কে তা কানে তোলে? যা হয়ে গেছে বেশ হয়েছে, এখন তোমার নিজের কথা বলো। মনে হয় তোমার ভিতরে আছে অনেক খবরের খাবার। উপবাসী দেশকে তাই এখন আমরা বিতরণ করি।

সম্প্রতি অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হচ্ছি এই আমার একমাত্র খবর। এ তো আর রিপোর্টারদের বলা যায় না। এমন বন্ধু নেই যার সঙ্গেও বা এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, সুতরাং মাদ্রাজী বন্ধুদেরই ফের চিঠি লেখা যাক টাকা চেয়ে।

'যদি আমার এখানে থাকবার জন্যে টাকা না যোগাড় করতে পারো অন্তত যাতে দেশে ফিরে যেতে পারি তার রাহা-খরচটা পাঠিও। ধর্মসভা শুরু হতে এখনো ঢের দেরি, তা ছাড়া আমি ডেলিগেটের টিকিট পাইনি, আমার প্রবেশের অধিকার নেই। যে যেখান থেকে পারছে নানারকম ধোঁকা দিয়ে আমার থেকে টাকাপয়সা লুট করে নিচ্ছে। একটা কেবল যে করব সাহস পাই না। প্রতি শব্দের দাম চার টাকা।'

বারো দিন কাটল শিকাগোয়—এ তো অনর্থক কালক্ষেপ। যদি অপেক্ষাই করতে হয় একটা সস্তার জায়গা দেখা ভালো। কিন্তু কোথায় যাই? নিজে সস্তা হব না অথচ জায়গা সস্তা হবে এমন জায়গা কোথায়?

কেউ-কেউ বোস্টনের নাম করলে। আর দেরি নয়, বোস্টনের ট্রেন ধরলেন স্বামীজি।

শিকাগোর থিয়োসফিস্টরা খাপ্পা ছিল স্বামীজির উপর। স্বামীজির দুর্দশা দেখে তাদের বড় আহ্লাদ। পালিয়ে যাচ্ছে শুনে আরো।

তাদের একজন লিখল: শয়তানটা শিগগির মারা যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় বাঁচবে সকলে।

'যদি কেউ তোমার গলা কাটতে আসে', লিখছেন স্বামীজি: 'তাকে না বোলো না। কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটছ। কোনো গরিবের কিছু যদি উপকার করো তা হলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হয়ো না। তা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র। তাতে অহঙ্কারের কিছুই নেই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে যা তুমি-ছাড়া? তুমিই জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র। সমুদয় জগৎই তুমি। তুমি কাকে ঘৃণা করবে, কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে? শুধু জেনে রাখো তিনিই তুমি। আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গড়ে তোলো। যে এই তত্ত্ব জেনে জীবনকে সেইভাবে গড়ে তোলে সে আর কখনো অন্ধকারে ভ্রমণ করে না।'

রণে কিছুতেই ভঙ্গ দেবেন না স্বামীজি। দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

'এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।' লিখছেন স্বামীজি : 'বারে বারে মনে হচ্ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল আমি একগুঁয়ে দানা, এত সহজেই হেরে যাব ? আমি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পাই নি ? আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তিনি তো সব দেখছেন। তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু তো এক মুহূর্তের জন্যেও অস্ত যাচ্ছে না। তবে আর ভয় কি, মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য যেন না টলে'।

শোনা গেল বোস্টনে খরচ কম, সুতরাং বোস্টনের দিকেই যাত্রা করলেন স্বামীজি। আর সেই ট্রেনে মিস কেট স্যানবর্ণের সঙ্গে দেখা।

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা, অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির দিকে। এ কে প্রদীপ্তপুরুষ। আকাশের সুবর্ণসূর্য যেন নেমে এসেছে মাটিতে।

আলাপ শুরু করলেন মহিলা।

'কতদূর যাবে ?'

'বোস্টন।' বললেন স্বামীজি।

'উঠবে কোথায় ?'

'জানি না। শুনেছি বোস্টন সস্তার জায়গা, দেখি কোনো একটা সাদাসিদে হোটেল পাই কিনা।'

'আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় সন্ন্যাসী—তাই না ?'

সায় দিলেন স্বামীজি।

'আমেরিকায় এসেছ কেন ? কৌতূহলে একাগ্র মিস স্যানবর্ণ।

'বেদান্ত প্রচার করতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোতে ধর্ম-সভায় যোগ দেব, কিন্তু সভা আরম্ভ হতে এখনো আরো প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। এতটা সময় শিকাগোতে থাকি আমার এমন রসদ নেই। তাই চলেছি সস্তার জায়গার উদ্দেশে।'

'তুমি আমার ওখানে যাবে ? আমার অতিথি হবে ?' মিস স্যানবর্ণ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

অবন্ধু বিদেশে এ কার স্নেহস্বর ! এ কার হাত বাড়ানো !

'তুমি থাকো কোথায় ?' কৃতজ্ঞ চোখে মহিলার করুণামাখানো নীল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজি।

'বোস্টনের কাছে এক গ্রামে মাসাচুসেটস-এ আমি থাকি।' বললেন মিস স্যানবর্ণ: আমার কুটিরের নাম 'ব্রীজি মেডোজ'—হাওয়াখাওয়া মাঠ। বাড়ির চারদিকে পাইন আর রুপোলি বার্চ, দেওয়ালবাওয়া আঙুরের লতা! পদ্মফুলে ভরা দিঘি, আর কাছেই ছুটো ঝর্ণা, তাদের ধারে ধারে ফরগেট-মি-নট ফুটে আছে। যাবে তুমি?'

'যাব।'

মিস স্যানবর্ণের বেশ সচ্ছল অবস্থা, প্রসন্ন আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন স্বামীজিকে। রোজ এক পাউণ্ড করে খরচ বেঁচে যেতে লাগল স্বামীজির। কিন্তু স্যানবর্ণের লাভ কি? বন্ধুমহলে একটি ভারতীয় কিউরিয়ো দেখিয়ে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন। দেখ দেখ কি অদ্ভুত পোশাক। মাথায় একটা কাপড়ের স্তূপ তারপরে আবার একটা পুচ্ছ ঝুলছে। আর গায়ে এই লম্বা ঢিলে বালিশের অড় দেখেছ, একটা গোটা মানুষই আস্ত খোলের মধ্যে! যে দেখে সেই হাঁ করে থাকে। রাস্তায় বেরুলেই টিটকিরি দেয়।

উপায় নেই, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। সমস্ত উদ্ধত বিরুদ্ধতাকে বিগলিত করব, সমস্ত বিদ্রূপকে নিয়ে যাব অমিশ্র স্তুতিতে—তবেই তো আমি বিবেকানন্দ।

একদিন ছু ঘোড়ার গাড়িতে করে মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে বেরুলেন রাস্তায়। সাধককে কে চিনতে পারবে, ভাবল ভারতের কোনো রাজারাজড়া চলেছেন বেড়াতে। খবরের কাগজে বেরুল: ভারতবর্ষের এক রাজা এসেছে স্যানবর্ণের কুটিরে। তার যেমন রূপ তেমন শোভা। সর্বোপরি তার বিচিত্র বেশ।

শুধু পোশাক দেখবার জন্যেই কাতার দিয়ে লোক দাঁড়ায় রাস্তায়। স্বামীজি ঠিক করলেন, সাধারণ চালচলনে চলবেন। গেরুয়া, কালো লম্বা একটা কোট তৈরি করে নিতে হবে। যদি সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় বক্তৃতা দিতে তখন পরব আমার রাজবেশ—আলখাল্লা আর পাগড়ি। এই এখানকার মেয়েদের পরামর্শ। আর পোশাকব্যাপারে মেয়েরাই সর্বময়ী কর্ত্রী এখানে। কিন্তু চলনসই একটা পোশাক

করতে তিনশো টাকা খরচ। হাতে মোটে ষাট পাউণ্ড অবশিষ্ট।

যা থাকে অদৃষ্টে, বোস্টনে গিয়ে পোশাকের অর্ডার দিলেন স্বামীজি। কিছু টাকা পাঠাবার কথা লিখলেন আলাসিঙ্গাকে।

'যদি নাও পারো, আমি ছাড়ব না, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আমি যদি এখানে রোগে শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা আছ, তোমরাই এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। কি ব্রত? শুধু পবিত্রতা সরলতা আর বিশ্বাস। অগ্নিময় বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। প্রভু আমাদের নেতা, জয় দাও প্রভুর। আমরা জ্যোতির তনয়, জয় দাও জ্যোতির্ময়ের। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। শুধু অগ্রসর হও। কে পড়ল চেয়ে দেখো না। একজন পড়বে তো আরেকজন তার জায়গা নেবে। বন্ধ হবে না অগ্রগতি।'

রমাবাঈ হিন্দু মেয়ে, খ্রীষ্টান হয়েছে। আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের ক্লাব খুলছে। হিন্দু বালিকাবিধবাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তারই প্রতিকারের জন্যে ঐসব ক্লাবের সাহায্যে চাঁদা তুলছে অজস্র। দুর্দশা, তাতে সন্দেহ কি। তাই বলে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ বলে দেশের বিধবাদের তুমি হেনস্তা করবে? যা নয় তাই বলে দেখাবে? বোস্টনে একটা রমাবাঈ-সার্কাল ছিল, স্বামীজি সেখানে বক্তৃতা দিতে গেলেন।

আমেরিকায় সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

বিষয়, ভারতীয় নারী—তথা বালবিধবা।

আমেরিকার মেয়েরা যারা শুনতে এসেছিল তারা থমকে গেল। ভারতে নারীত্ব স্ত্রীত্ব নয়—ভারতে নারীত্ব মাতৃত্ব।

এমন সব শুভ্র পবিত্র উজ্জ্বল কথা বললেন স্বামীজি যা রমাবাঈ বলেনি। এমন ছবি তুলে ধরলেন যা কলঙ্কের ঊর্ধ্বে চন্দ্রিমার মত।

তারপর একদিন মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন শেরবর্ণ মহিলা জেলখানায়।

মাথায় হলদে পাগড়ি গায়ে জ্বলন্ত গেরুয়া, বিষাদধূসর বন্দীশালায় সর্বকালপ্রসাদ বিবস্বান সূর্যের মত আবির্ভূত হলেন স্বামীজি। সর্ব-বন্ধনবিমোচন ও সর্বব্যাধিনির্মুক্তির আশ্বাস নিয়ে কয়েদীর দল বহুমঙ্গল

সন্ন্যাসীকে দেখে উল্লাস করে উঠল। তিনি যেন রুগ্নের আরোগ্য—দরিদ্রের বৃহৎনিধি।

সেখানেও ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা নিয়ে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি।

দণ্ড যে প্রতিশোধের জন্যে নয় সংশোধনের জন্যে এই নতুন তত্ত্ব দেখলেন এই জেলখানায়। যারা পাপী আর পতিত তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে নয় তাদের টেনে তুলে নেবার জন্যেই এই আশ্চর্য কর্মমন্দির। তারা যে পশু নয় ক্রীতদাস নয় গৃহহীন ভিক্ষুক নয় এই বিশ্বাসে তারা বলীয়ান।

'যখন ভারতবর্ষের দরিদ্র ও পতিতের কথা ভাবি,' লিখছেন স্বামীজি, 'তখন ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, ওঠবার উপায় নেই, রাস্তা নেই পালাবার। তারা ডুবে যাচ্ছে দিন দিন। তারাও যে মানুষ এ কথাটাই তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে প্রাণপণে। হিন্দুধর্মের দোষ কি। হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছে যেখানে যত প্রাণী সবাই তোমার আত্মার প্রতিরূপ মাত্র। দোষ ধর্মের নয়, দোষ হৃদয়ের অভাব। প্রভু এসেছিলেন বুদ্ধ হয়ে, গরিবের জন্যে দুঃখীর জন্যে পাপীর জন্যে কত কেঁদে গেলেন, কত শেখালেন কাঁদতে, কেউ তাঁর কথায় কান দিলে না। কিন্তু নিরাশ হয়ো না। প্রভু আবার আমাদের ডেকেছেন, কোমর বাঁধো, সমুচ্চ পতাকা তুলে নাও দৃঢ়করে।'

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের ডক্টর, অধ্যাপক জন হেনরি রাইট শুনতে পেয়েছেন স্বামীজির কথা। স্যানবর্নের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের, মিস কেটই পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু কী বৃহত্তেজা ব্যক্তিত্ব স্বামীজির, কথা কিছুতেই শেষ হতে চায় না। রাইট ভাবলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়!

যে কাছে এসে দেখে, কথা কয়, সেই জয় গায়। কেট স্যানবর্ণের খুড়তুতো ভাই ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন—তারও কানে উঠেছে এই অদ্ভুত-দর্শন হিন্দু সাধুর কথা। বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু কাছে বসে কথা কইতে এসেই মজে গেল। যে সে লোক নয় ফ্রাঙ্কলিন,

সংবাদপত্রী, দার্শনিক, সমাজসেবক। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বোস্টনে।

রাইট এসেছেন বোস্টনে, স্বামীজির খোঁজে। কোথাও দুজনে বেরিয়ে গিয়েছে হয়তো, ধরতে পেলেন না। চিঠি লিখে রেখে গেলেন : স্বামীজি, যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে, সমুদ্রের ধারে আনিস-কোয়াম গ্রামে, যদি আমাদের সঙ্গে কাটান একটা উইক-এণ্ড।

এক শুক্রবার এসে হাজির হলেন স্বামীজি। গৈরিকের সৈনিক, দিব্যদীপ্তিতে সহস্রাংশু। যেন স্বপ্নের মূর্তিতে জাগ্রত সত্য এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত গাঁ-শহর আলো হয়ে গেল। হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। বাড়ি-ঘর-হোটেল-দোকান ভেঙে পড়ল দলে-দলে।

ত্রিশ বছরের যুবক, দেখ কি মহিমা তার আকৃতিতে। দেখ কি গৌরবে বহন করছে তার দেহ। দেহ তো নয় উধ্বর্'-উচ্ছ্রিত স্তব। অব্যাহতবল বিগ্রহ। বিপুলাংস, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, বিশালাক্ষ। স্নিগ্ধবর্ণ, সর্বশুভলক্ষণ, নিত্যনির্মলাত্মা। চলো দেখবে চলো। আছে কোথায় ? হোটেলে-মেসে নয়, গাছতলায় নয়, ডক্টর রাইটের বাড়িতে। পণ্ডিত চিনেছে এবার পণ্ডিতকে। সারাক্ষণ কি কথা কইছে হে ? শুধু ধর্মের কথা। প্রতি নিশ্বাসে প্রত্যেকটি চক্ষুর পলকে ধর্ম। ধর্মই আলো ধর্মই বাতাস ধর্মই জল ধর্মই খাদ্য।

উনি বলছেন আর সবাই তাই শুনছে স্থির হয়ে ? সায় দিচ্ছে ? তর্ক করছে না ?

অনর্গল তর্ক করছে। কিন্তু সাধ্য নেই তুমি পরাস্ত কর। পরাস্ত করা দূরের কথা সাধ্য নেই তাঁকে তুমি ফেল বেকায়দায়।

সেই শুদ্ধ জ্ঞানের দক্ষিণামূর্তির কাছে সমস্ত তর্ক স্তব্ধ। তুমিও বসে পড়ো সামনে। তারপর শোনো উৎকর্ণ হয়ে।

একদিন রাইট স্বামীজিকে গির্জেতে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনল তাঁর দীপ্তবাণী। যাকে সবাই মূর্তিপূজক বলে চেয়েছিল দূরে রাখতে, তাকেই এখন হৃদয়ে এনে বসাল ধ্যানের মূর্তি করে।

'জগতের সমগ্র জাতিকে বলতে হবে বেদের ভাষায়, তোমাদের

বাদবিসম্বাদ বৃথা। তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করতে চাও তাকে কি দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, প্রচার নিরর্থক, তুমি কি বলছ তাই তোমার জানা নেই। আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আর কিসের তবে বিবাদবচসা? তোমার মুখ তখন অন্য শ্রী ধারণ করবে। জীবনে তাই শ্রীমান হয়ে ওঠো। এক ঋষি তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্যে পাঠিয়েছিল গুরুগৃহে। শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র যখন ফিরে এল ঋষি জিগগেস করলে, কি শিখলে? নানা বিদ্যা নানা বাক্য নানা বেদ। কিছু হয়নি। আবার যাও গুরুগৃহে। আবার যখন ফিরল আবার সেই বাগাড়ম্বরের স্পর্ধা। এবারও হয়নি, আরেকবার চেষ্টা করো। তৃতীয়বার যখন ফিরল পুত্র, তখন তার আর কথা নেই, তখন তার শুধু বিভা, তার শুধু শ্রী। তখন ঋষি বললেন, 'বৎস, তোমার মুখ আজ উদ্ভাসিত দেখছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। যখন কেউ ঈশ্বরকে জানবে তখন তার মুখশ্রী তার স্বর তার দৃষ্টি তার ভঙ্গি তার সমগ্র আকৃতিই বদলে যাবে। তখন সে মানুষের মহামঙ্গলস্বরূপ হয়ে উঠবে। তখনই সে ঋষি নামের অধিকারী হবে। ঋষিত্বলাভই হিন্দুর মুক্তি।'

এ কি সেই হিন্দু নয়? এ কি নয় সেই ঋষি?

৪৭

'ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে পেট ভরে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে-দিকে আর পুরোতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যেন তারা ঘুরপাক খেতে-খেতে আটলান্টিক মহাসাগরে ছিটকে পড়ে—তা তিনি ব্রাহ্মণই হোন, সন্ন্যেসীই হোন, যিনিই হোন।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি: 'সামাজিক আচার একবিন্দুও যাতে না থাকে তাই দেখতে হবে। প্রত্যেকে যাতে আরো ভালো করে খেতে পায় আর সুবিধে পায় উন্নতি করতে—তাও। আমাদের নির্বোধ যুবকেরা ইংরেজের থেকে ক্ষমতা পাবার জন্যে সভাসমিতি করছে, ইংরেজ হাসছে মুখ লুকিয়ে। যে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় সে কি করে স্বাধীন হবার যোগ্য? ধরো ইংরেজ তোমাদের হাতে

শক্তি ছেড়ে দিলেন, তাতে হবে কি? আর কেউ এসে শক্তি কেড়ে নেবে। দাসেরা শক্তি চায় অন্যকে দাস করে রাখবার জন্যে।'

আর ইংরেজ?

'ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ?' বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি: 'হিন্দুরাজারা রেখে গিয়েছে মন্দির, মুসলমান রাজারা অট্টালিকা আর ইংরেজ? ইংরেজ রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যাণ্ডির বোতলের স্তূপ! কী করেছে ইংরেজ? নিজের ফুর্তির জন্যে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। শত হাতে আমাদের ভাণ্ডার লুট করে নিয়েছে যাতে আমরা নিরন্নের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশুশক্তির নির্লজ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাষা, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেরুদণ্ড। কিন্তু নিরাশ হবার কিছু নেই। আসছে জ্বলন্ত প্রতিশোধ। সে জ্বলন্ত প্রতিশোধ আর কেউ নয়—সেই জ্বলন্ত প্রতিশোধ চীন। চীনের জনজলপ্লাবন।'

'আমাদের এই দুর্দশা কেন?' আবার বলছেন স্বামীজি: 'আমরা আমাদেরই দেশবাসীকে হেয় বলে অপজাত বলে অস্পৃশ্য বলে নির্যাতন করেছি—সেই হেতু। যেখানে অত্যাচার, জানবে, সেখানেই প্রতিশোধ। স্তূপীভূত মেঘের মধ্যে বজ্রের আয়োজন।'

রাইট বললেন, 'তুমি যাও এবার শিকাগো—' রাইটের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

রাইটের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন স্বামীজি। শিকাগো! সে আশা তো তিনি কবে ছেড়ে দিয়েছেন।

'শিকাগো! সে তো অনেক দূর!'

'না, মোটেই দূর নয়। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন?' অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন স্বামীজি: 'আমার ঢাল নেই তরোয়াল নেই, চাল নেই চুলো নেই—আমাকে পাত্তা দেবে না।'

'আপনাকে পাত্তা দেবে না?' রুখে উঠলেন প্রফেসর: 'আপনার

জন্যেই তো ধর্মসভা, আপনিই তো সেই সভার প্রধান ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি।'

'বলেন কি! আমি যখন সেখানে গেলাম আমাকে বললে আপনার সার্টিফিকেট কই? পরিচয়পত্র কই?'

'বললে?' প্রফেসর গর্জন করে উঠলেন: 'তা হলে যেন ওরা সূর্যকে জিগগেস করে, তুমি যে আকাশে আলো দেবে, তোমাকে কে চেনে, কোথায় তোমার বাড়ি-ঘর, কবে আর কোথায় এর আগে আলো দিয়েছ, তোমার সম্বন্ধে কার কি অভিমত, এত বড় আকাশে আলো দিতে পারবে তার ভরসা কি! সূর্য কারু প্রশ্নের তোয়াক্কা করে না, ধার ধারে না কোনো অধিকারের। সে নিজের ঔজ্জ্বল্যে পরিচিত। স্বামীজি, তুমি সেই সূর্যের মত স্বপ্রকাশ।'

'ডেলিগেটের টিকেট দেবে কে আমাকে?'

'প্রতিনিধি নির্বাচনের কমিটির যে চেয়ারম্যান সে আমার বন্ধু। তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবে।' গম্ভীরমুখে বললেন প্রফেসর রাইট।

এ সব কি গল্পকথা শুনছি নাকি! স্বামীজি উৎসাহে প্রতপ্ত হতে লাগলেন। স্মরণ করতে লাগলেন ঠাকুরকে।

'তুই দেখে নিস।' দেশে থাকতে বলেছিলেন তুরীয়ানন্দকে: 'এই আমার জন্যেই শিকাগোতে ধর্মসভা হচ্ছে, শুধু আমি সেখানে বক্তৃতা দেব বলে। তুই দেখে নিস হরি ভাই।'

'কিছুতেই ভয় পেয়ো না,' লিখছেন রামকৃষ্ণানন্দকে: 'যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর আমাকে দাবাবার জো আছে? ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ, প্রাণ কণ্ঠাগত হোক, তবু ভয় পাবে না। সিংহবিক্রম অথচ কুসুমকোমলতার সঙ্গে কাজ করবে।' আরো লিখছেন: 'তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সংকীর্ণ ভাবের থেকেই অধঃপতন হয়েছে। ঐ সংকীর্ণ ভাবের বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের প্রত্যেককে পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে

কোনো বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। তিনিই কাণ্ডারী, ভয় কি ?'

কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখলেন রাইট। লিখলেন, 'যাঁকে পাঠাচ্ছি তাঁর একার বিদ্যা আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের একত্রিত বিদ্যার চেয়ে বেশি। ধারে তো বটেই, ভারেও।'

'তবে একটু ইংরেজি ভাষাটা দোরস্ত করতে হবে।' স্বামীজি লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুকে-পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যার জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে দেখো। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য। বোঝে বিদ্যার তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহাউদ্যোগ। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।'

'আপনি তো পাঠাচ্ছেন আমাকে শিকাগোতে—' ভাবতেও স্বামীজি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, বলছেন, 'কিন্তু আমার ট্রেনের টিকিট কেনবার পয়সা কই ?'

'আমি দেব।' বললেন রাইট।

'আপনি দেবেন ?'

'হ্যাঁ মনে করো ঈশ্বরই দিচ্ছেন করুণা করে।' রাইটের দুচোখ চকচক করে উঠল।

'কিন্তু সেখানে থাকব কোথায় ? খাব কি ?'

'তাও পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

সন্দেহ কি, ঠাকুরের করুণা। ঠাকুরের অমিত মহিমা, অমোঘ মহিমা।

কিন্তু শিকাগো থেকে উত্তর আসতে দেরি আছে। সভা তো সেই এগারোই সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে ঘুরে আসি সালেম। মিসেস টানাট উডস সেখানে নেমন্তন্ন করেছেন বক্তৃতা দিতে। "থট য়্যাণ্ড ওয়ার্ক" ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যা, মিসেস উডস আবার শিশু-সাহিত্যেরও রচয়িত্রী। এক[illegible]ড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন স্বামীজিকে। একটি নিত্যানন্দবর্ধন শিশুকে

STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA TRIPURA

"থট য়্যাণ্ড ওয়ার্ক" ক্লাবেই বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ভারতবর্ষ, তার ধর্ম ও রীতিনীতি।

কে বক্তৃতা দেবে? নাম কি?

কেউ বলে বিবেকানন্দ, কেউ বিবিক্তানন্দ, কেউ বা বিবিক্ষানন্দ।

করে কি?

জানো না বুঝি? ভারতবর্ষের কোন এক রাজা। সভায় আসবে তার স্বদেশে তৈরি রাজকীয় পোশাকে। ভারি মজা। দেখবে চলো। শুনবে চলো।

এ কি! রাজা কোথায়! এ যে রাজরাজেশ্বর! এ যে নববেশে বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব। আর কি কণ্ঠস্বর! যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশাল সমুদ্র সম্ভাষণ করে উঠেছে।

সে কণ্ঠস্বরে সারল্য ও আন্তরিকার জাদু, পবিত্রতার অমৃতস্পর্শ।

কী বলছে? নতুন কথা বলছে। পশ্চিম কখনো শোনেনি এমন কথা। বলছে, ভালোর জন্যেই ভালো কাজ করো, পুরস্কারের জন্যে নয়। আর কী ভালো কাজ করেছি তা যেন না বলে বেড়াও। নিজের আমি-টাকে হাম-বড়া ভাবটাকে জলাঞ্জলি দাও। সোজা কথা, ভালো কাজই ঈশ্বরের কাজ। এই ঈশ্বরের কাজেই নিযুক্ত থাকো, নিমগ্ন থাকো।

সবাই অনুভব করল, বক্তার উপস্থিতিটাই ঈশ্বরকর্মের উদ্দীপনা। পরের কথা ভাবা, পরের হিতের জন্যে কাজ করাই ঈশ্বরকর্ম

পরোপকারে কার উপকার? নিজের উপকার। বলছেন বিবেকানন্দ। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, দুটো পয়সা নে রে, বলে গরিবকে তা দিও না, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে সে গরিব হওয়াতে তাকে সাহায্য করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দাতা সেই ধন্য। তুমি যে তোমার দয়াশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে পবিত্র করতে পারছ, কৃতার্থ করতে পারছ, তাতে নিজেই তুমি কৃতজ্ঞ হও। যদি দুঃস্থ না থাকত তবে তোমার এই আশ্চর্য শক্তিটাকে দেখাতে কি করে? কি করে নিজের মধ্যে পেতে তুমি তোমার অপরিমেয়তার স্বাদ?

সুতরাং জগতের উপকার করব এই অজ্ঞানের কথা ছাড়ো। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্যে বসে নেই। আমাদের কাজ করতে হবে, সর্বদাই পরোপকার, যেহেতু তা আমাদেরই সৌভাগ্যস্বরূপ। শুধু এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হতে পারি। কোনো গরিবই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তার সব ধারি, কারণ সে আমাদের দয়াশক্তি তার উপর ব্যবহার করতে দিচ্ছে। এই সুযোগই আমাদের সৌভাগ্য। অমুক অমুক লোককে উপকার করেছি, সাহায্য করেছি এই চিন্তাটাই ভুল। এ বৃথা চিন্তা, আর বৃথা চিন্তাতেই কষ্ট। মনে মনে ভাবি, একে যখন সাহায্য করেছি সে অন্তত একটা ধন্যবাদ দিক, কৃতজ্ঞতা জানাক, না দিলে না জানালেই অশান্তি। কেন প্রতিদান আশা করব? যাকে তুমি সাহায্য করছ, বলছেন বিবেকানন্দ, তাকে তুমি ঈশ্বরবুদ্ধি করো। যদি সে তোমার ঈশ্বর, তাকেই তুমি ধন্যবাদ দাও, তাকেই তুমি জানাও তোমার কৃতজ্ঞতা। তোমার সেই সাহায্য-কার্যই ঈশ্বরের উপাসনা।

পরের জন্যেই তুমি, এ বাণী ভারতবর্ষের। আর, চাচা, আপন বাঁচা, এ ধ্বনি পশ্চিমের।

'একটি ছেলে কাজ করে যা উপার্জন করেছিল তার কিছু অংশ তার মাকে এনে দিলে, ছেলেবেলার ইংরেজি নীতিশিক্ষার বইয়ে পড়েছিলাম তার প্রশংসা।' বলছেন স্বামীজি: 'এর মধ্যে প্রশংসার কি আছে, নীতিশিক্ষাই বা কি। পরে বুঝেছিলাম পশ্চিমে বাবা-মাকে খাওয়ানোই একটা বড় কথা, সাংঘাতিক কথা। আমাদের ভারতবর্ষে ছেলের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো দ্বৈধ নেই। সে তার রোজগারের সবটাই তার মাকে এনে দিত। এ মাকে উপকার নয়, নিজেকে উপকার।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যজ্ঞ করছে পঞ্চপাণ্ডব। বিরাট যজ্ঞ, এমনটি কেউ দেখেনি, চমকে-জমকে অভূতপূর্ব। উথলে উঠেছে দানসাগর—ধনরত্নের ছড়াছড়ি। সে যজ্ঞে এক অদ্ভুতদর্শন বেজি এসে উপস্থিত। তার গায়ের আদ্ধেক সোনা, আদ্ধেক পাঁশুটে। সে এসে বললে এ কি, এই যজ্ঞ? ছি ছি এ একটা যজ্ঞই নয়।

বলো কি, এত যেখানে দান, দানের পর্বতস্তূপ, সে যজ্ঞ নয়?

না, যজ্ঞ দেখেছিলাম সেই এক গাঁয়ে, এক গরিব ব্রাহ্মণের কুটিরে। কুটিরে ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, তাদের ছেলে আর ছেলের বউ। ধর্মের উপদেশ দিয়ে যা ভিক্ষে পেত তাই দিয়েই ব্রাহ্মাণ নির্বাহ করত জীবিকা। সে গাঁয়ে সেবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। লোকে খেতে পাচ্ছে না, শুকনো উপদেশ কে শোনে? অনাহারের মধ্যে এসে দাঁড়াল সেই দরিদ্রের পরিবার। পাঁচ-পাঁচ দিন ধরে সমানে সকলের উপবাস—এই বুঝি মৃত্যু এসে হানা দিল দুয়ারে। ছ দিনের দিন কিছু ছাতু যোগাড় করল ব্রাহ্মণ। ক মুষ্টি ছাতু, মনে হল বসুন্ধরার উজাড়করা ধন। সমান ভাগ করে বসেছে চারজনে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। কে? আমি অতিথি। অতিথি? তুমি নারায়ণ। ব্রাহ্মণ উঠে দরজা খুলে দিল। অতিথি বললে, আমি ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ দশদিন ধরে উপবাসী, কিছু খেতে দাও আমাকে। ব্রাহ্মণ তার নিজের ভাগ তুলে দিল অতিথিকে। দু গ্রাসে সেই ভাগ নিঃশেষ করে অতিথি বললে, এটুকু খেয়ে আমার খিদে আরো বেড়ে গেল. আরো ভাগ দাও। এ কি সর্বনাশী ক্ষুধা! ব্রাহ্মণ চোখে অন্ধকার দেখল। ব্রাহ্মণী তখন স্বামীকে বললে, আমার ভাগও দাও এই পীড়িতকে। ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে উঠল, বললে, না, তোমাকে বিপন্ন করতে পারব না। তখন স্ত্রী বললে, না, আমাকে স্ত্রীর কর্তব্য করতে দাও। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর নারায়ণসেবায় সাহায্য করা। ব্রাহ্মণী দিয়ে দিল তার ছাতুর ভাগ। এবং এই ভাবে ছেলে আর ছেলের বউও তাদের ভাগ দিয়ে দিল অতিথিকে। তখন সর্বগ্রাস করে সেই অতিথি তৃপ্ত হল। সেই কুটিরে ঘরের মেঝেতে কিছু ছাতুর গুঁড়ো ছিল, আমি সেই মেঝেতে যখন এসে গড়াগড়ি দিলাম আমার আদ্ধেক শরীর সোনা হয়ে গেল। সেই থেকে আমি আরেকটা এমন যজ্ঞ খুঁজে বেড়াচ্ছি—যেখানে আমার শরীরের বাকি আদ্ধেকও সোনা হয়ে যাবে। সমগ্র জগৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজও অমন আরেকটা যজ্ঞের দেখা পেলাম না। আমার দেহের বাকি আদ্ধেকটা পাঁশুটেই থেকে গেল—

কেন, এই যজ্ঞ ?

এ কি একটা যজ্ঞ ? এটা একটা অহঙ্কারের রাজসূয়। এতে দান আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্মদান কই ?

কই প্রচারবৈমুখ্য ?

আরেকটা বক্তৃতা দিলেন সালেমে! বিষয়, হিন্দুদের জাতিভেদ ; ভারতীয় নারীদের সামাজিক দুর্গতি ; ভারতবর্ষের নিদারুণ দারিদ্র্য।

জাতিভেদ সামাজিক কর্মবিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। আর নারীদের দুর্গতি তাদের আমরা শুধু দেবী বলে পূজা করেছি বলে, অন্তঃপুরের মন্দিরবেদীতে বন্দিনী রেখেছি বলে। কিন্তু এ সব দুর্গতি-দুর্দশার একদিন অবসান হবে কিন্তু দারিদ্র্য ? এ নাগপাশের মোচন হবে কবে ? এ যে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

'বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় সকলেই এই ভুল করেছিলেন যে জাতিভেদ ধর্ম-বিধান, তাই তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুটোকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন একসঙ্গে।' শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি : 'হিন্দু ধর্মনেতারা যাই বলুন, জাতি একটা সামাজিক বিধান মাত্র। এ দূর হতে পারে যদি লোকের সামাজিক স্বত্ববুদ্ধিকে জাগ্রত করা যায়। এখানে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে একজন মানুষ। ভারতে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে সমাজের একজন কৃতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উৎখাত করতে পারে এই মনোভাব। স্বাধীনতা হরণ করে নাও, অধোগতি ছাড়া আর কিছু নেই চতুর্দিকে। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষেই উঠে যাচ্ছে জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ জুতোব্যবসায়ী বা ব্রাহ্মণ শুঁড়ি দুর্লভ কি আজকাল ?'

আরো লিখছেন : 'হিন্দু যেন কখনো তার ধর্ম না ছাড়ে। ভারতের সকল সংস্কারক ভুল করে ধর্মকেই পৌরোহিত্যের সমস্ত অত্যাচার ও অবনতির জন্যে দায়ী করেছেন। তাই তাঁরা হিন্দুধর্মের অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙতে উদ্যত হলেন। ফল কী হল ? ফল হল তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হলেন।'

পর্দা উঠে যাবে, নারীদের অশিক্ষাও দূরীভূত হবে একদিন।

লিখছেন স্বামীজি: 'সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে কই? যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু—যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমান। চণ্ডীকথিত কোথায় আমাদের সেই গৃহশ্রী? বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এদেশের পুরুষেরা তাই দেখে। মনু মহারাজ বলেছেন, যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত সেই গৃহের উপরেই ঈশ্বর সুপ্রসন্ন। এখানে তাই এরা সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ হেয় অধম অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, নিরুদ্যম, দরিদ্র।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! তুষারের মত শুভ্র। পঁচিশ-তিরিশ বছরের কম কারু বিয়ে হয় না। আকাশে পাখির মত স্বাধীন। বাজার-হাট রোজকার দোকান, কলেজ, প্রোফেসর, সব কাজ করে—অথচ কি পবিত্র! স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চলবার জো নেই। আবার মেয়ে এগারো বছরে বিয়ে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। ছেলেদের মত মেয়েদেরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? মেয়েদের যদি উন্নত করতে পারি তবেই আমাদের আশা আছে। নইলে ঘুচবে না পশুজন্ম।'

কিন্তু তোমাদের সেই বর্বরপ্রথা সতীদাহ কী? সভার মধ্য থেকে প্রশ্ন করল কে একজন।

সে-প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু সে-প্রথার জন্ম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচ্ছেদ্য অনুরক্তি থেকে, কোনো একটা বর্বর অনুশাসন থেকে নয়। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী এক ছিল, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী এক—এই আদর্শই ধরতে চেয়েছিল সমাজে। কিন্তু সে যখন গেছে তখন তা নিয়ে আর কথা কেন?

কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা? আবার এক প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা কি পুতুলকে পুজো করি? আমরা পুজো করি প্রতিমাকে,

ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়াকে। অনন্তকে ধরি কি করে যদি তার একটি অবয়ব না কল্পনা করি? তাই আমার সীমাবদ্ধ ঘটের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে! কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? বহু ভক্ত খ্রীস্টানকে জিগগেস করেছি, সত্যি করে বলো, উপাসনার সময় কী ভাবো? কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রুশ, কেউ বলেছে স্বয়ং যীশু। বুদ্ধ ঈশ্বর মানলেন না কিন্তু নিজে ঈশ্বর হয়ে বসলেন। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে? অক্ষরের সাহায্য ছাড়া কার পাঠোদ্ধার করবে?

কিন্তু এত যে মিশনারি যাচ্ছে তোমাদের দেশে তারা করছে কী?

দয়া করে তাদের কথা আর বোলো না। তারা কি ধর্ম শেখাচ্ছে? তারা শুধু দলের খাতায় নাম বাড়াচ্ছে। দেশের ধর্ম দিয়ে কী হবে যদি দেশের আহারের না সংস্থান হয়? পেটে খিদে রেখে ঈশ্বরের নাম চলে না। এখন থেকে আর মিশনারি পাঠিও না, এঞ্জিনিয়র পাঠিও। ধর্মবিস্তারে কি হবে, কর্মবিস্তারের সুবিধে করে দাও। কলকারখানা বসাও, জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও উপবাসীকে। তা যদি না পারো পরের দেশে গিয়ে ধর্মের ধ্বজা আর তুলতে চেও না।

সমস্ত কুসংস্কার দূর হবে একদিন দেশ থেকে, সমস্ত অনাচার, সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুতি। কিন্তু এই পর্বতভার দারিদ্র্যের উচ্ছেদ হবে কি করে? শ্মশানে দগ্ধ অঙ্গারের অক্ষরে কবে লেখা হবে সুশ্যামলের কবিতা?

শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি : 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু টাকা। সকলে চেচাঁচ্ছেন আমরা বড় গরিব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কটা প্রতিষ্ঠান আছে? লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্যে কজনের প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারদিকে, তাদের উন্নতির জন্যে, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্যে তোমরা কী করেছ বলতে পারো? তোমরা তাঁদের ছোঁও না, শুধু দূর-দূর কর। আমরা কি মানুষ? এখন ধর্ম কোথায়? এখন খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। মনে রাখবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। আর আমাদের কাজের মূল কথা,

কারু ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা বিধবাবিবাহ নিয়েই বেশি ব্যস্ত। সকল সংস্কার-কর্মেইআমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোনো জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না। জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তার উন্নতি করতে পারো?'

ছুজন পাদ্রী, ডক্টর গার্ডনার আর রেভারেণ্ড নব্‌স্‌, প্রতি সভায়ই স্বামীজিকে বিরক্ত করছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে যাচ্ছে বিড়ম্বিত করতে। কিন্তু পরাস্ত হবার পাত্র স্বামীজি নন। শান্তভাবে দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তবু তারা নিরস্ত হচ্ছে না, গির্জেয় গিয়ে বেদীর থেকে অপভাষণ করছে। তার চেয়ে প্রকাশ্য সভায় পাদ্রীদের সঙ্গে হোক একটা সাক্ষাৎকার। টানাট উডস সালেমের সমস্ত পাদ্রীবংশকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, শোনো সনাতন ভারতবর্ষের নবীন প্রাণের প্রতীক বীরোত্তম সন্ন্যাসীকে, বোঝো যদি বুঝতে পারো হিন্দুধর্মের উদার তত্ত্ব। সেই সভায় পাদ্রীর দল তীব্র কদর্য ভাষায় আক্রমণ করল স্বামীজিকে, যত পারল বর্ষণ করতে লাগল কটূক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বামীজির শান্তিতে বা দৃঢ়তায় এতটুকুও রেখা পড়ল না। তাঁর ভদ্রতা ও প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রইল। তাঁর বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদন থেকে তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হলেন না। নিরপেক্ষর দল মুগ্ধ হয়ে গেল স্বামীজির ব্যবহারে—মৌনই যে মহান উত্তর ...র উচ্চারণে।

পাদ্রীদের সঙ্গে এই স্বামীজির প্রথম সজ্ঘর্ষ। পরে আরো আছে।

কিন্তু স্বামীজি বিগতভীঃ, ব্রাহ্ম-শ্রীসম্পন্ন। দিবাকর কখনো পূর্বদিক ত্যাগ করে না, স্বামীজিও তেমনি ত্যাগ করেন না তাঁর ধর্মকে। ধর্মই একমাত্র শ্রেয়, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি, আর অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

লিখছেন স্বামীজি: 'ভ্রাতৃগণ, কোনো ভালো কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। শুধু যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে তারাই কৃতকার্য হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডদের পরাভব হোক। ওঠো, আমরা নিশ্চিত জয়ী হব।'

শিকাগোর ট্রেন ধরলেন স্বামীজি।

রাইটের ব্যবস্থানুযায়ী চিঠি এসেছে স্বামীজির কাছে। কোথায় গিয়ে উঠতে হবে থাকতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে রাইট। নিজের পয়সায় টিকিটও কিনে দিয়েছে একখানা।

এ সব কী করে হয়? কার কৃপায়?

'জীবন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য বসে থাকে না—' লিখছেন স্বামীজি: 'দিবারাত্র বলো, তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি। ধন চলে যায়, সৌন্দর্য চলে যায়, শক্তি চলে যায়, জীবন নিবে যায় এক ফুঁয়ে, কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও অম্লান-অক্ষয়। যদি দেহকে সুস্থ রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে তবে দেহের অসুখের সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়ায় তার গৌরব। জড়ের সম্পর্ক না রাখাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি জড় নও। সুতরাং ঈশ্বরে লেগে থাকো, দেহে বা অন্য কোথায় কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন বিপদ আর দুঃখ এসে বিচিত্র ভয় দেখাতে শুরু করে তখন বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়েছ তখনো বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়! তুমি তো এখানেই, আমার সঙ্গেই আছ, আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে অনুভব করছি। আমি এই জগতের নই, আমি তোমার, তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না। হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে নিয়ে যেও না। এই জীবনে একটা মস্ত সুযোগ, তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে বসে থাকবে? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ তাকে খুঁজবে না?'

যদি ধর্মসভায় ঢুকতে পাই কী না জানি বলা হবে সেখানে। কোনো বক্তৃতাই তৈরি নেই, কিছু লিখে নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। তিনি যেমন বলান তেমনি বলব।

শিকাগোতে রওনা হবার আগে স্বামীজি সালেম থেকে গিয়েছিলেন সারাটোগায়। সেখানে আমেরিকান সোশ্যাল সায়ান্স য়্যাসোসিয়েশন তাঁকে ডেকেছিল বক্তৃতা দিতে। সে প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-আলোচনা চলবে না, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে বলতে হবে। তাই সই। যে বিষয় চাও সেই বিষয়ে বলব। সর্ব ব্যাপারে আমি প্রস্তুত। স্বামীজিকে প্রথম বিষয় দেওয়া হল. ভারতে মুসলমানী শাসন ; দ্বিতীয় বিষয়, ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার ; তৃতীয়, ভারতীয়দের রীতি-নীতি সংস্কার বিশ্বাস। সমস্ত বিষয় নখাগ্রে, নখাগ্রে শুধু নয় জিহ্বাগ্রে। যে শোনে সে শুধু শোনেই না, দেখে। বিষয় যাই হোক না কেন দেখে এক বিষয়াতীত বিস্ময়। লৌকিক ছাড়া কিছু চলে না সেই সমাবেশে কিন্তু এঁর আবির্ভাবই যেন অলৌকিকের স্বাক্ষর।

ট্রেনে এক গণ্যমান্যের সঙ্গে দেখা। খুব একজন বড় ব্যবসাদার বলে মনে হচ্ছে।

'কোথায় চলেছেন ?' জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দিতে।'

'উঠবেন কোথায় ?'

'জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড জন হেনরি ব্যারোজ-এর ওখানে।'

'ডক্টর ব্যারোজ ?'

'হ্যাঁ, তাই। দেখুন দেখি এ ঠিকানাটা কোথায় হ...?' স্বামীজি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখালেন সেই ভদ্রলোককে।

কাগজের উপর একবার চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোক বললেন, 'আমিও যাচ্ছি ওদিকে। আমি আপনাকে ঠিক পৌঁছে দেব ঠিক জায়গায়।'

ঈশ্বরের কৃপা অহেতুক।

তাঁর রঙ্গও অকারণ।

প্রকাণ্ড স্টেশন শিকাগো। দুর্দান্ত জনসমুদ্র। উত্তাল ব্যস্ততা চতুর্দিকে। ভিড়ের ঢেউয়ের মধ্যে সেই সদাচার ভদ্রলোক কখন যে কোথায় তলিয়ে গেলেন টের পেলেন না স্বামীজি। গলা বাড়িয়ে

এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন, টিকিরও সন্ধান মিলল না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, নিজেই তবে খুঁজে-পেতে বার করতে হয় ব্যারোজের আস্তানা। ঠিকানাটার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন স্বামীজি। কই, কই সেই কাগজের টুকরোটা ?

সেই ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও অন্তর্হিত।

এখন উপায় ? কাউকে জিগগেস করি।

পথচারীদের সম্মুখীন হলেন স্বামীজি। বলতে পারো ধর্মমহাসভার অফিসটা কোথায় ? ডক্টর ব্যারোজের নাম শুনেছ ? বলতে পারো কোনদিকে তাঁর বাড়ি ?

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুঁ শব্দটিও করে না। কেউ-কেউ বা সটান অগ্রাহ্য করে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বিন্দুমাত্র সাহায্য করবারও কারু মন নেই।

প্রথমত এটা জার্মানদের পাড়া, দ্বিতীয়ত এ লোকটা কাফ্রি না নিগ্রো তার ঠিক কি।

'অন্তত দিতে পারো একটা হোটেলের ঠিকানা ?'

কেউ গ্রাহ্যও করে না। যার পথে যে, সরে পড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিকে অন্ধকার দেখলেন স্বামীজি। ফিরলেন স্টেশনের দিকে, উঠলেন এসে মালগাড়ির খোলা ইয়ার্ডে। দেখতে পেলেন কতগুলি খালি কাঠের বাক্স পড়ে আছে এদিক-ওদিক। বড় দেখে বাছলেন একটা। আর তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে।

আশ্রয় নেই আহার নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই স্বামীজির। যিনি সমস্ত অন্ধকারে দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন তাঁর শিয়রে, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে। সমস্ত বিপদে যিনি আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে যিনি ওষধি, সমস্ত প্রত্যাখ্যানেও যিনি অপরাঙমুখ। দুশ্চিন্তার কুয়াশার রেখাটিও কোথাও রইল না, পরম আরামে ঘুম এল স্বামীজির।

পথ চলতে চলতে যেখানেই সন্ধ্যা হয় সেখানেই সন্ন্যাসীর রাত্রির

শয্যা, সে রাস্তার ফুটপাথই হোক বা রেলইয়ার্ডের কাঠের বাক্সই হোক।

অক্রিয়াই পরাপূজা, মৌনই পরম জপ, অচিন্তাই পরম যোগ, অনিচ্ছাই পরম সুখ। শান্তির মত আর মন্ত্র নেই, নিজের মত আর দেবতা নেই, আত্মানুসন্ধানের মত আর অর্চনা নেই, তৃপ্তির মতো আর ফল নেই। আমি ভবার্ণবে মজ্জমান বলেই তো তুমি আমার উপযুক্ত কূল। আর তুমি কৃপা দিতে অকৃপণ বলেই তো আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র।

ভোর হতেই উঠে পড়লেম স্বামীজি। হাওয়াতে যেন জলের ঘ্রাণ পেলেন। খানিক এগিয়ে দেখতে পেলেন হ্রদ আর তার পাড় বেয়ে প্রশস্ত রাস্তা, যে রাস্তায় বিলাসী ধনীদেরই বসবাস। রাস্তার মতই মনও যদি তাদের প্রশস্ত হত! নিদারুণ খিদে পেয়েছে স্বামীজির, কে তাঁকে ছটুকরো রুটি দেবে, গায়ে দেবে একটু আচ্ছাদন! ভিক্ষে করলে কেমন হয়! আমি সন্ন্যেসী, আমার ভিক্ষে করতে কী দোষ? সন্ন্যেসী তো চিরকেলে ভিক্ষুক।

দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে চেয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামীজি। যতটুকু দিয়ে আমার এ বেলার ক্ষুধার নিবৃত্তি, শুধু ততটুকুই আমার ভিক্ষে। অতিরিক্তে আমার স্পৃহা নেই কণামাত্র।

অপমান করে তাড়িয়ে দিল দ্বারীরা। পরনে ময়লা কাপড়, সমস্ত গায়ে-পায়ে ধুলো, এ কে কিম্ভূতকিমাকার! আর কি স্পর্ধা, খেতে চায় একমুঠো। খাদ্য আবার কেউ ভিক্ষে করে নাকি?

কেউ-কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় সজোরে।

'ভিক্ষে না দাও ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলে দাও।

কেউ কর্ণপাতও করে না।

কোথায় গেলে বা শহরের ডিরেক্টরি বা টেলিফোন-গাইড পাবে তারও হদিস জানা নেই স্বামীজির। কি করি কোথায় যাই কাকে ধরি।

যতক্ষণ পায়ে শক্তি আছে হাঁটি, যেখানেই শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ব সে তোমারই কোল আর তুমি ছাড়া কে আছে আমার হাত ধরবে!

হে জগদীশ্বর, তুমি আমাকে বিতাড়িত করলেও আমি তোমার পাদপদ্ম ছাড়ব না। রোষহেতু মাতার দ্বারা নিরস্ত হলেও স্তনান্ধ শিশু মায়ের চরণ ছাড়ে না কিছুতেই। তুমি থাকতে আমি নিজেকে অসহায় ভাবব? আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে ধৈর্য দাও, তোমার অনন্তশক্তিই আমার রক্ষক আমার এই বিশ্বাসকেই আরো দৃঢ় কর, এই বিপদ-বাধা তোমারই মঙ্গলেচ্ছা, দাও সেই অভয়-আশ্বাস। আমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্যে আমাকে দীন করো, কিন্তু তোমার আনন্দ থেকে আমাকে বিচ্যুত করো না। যে ভয়গ্রস্ত সেই নিরানন্দ। আমাকে সর্বংসহ কর। যেন চিন্তা-বিলাপ-বর্জিত হয়ে থাকতে পারি শেষ পর্যন্ত।

অবসন্ন হয়ে পথপ্রান্তে বসে পড়লেন স্বামীজি।

যা হবার তাই হোক। উত্তীর্ণ হই কি না হই, চরম পরীক্ষার শেষ উত্তর দিয়ে যাই।

'আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?' কে একজন জিগগেস করল কাছে এসে।

ভদ্র, মার্জিত, কোমল কণ্ঠ। চোখ চাইলেন স্বামীজি। রানীর মত দেখতে, স্বরে ও দৃষ্টিতে দ্রবীভূত দাক্ষিণ্য।

আশ্চর্য, কি করে চিনতে পারল? কে পরিচয় দিয়ে দিল কানে-কানে?

'হ্যাঁ, সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।'

'কিন্তু এখানে কেন—এ অবস্থায়?'

স্বামীজি আনুপূর্বিক বললেন তার দুর্দশার কথা।

'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' ভদ্রমহিলা মমতাভরা ঔদার্যে আহ্বান করলেন স্বামীজিকে: 'রাস্তার ওপারে ঐ আমার বাসা। আমার সঙ্গে চলুন। আপনি আমার অতিথি।'

এ কি সম্ভব? নাকি এ ইন্দ্রজাল?

যে মাকে মেনেছে নরেন এ কি সেই আর্দ্রান্তরাত্মা জননী। করুণার কল্পলতা। পীযূষবর্ষিণী সুখস্বর্গদা।

'আপনি কে জানতে পারি?' ভঙ্গুর পায়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি।

'আমি মিসেস জর্জ হেল।'

শালীন, বদান্য ভঙ্গি। স্বামীজি উঠে পড়লেন। অনুগমন করলেন।

'তিনি কি সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ করবেন? কখনো করবেন? লিখছেন স্বামীজি: হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, সমুদ্রে একফোঁটাও জল থাকে না, গভীর জঙ্গলেও এক টুকরো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারেও মেলে না এক মুঠো অন্ন। আর যদি তাঁর কৃপা হয়, মরুভূমিতে নির্মলজল স্রোতস্বতী বইতে থাকে আর ভিখারী ভিক্ষুকেরও জুটে যায় অঢেল দৌলত। একটা চড়ুই পাখি কোথায় উড়ে যাচ্ছে, কোথায় বা ঝরে পড়ছে একটা শুকনো পাতা, তাও তিনি দেখতে পান।

প্রভু, আমার শিব, তুমিই আমার ভালো তুমিই আমার মন্দ। তুমিই আমার গতি আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। আমি কখনো-কখনো একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এ সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনো কারু কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোনো লোক কোনো ভালো লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে কখনো তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু, সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা, তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো সারা জীবন আমি কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে যাতে অপরে আমাকে প্রবঞ্চনা করবে বা আমি অশুভের দিকে ঢলে পড়ব?'

মিসেস হেল স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রচুর সেবাশুশ্রূষা আপ্যায়ন করলেন। শুধু তাই নয় ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে, যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে। যত সব

বিধিনিয়মের বাধা ছিল সব অপসৃত হয়ে গেল। শুধু এখন দুজন, আকাশে ঈশ্বর আর মাটিতে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু-ধর্মের এক ব্যাখ্যাতা।

নিজের কথা ভাবছেন না স্বামীজি। ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের জয়, ভারতবর্ষের জয়। সমস্ত বিশ্ব বুঝুক তার উদার মন্ত্র, তার মিলন মন্ত্র। সমস্ত বিশ্ব বুঝুক শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।

হেলদের বাড়ির সামনেই লিঙ্কন পার্ক। সেখানে মাঝে মাঝে রৌদ্রে হাওয়ায় বসেন এসে স্বামীজি। একটি তরুণী মা তার ছ বছরের ছোট একটি মেয়ে নিয়ে বাজারে যায় স্বামীজির সামনে দিয়ে। স্বামীজি দেখেও দেখেন না। কিন্তু তরুণী মা দেখে সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সন্ন্যাসীকে, কি দয়াভরা চোখ, কি বিশ্বাসব্যঞ্জক দীপ্তি। একদিন তরুণী এসে বললে, 'আমার এই দুষ্টু মেয়েটিকে একটু দেখবেন? আমি বাজারটা সেরে আসি। বাড়ি ফেরবার সময় নিয়ে যাব।'

খুশি হয়ে স্বামীজি মেয়েটির ভার নিলেন। এমনি এক দিন নয়, কয়েক দিন।

মেয়েটি যখন ষোল বছর বয়স তাকে তার মা স্বামীজির একখানি ফোটো দেখাল। বললে, 'এঁকে চিনিস?'

'চিনি মা চিনি। কোথায় তিনি?' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেয়ে।

সেই ছ বছর বয়সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা সেই ভাস্বর স্নেহমূর্তি অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে সেই মেয়ের। সেই মেয়ে আজ ভক্তির সরোবরে শ্বেত শতদল।

মিসেস হেল মহাসভার আপিসে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। দেখুন, প্রাচ্যধর্মের এ আরেকজন প্রতিনিধি। এই এঁর পরিচয়পত্র।

আর কথা কি। নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। আর আর প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বাসা পেলেন। সমস্ত সুলভ ও সুগম হয়ে গেল।

আপনি কোন্ ধর্মের?

'হিন্দুধর্মের।' গৌরবগাঢ় কণ্ঠে বললেন স্বামীজি।

আপনি?

'আমি ব্রাহ্মধর্মের।' বললেন প্রতাপ মজুমদার। 'আর ইনিও আছেন আমার সঙ্গে।' দেখিয়ে দিলেন বম্বের নাগারকারকে।

আপনি ?

'আমি থিয়সফির।' বললেন চক্রবর্তী। 'আর ইনিও আমার দলে।' এনি বেসান্টকে দেখিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আর থিয়সফি তো হিন্দুধর্মেরই শাখা। তা কে না জানে। তবু এঁরা মজুমদার আর চক্রবর্তী, যখন স্বতন্ত্র হতে চাচ্ছেন তখন তাই হোন। আমি সকলকে নিয়ে, আমিই সনাতন। আমার ধর্মের কোনো প্রবর্তন নেই, কোনো পরিবর্তনও নেই। আমি সর্বব্যাপী, অপরিণামী। আমি সেই এক সত্তা, আমরা সকলে সেই এক সত্তা—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম। শাশ্বত ধর্ম।

মৃত্যু সম্মুখীন হয়েও বলো, আমি সেই। এক সন্ন্যাসী ছিল, অনুক্ষণ শিবোঽহং, শিবোঽহং আবৃত্তি করত। একদিন একটা বাঘ এসে তার উপর লাফিয়ে পড়ল ও তাকে টেনে নিয়ে মেরে ফেলল। যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ শোনা গিয়েছিল সাধুর কণ্ঠস্বর : শিবোঽহং, শিবোঽহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, পর্বতশিখরে, গভীরগহন অরণ্যে, যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো, আমিই সেই, আমিই সেই। যতক্ষণ না প্রত্যেক স্নায়ু, মাংসপেশী এমন কি প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্যন্ত এইভাবে পূর্ণ হয়ে যায়, ততক্ষণ কানের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব ভিতরে প্রবেশ করাও। দিনরাত বলতে থাকো আমিই সেই। কোথায় আমার ভয় কোথায় আমার পাপ কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমি নিত্যমুক্ত, আমি কোনোকালে বদ্ধ নই, আমি অনন্তকাল ধরে এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করবে ? আমিই নিরবধি গগনাভ, অতিবেলানিরূপম, আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ। আমি সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ, আমি দেহ নই আমি আত্মা আমি ব্রহ্ম—এই ধর্মই আমার হিন্দুধর্ম।

'হিন্দুধর্মের মত আর কোনো ধর্ম এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না', লিখছেন স্বামীজি : 'আবার হিন্দুধর্ম যে পিশাচের মত

গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয় জগতে আর কোনো ধর্মে তেমন নেই। এতে ধর্মের কোনো দোষ নেই, শুধু কতকগুলি আত্মাভিমানী ভণ্ড ভেদবুদ্ধির সাহায্যে এই আসুরিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করে চলেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে, হিন্দুধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে নয়, হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অনুসরণ করে ও তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম তার হৃদয়বত্তা মিশিয়ে। সুতরাং পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ভগবৎবিশ্বাসের বর্ম পরো, তারপর দরিদ্র, পতিত ও পরপদদলিতের প্রতি প্রেমে প্রেরিত হও। সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করো। সেবা ও সাম্যের মঙ্গলময় বাণী প্রচার করো দ্বারে দ্বারে।'

ধর্মমহাসভা হচ্ছে কেন? কী উদ্দেশ্য?

পৃথিবীর যাবতীয় মহৎধর্মগুলিকে এক রঙ্গমঞ্চে একত্র করা। বিভিন্ন ধর্মে কী ঐক্য আছে তাই বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে নির্বাচন ও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কোন ধর্মের কী বৈশিষ্ট্য, সত্যকে দেখবার ও পাবার কার কী পথ ও প্রণালী তার এবার বিচার-বিস্তার হবে। দেখা হবে এক ধর্ম আরেক ধর্মকে সাহায্য করতে পারে কিনা, পারলে কিভাবে পারে। ঐহিক সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যাবতীয় অত্যাচার অব্যবস্থার অপনয়ন করতে ধর্মের কী শক্তি, কিংবা শক্তি তার আদৌ আছে কিনা। সর্বতম উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি আনতে পারে কিনা ধর্ম—তার পরীক্ষা। পারস্পরিক সৌভ্রাত্রে সম্ভব কিনা সহ-অবস্থান।

দেশ-দেশান্তর থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছে মনীষীরা। পরিচালক কমিটিতে প্রায় তিন হাজার সভ্য। প্রায় দু বছরের উপর চলেছে এর তোড়জোড়। রাশি-রাশি পত্র, রাশি-রাশি দলিল, স্তূপের পর স্তূপ, বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল। একটানা সতেরো দিন ধরে সভা চলবে, সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় অবিচ্ছিন্ন বক্তৃতা। এলাহি কাণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর হয়নি কখনো। অগণন লোক কাজ করছে অফিসে। প্রায় দশ হাজারের উপর চিঠি চল্লিশ হাজারের উপর

দলিল। বক্তৃতা যে কত হবে তার অন্ত নেই। লিখিত পঠিত উদ্গীরিত। শুধু বাক্যের বুদ্বুদ। বাক্যের উৎপাত।

কমিটিতে ভারতীয় পাঁচজন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক আয়ার, নাগারকার, প্রতাপ মজুমদার, মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি ধর্মপাল আর জৈনদের প্রতিনিধি মুনি আত্মারাম। স্বামীজি ? স্বামীজি কেউ নন। তিনি উপর-পড়া। তিনি রবাহূত। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কিন্তু একবার যখন মনোনীত হয়েছি, পেয়েছি প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, দৃঢ়করে পতাকা তুলে ধরব ঊর্ধ্বে। প্রভু, শক্তি দাও। আমাকে তোমার হাতের শঙ্খ করে তোলো। আমি যেন হতে পারি হিন্দুত্বের যোগ্য ভাষ্যকার, হতে পারি তোমারই যোগ্য বার্তাবহ।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, মরীচিকায় জলভ্রান্তির ন্যায় যাতে জগৎ ভাসমান সেই মহারুদ্র সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হই।

পর দিন, এগারোই সেপ্টেম্বর, সভার প্রথম দিন।

সারারাত ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটালেন স্বামীজি।

হে মন ! নিজেকে কখনো পরাভূত মনে কোরো না। সর্বদা তোমার মাথা উঁচুতে রাখো। কারণ তুমি যে ঈশ্বরের বাহক। তুমিই যে গরুত্মান বেদ। তুমি মহতো মহীয়ান ! তুমি ধর্মরূপী বৃষভ, খাদ্য বেদান্ত, যা মানুষকে বলবান বীর্যবান ও ওজস্বী করে। তোমার জ্ঞানে সর্বাস্তিত্বের প্রমাণ, তাই সর্ববিধানের প্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম।

তোমার মন্ত্র সমন্বয়। তোমার শুধু সঙ্গতির সঙ্গীত।

৪৯

আঠারোশ তিরানব্বই সালের এগারোই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা দশটায় গম্ভীরনাদে ঘণ্টা বেজে উঠল। একে-একে দশবার। পৃথিবীর প্রধানতম দশ ধর্মকে আহ্বান করা হচ্ছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জুডা, তাও, কনফুসিয়ান, শিন্তো, জোরোয়া-

ষ্টিয়ান, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ আর প্রটেস্টান্ট। তালিকা প্রস্তুত করেছেন প্রেসিডেন্ট বনি। কিছু বলবার-কইবার নেই। আমার দেশে তোমাদের নিমন্ত্রণ।

খ্রীস্টান্ দেশে অখ্রীষ্টীয়দের যে ডাকা হয়েছে তাই যথেষ্ট। শুধু ঐ অতিকায় দশজনই নয়, লঘুদেহ আরো অনেকেই পাত পেয়েছে। উদ্যোক্তাদের মনে গোড়ায় এক ভাব এসেছিল, অত হাঙ্গামার দরকার কি, শুধু খ্রীস্টধর্মের গুণগান করবার জন্যে সভার আয়োজন হোক। আর সব ধর্ম খ্রীস্টধর্মের চেয়ে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ তাই প্রতিপন্ন করা হোক ঢাকেঢোলে। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল অমন কাঠখোট্টা গোঁয়ারতুমি প্রত্যক্ষে না করাই শোভন হবে। বস্তুত সত্য যখন একমাত্র খ্রীস্টধর্মে, উদ্যোক্তারা আশ্বস্ত হলেন। অন্যান্য ধর্ম তো এমনিতেই হেরে যাবে। আসুক না যত সব আচার-অনুষ্ঠানের ঝুলি নিয়ে, কুসংস্কারের পুঁটলি বেঁধে। দেখি না কার কত দৌড়। সত্যের সঙ্গে সভ্যের সঙ্গে কে কবে পেরেছে? সুতরাং খ্রীস্টধর্মের জয় অবধারিত।

তাই ব্যারোজ অবারিত হতে পারলেন নিমন্ত্রণে। অভাগ্য অভ্যাগতদের এমন আশ্বাসও দিলেন, ভয় নেই, কোনো কলহ বা তিক্তভার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সর্ব্বক্ষণ বইবে বন্ধুতার প্রফুল্ল হাওয়া।

অন্যকে খণ্ডন নয় শুধু নিজের কীর্তন। অন্যকে পাতন নয় শুধু নিজের স্থাপন!

তাই ঘণ্টা বাজল মন্দিরে।

উদ্যোগের পুরোহিতেরা কিন্তু মুখ লুকিয়ে হাসল। ক্রিশ্চিয়ানিটির সামনে আবার স্থাপন-কীর্তন কি! কে দাঁড়াবে শক্ত পায়ে! কে গাইবে গলা উঁচিয়ে!

মিচিগান এভিনিয়ুর পারে আর্ট ইনস্টিটিউট। তার বিরাটতম হল-ঘরে, হল অফ কলম্বাসে সভা হচ্ছে। হলের এক পাশে প্রকাণ্ড মঞ্চ, সামনে পর-পর গ্যালারির কাতার, লোকের পর লোক গাদি মেরে বসা। ছ থেকে সাত হাজারের মধ্যে। মঞ্চে দেয়ালের দিকে দু পাশে

দুই গ্রীক দার্শনিকের মূর্তি, মাঝখানে বিদ্যার দেবী, হিন্দুদের সরস্বতীর অনুরূপ। হাতের মুদ্রা অভয়ঙ্করী।

একটু এগিয়ে এসে মাঝখানে উঁচু এক সিংহাসন, তার দু দিকে সারবাঁধা কাঠের চেয়ার।

সিংহাসনে এসে বসল কার্ডিনাল গিবসন, আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ। আর কাঠের চেয়ারে আসন নিল দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা, আর যারা সভার সঙ্গে উচ্চ তন্ত্রে যুক্ত কিংবা যারা বিশেষ অতিথি।

মঞ্চের উপর, চতুর্দিকে রঙের ঢেউ উঠেছে।

চীনা বৌদ্ধের শাদা পোশাক, গ্রীক চার্চের বিশপদের কালো। জাপানের রঙ রামধনুর, কারুর বা শাদা আর হলদের মিতালি। কেউ পরেছে উচ্চ লালের ধার ঘেঁষে। শুধু কি রঙ? আছে আবার ছাঁট-কাটের বৈচিত্র। কেউ আটসাঁট কেউ বা ঢিলেঢালা। প্রতাপ মজুমদারের তো চোস্ত স্যুট। আর ধর্মপাল শাদা একটি পশমের টিপি।

এরই মধ্যে একখানি চেয়ারে বসে আছেন বিবেকানন্দ, সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, মোটে ত্রিশ বছরের যুবক, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা আর মাথায় গেরুয়া পাগড়ি—যেন আশার আকাশে আশ্বাসের সূর্য।

সামনে বিশাল-বিপুল জনতা। শুধু একতাল নির্বিচার মানুষের পিণ্ড নয়, শিক্ষিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। তার মধ্যে যাজক-পুরোহিতও অসংখ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও হয়নি এত বড় ধর্মসভা। একই মঞ্চে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সম্মিলন। কি করে বলব এদের সামনে দাঁড়িয়ে? স্বামীজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে ঢিপঢিপ করে, হাতে-পায়ে বল-বশ কিছু নেই।

প্রথমেই বলতে উঠল গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি, জান্তের আর্কবিশপ। তারপরে প্রতাপ মজুমদার। তারপরে পুং কুয়াং ইউ, কনফুসিয়ানিজম-এর প্রবক্তা। তারপরে চক্রবর্তী। তারপরে বৌদ্ধ ধর্মপাল।

'এবার আপনি।' স্বামীজিকে চিহ্নিত করলেন সভাপতি।

'আমার নম্বর তো একত্রিশ।' বললেন স্বামীজি।

'তা হোক। এখনই বলুন। এ সকালের পর্বেই।'

'না, এখন না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি : 'পরে বলব।'

স্বামীজি দেখলেন সবাই কেমন লিখে এনেছে বক্তৃতা। কি বলবে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে তৈরী করে এনেছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন স্বামীজি—তাঁর কেন এমন বুদ্ধি হয়নি? এখন আর লেখবার সময় কোথায়? কোথায় বা মিলবে এখন গবেষণার মালমশলা?

কেমন সবাই সানন্দ হাততালি পাচ্ছে, তার বেলায় সবই বোধহয় ছি-ছি করে উঠবে, ছি-ছি না করুক হয়তো বসে থাকবে বিরসমুখে। সভায় কোনো দীপ্তি থাকবে না, স্বাদ থাকবে না, স্ফূর্তি থাকবে না। সব বিবর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

বিকেলের পর্বে প্রথমেই ডাক পড়ল স্বামীজির।

'এখন না।'

লোকটা কি দেবে না নাকি বক্তৃতা? বারে-বারে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সমুদ্রের মত জনতা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝি? দু'চার কথা বলবার মতও সাহস নেই?

আবার ইঙ্গিত এল স্বামীজির কাছে।

'আরো পরে।'

এ কি অকরণ! যদি মুখ বুজে নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে তবে এলে কেন? আসবার জন্যে, টিকিট পাবার জন্যে কত না লড়াই করেছিলে? ভেবেছিলে এ বুঝি ক্লাবঘরে বক্তৃতা না কি মাঠের চিৎকার! যে ধর্মের প্রতিনিধিই এমন ভীরু সে ধর্মের আবার আস্ফালন কি।

চুপ করে আছ, তবে চুপ করেই থাকো।

আরো চার-চার জন প্রতিনিধি তাদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। যথারীতি হাততালি পেলেন সকলে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে আত্মস্থের মত বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি! এবার স্বামীজির বলবার লগ্ন।

দেখ, দেখ, কে দাঁড়িয়েছে মঞ্চে। যৌবনোজ্জ্বল কী মহৎ মূর্তি!

কী আশ্চর্য সুন্দর পোশাক। দেখ, দাঁড়াবার কী দৃঢ়দীপ্ত ভঙ্গি! আর চোখ দেখেছো? প্রেম আর প্রার্থনা একসঙ্গে। বীর্য আর মাধুর্যের সংযোগ। পবিত্রতায় জ্বলছে যেন আগুনের মত।

কী না জানি বলে! কী না জানি তার বলবার!

সরস্বতীকে মনে-মনে বন্দনা করলেন স্বামীজি। মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাধিদেবীকে নমস্কার।

ঋষিসূক্ত মনে পড়ল বোধহয়।

কেউ বাণীকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। কিন্তু কারো-কারো কাছে তিনি আপন স্বরূপ প্রকট করেন যেমন সুবাসা স্ত্রী পতির নিকট প্রকাশিতা।

যিনি ব্রহ্মার মুখে বিরাজমানা সেই সর্বশ্বেতকান্তি সরস্বতী আমার মানস-সরসে নিত্য বিহার করুন। হে দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আমাকে বিদ্যা দাও, প্রশস্তি দাও, দাও প্রতিভা-কল্পনা। তোমার চারহাতে অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ, পাশ আর পুস্তক। তুমি আমার জিহ্বাগ্রে বাস করো। তুমিই শ্রদ্ধা, তুমিই মেধা, তুমিই ধারণা। তুমিই মধুছন্দা। হে স্মিতমুখী সুভগে, তোমাকে নমস্কার। 'মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মমধীর্মাতু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥'

প্রথম কথা কী বললেন স্বামীজি? কী তাঁর সম্ভাষণ?

লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলমেন নয়, বললেন, সিস্টার্স য়্যাণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এ আর এমনি কি নতুন বললেন? মামুলি লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলমেন-এর চেয়ে বেশি কি অভিনব! এতক্ষণ ধরে ভাষণে-বক্তৃতায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই তো বারে-বারে বলা হয়েছে যে সবাই আমরা এক পিতার সন্তান, পরস্পর সবাই আমরা ভাইবোন। তাই স্বামীজির এই সম্বোধনে এমন কি বাহাদুরি!

বাহাদুরি এইখানে যে, ও শুধু মুখের কথা নয় ও প্রাণের কথা, সত্যের স্পর্শে গদগদ! শুনেছ কী উদাত্ত কণ্ঠ, যেন মুক্তদ্বার মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে, আর এ স্বর তাপে তেজে ছন্দে গন্ধে অপরূপ। যদি

এমনি কথার কথা হত, যদি না থাকত এতে সারল্যের সম্পদ, অন্তরের অমৃত, তাহলে কে করত প্রতিধ্বনি? বায়ুতরঙ্গে আরো অনেক কথার মত মিলিয়ে যেত বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে।

কিন্তু এ বলায় হল কী? করতালিতে উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। এ মামুলি করতালি নয়, এ রুদ্ধ হৃদয়ের উদ্ঘাটন। উল্লাসের জলপ্রপাত। শেষের সমর্থন নয় আরম্ভের অভ্যর্থনা। আরম্ভের জয়ধ্বনি।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—থামতে চায় না। এমন করে কে কবে বলেছে! কণ্ঠস্বরে মিশিয়েছে এমন প্রগাঢ় আন্তরিকতা! কার এমন তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিত্ব! কার এমন উদার-উজ্জ্বল ভঙ্গি! শুধু একটা ভাবালুতা নয়, কার এমন সত্যের স্পষ্টতা। আমেরিকাবাসীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন!

উতরোল থামতে চায় না কিছুতেই। উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকে। হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে দেওয়াল-ছাদ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। সমুদ্র হয়ে যাবে মানুষের জনতা। মনুষের হৃদয়।

একটি শব্দের জাদুস্পর্শে এমন অঘটন ঘটবে কল্পনার অতীত ছিল স্বামীজির। তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন। বুঝলেন একেই বলে আদ্যাশক্তি, মাতৃশক্তির লীলা। একেই বলে কৃপাশক্তির বিস্ফোরণ।

কিন্তু লোকজন একটু শান্ত নাহলে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করি কি করে? শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজি। শান্ত, স্থির হয়ে গেল জনতা।

বলতে শুরু করলেন স্বামীজি। প্রথমেই পৃথিবীর তরুণধর্মদের প্রাচীনতম ধর্মের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা করলেন। আর সব ধর্ম নতুন, হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। আর সব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন। হিন্দুধর্মই সমস্ত ধর্মের জননী।

হিন্দুধর্ম দুটো জিনিস শিখিয়েছে—সহনশীলতা আর বহনশীলতা। শুধু সইব না, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব। পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি—হিন্দুধর্ম শুধু এইটুকুই বলে না, বলে, ভাই, কাছে এস,

হাতের হাত সঙ্গে মিলিয়ে চলো। হিন্দুধর্ম শুধু মেনে নেয় না, টেনে নেয়।

আর হিন্দুধর্ম এ শেখায়, সব ধর্মই সমান মহান। সব ধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে, সব রাস্তাই রোমে। যে পথ দিয়েই হোক, সোজাই হোক আর আঁকাবাঁকাই হোক, সব নদীই যেমন পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সব ধর্মই মিলছে গিয়ে সেই পরমবিরামে। 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।' এ কথাই আমার গুরু, আমার দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়-বিজাতীয় হেন সাধন নেই তিনি করেননি, কিন্তু সব সাধনেরই শেষ স্বাদ ঈশ্বর। যত পথ আছে তিনি বিচরণ করেছেন, যত মত আছে আচরণ করেছেন, যত মত তত পথ। মতই আর ঈশ্বর নয়, পথই আর প্রাপ্তি নয়। কিন্তু সব মতে সব পথেই সেই পরম সম্বোধি। পথ বিচিত্র কিন্তু প্রাপ্তি এক। মত বিচিত্র কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বর এক।

মিনিট পাঁচেক বললেন স্বামীজি এবং বলার শেষে যখন বসলেন সমস্ত আমেরিকা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

আর কারো বক্তৃতা শুনতেই চায় না জনতা। এর পরে আর যেন কিছু বলবার নেই। গাইবার নেই। আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা যাব ঐ ভারতীয় সাধুর কাছে। আমরা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখব। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে শুনব। ধরব তাঁর ঐ গেরুয়া আলখাল্লা।

আর, দেখেছ, কি সুন্দর ইংরিজি বলছে! স্পষ্ট, দ্রুত ও সাধু ইংরিজি! এমন অবলীলায় বলছে এ যেন তাঁর মাতৃভাষা। কোথায় শিখল এমন বলবার নৈপুণ্য! জনতাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা! বিদেশী ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে নাকি কোনোদিন? মাঠে-পর্বতে ঘোরা সাধু, এদের আবার শিক্ষায় রুচি, তার আয়াস! তবে এর বেলায় এ অসাধ্য সম্ভব হয় কি করে? সন্দেহ কি, অর্থশক্তি নয়, আত্মশক্তি—অধ্যাত্মশক্তি।

'দর্শন' বলে কোনো কিছু জানত না আমেরিকা, কিন্তু স্বামীজির দর্শন পাবার জন্যে সবাই খেপে উঠল।

কী সুস্নিগ্ধ আয়তশান্ত চোখ দেখেছ। যদি একবার মুখের দিকে তাকায় মনে হয় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পবিত্র হল দেহ-মন। ভেসে উঠল যেন আরেক জগতের ইশারা। চলো চলো এগিয়ে চলো ভিড় ঠেলে। এমন নয়নের প্রসাদ নেবে না?

'দেশে তুমি থাকো কোথায়?' কে একজন জিগগেস করলে।

'কখনো পাহাড়ে পর্বতে কখনো বা বাজারে বন্দরে। কখনো বা শহরের ফুটপাতে। আমি সর্বস্বাধীন। সর্বত্র আমার গতিবিধি। রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুটির, ভিখিরীর গাছতলা।'

'খাও কি?'

'যখন যা জোটে। না জোটে তো খাই না।'

'করো কি?'

'মাধুকরী।'

'পয়সা নেই?

'একটা কপর্দকও না।'

কে একজন পোশাকে আকৃষ্ট হয়েছে। বললে, 'এই বুঝি তোমার দেশের সাধুদের পোশাক?'

'এ তো তোমাদের দেশের বিশেষ এ-অনুষ্ঠানের জন্যে। এ তো ভালো, ভদ্রতম পোশাক। দেশে আমার গায়ে হয় ছেঁড়া কানি, নয়তো চট কিংবা চামড়া।'

'জাত মানো?'

'মানি না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি: 'জাতটা আমাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম নয়।'

'বিয়ে করোনি কেন?' এ একটি তরুণীর প্রশ্ন।

'কাকে বিয়ে করব? যে কোনো মেয়ের দিকে তাকাই আমার মা, জগন্মাতাকে দেখি।'

হোটেলে ফিরে এসে কাঁদতে বসলেন স্বামীজি। ঈশ্বরের কৃপার কথা

ভেবে নয়, মূককে বাচাল করেছেন সে কৃতজ্ঞতায় নয়, কাঁদতে বসলেন বঞ্চিত অধঃপতিত দেশবাসীদের দুঃখের কথা ভেবে। আমার দেশের লোকের যখন এত দুঃখ এত দারিদ্র্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে! যদি দেশকে টেনে তুলতে পারি এই অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে, তবেই আমার যশ তবেই আমার সমাদর।

৫০

সাতাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, টানা সতেরো দিন চলছে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান—সকালে-বিকেলে, কখনো-কখনো দুপুরে। এবং প্রত্যহই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। না বলে উপায় কি! এমনি সব শুকনো জ্ঞানের কথা শুনে অতিষ্ঠ হচ্ছে শ্রোতারা, খানিক পরে-পরেই উঠে-উঠে যাচ্ছে, তাদের ধরে রাখা দুঃসাধ্য। তখন, সেই অবস্থায়, একটি মাত্র মন্ত্র আছে। বশীকরণের মন্ত্র। 'এর পর বিবেকানন্দ বলবে।'

এর পর বিবেকানন্দ বলবে। তবে আর কথা নেই। বসে যাও, যতক্ষণ না এ যন্ত্রণাটা শেষ হয় অপেক্ষা কর।

পোষাবে অপেক্ষা করা। কষ্টকঠিনের পরেই মধুমাধবী।

কী আনন্দময় বিবেকানন্দ! কী উজ্জ্বল গভীরস্পর্শ চোখ, কী হৃদয়গলানো গাঢ় কণ্ঠস্বর। মুখের হাসিটিতে বন্ধুতার গন্ধ! আর কী শুভ্রশুদ্ধ ইংরিজি। হয়তো বা কোথাও একটি পরিচ্ছন্ন আইরিশ সুর।

বিবেকানন্দকে শোনা মানে দেবতাকে শোনা। যেন প্রার্থনার মন্দিরে স্তব-মুগ্ধ হয়ে থাকা। আর কোনো দাবিতে নয়, বিবেকানন্দ যেন বলছে দৈবের দাবিতে। না শুনে তুমি যাবে কোথায়? কে তোমাকে ছুটি দেবে?

যেই বিবেকানন্দের বলা শেষ, অমনি প্রায় হল্ খালি। আর বসে থেকে কি হবে? আর কি শোনবার আছে? বিবেকানন্দ যদি বন্ধ হল, বন্ধ হল আনন্দের জলধারা।

কর্তাব্যক্তিরা বিব্রত হলেন। বিবেকানন্দের বলার পরে সভায় যদি

আর লোক না থাকে তা হলে বিবেকানন্দকে সকলের শেষে বলতে বলো। আর সকলের বেলায় লোক থাকবে না এ কেমনতরো কথা!

'আপনারা বসুন। স্থির হোন। বলবেন বিবেকানন্দ।' ঘোষণা করল কর্মকর্তারা।

'বলবেন? কখন বলবেন?'

'সকলের শেষে।'

'কতক্ষণ বলবেন?'

'পনরো মিনিট।'

তাই সই। বসে যাও। পনরো মিনিট শোনবার জন্যেই বসে যাব পাঁচ ঘণ্টা। পোষাবে বসে থাকা। পনেরো মিনিটই জীবনের রোমাঞ্চরুচির অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর মনে থাকবে। যাবজ্জীবন মনে থাকবে।

সকলেই তো সত্য কথা বলছে, ধর্মের কথা আবার মিথ্যে হয় কি করে? কিন্তু বিবেকানন্দ যা বলছেন তা পুঁথির সত্য নয়, জীবনের সত্য। পরীক্ষিত সত্য, উপলব্ধ সত্য। সে সত্য যেন তাঁর ব্যক্তিত্বে উচ্চারিত। আর তাঁর বাণী যেমনি সরল তেমনি পবিত্র। তাঁর সমস্ত উপস্থিতিই যেন মঙ্গলের আলো। সুহাসবাসিত আশীর্বাদ।

'সমুদয় জগৎ ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদন করো। জগতে যে সব অশুভ ও দুঃখ আছে তা উপেক্ষা করে নয়, সবই মঙ্গলময় সবই সুখময় এ ভ্রান্ত অলস ভাব অবলম্বন করেও নয়, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে সজ্ঞান সন্ধানে ঈশ্বরকে দর্শন করে। এই ভাবেই ত্যাগ করতে হবে সংসার—আর যদি সংসার একবার ত্যাগ হয়, বাকি কী থাকে? বাকি থাকে ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই, তোমার স্ত্রী থাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে দর্শন করো ঈশ্বরকে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করো তার অর্থ কি? ওদের কি রাস্তায় ফেলে দিতে হবে? কখনোই না। ওদের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখ। অনন্তকাল ধরে প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান।

তিনিই স্ত্রীতে স্বামীতে সন্তানে, ভালোয় মন্দে, পাপে পাপীতে, হত্যাকারীতে। সবই সেই প্রভুর বস্তু। তোমার ভোগ্য ধনে তিনি, তোমার মনে যে বাসনা তাতেও তিনি। তুমি যদি তোমার বসনে ভূষণে তোমার বচনে মননে তোমার শরীরে ছায়ায় সর্বদ্রব্যে ঈশ্বরকে স্থাপন করো তা হলে জগতে কোথায় দুঃখ কোথায় ন্যূনতা কোথায় বিচ্যুতি ? যে একত্বদর্শী তার আর মোহ কোথায় ?'

আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত বহ্নি। যৌবনের তেজস্বী উদ্ঘোষ। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কীর্ণতার প্রত্যাখ্যান। কে প্রাতিকূল্য করবে, দাঁড়াও সামনে, আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। আমি একা আর সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে। তাই সই, একাই লড়ে যাব খালি হাতে। ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হয়েও আমি পথের ভিখারী। আমার মরতে কী ভয় ! আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে যাব আমার ঈশ্বরের জন্যে, আমার পরাধীন দেশের নির্যাতিত অজ্ঞানগুহাবাসী দরিদ্রদের জন্যে।

এই অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার কীর্তিমান মূর্তি বিবেকানন্দ।

এত তেজ এত বিশ্বাস এত উন্মুক্ততা এর আগে দেখেনি আমেরিকা। এত সরল এত নির্মল এত বলবীর্যদৃপ্তও কেউ হয় !

পথে-ঘাটে চারদিকে ধ্বনিত হতে লাগল—বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ। পত্র-পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের ছবি। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাঙানো হল বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। বড়-বড় অক্ষরে পরিচয় লেখা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে-ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ, মাথা নত করে ভক্তিতে। দেহমনোময় ঈশ্বরস্মুরের উচ্ছ্বাসে।

মনে সঙ্কল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে সুসিদ্ধ করবে। এই সেই সুস্নিগ্ধ মূর্তি। দেখ দেখ তার বিদ্যাপ্রদীপ্ত পৌরুষ। বিদ্যা কি ? যার প্রভাবে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববিজ্ঞান অধিগত হয়, তাই বিদ্যা।

'কতগুলো ভুলচক হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পোড়ো না। তাদের ফলও পরিণামে শুভই হবে। অন্যরূপ হতে পারে না কেননা

শিবত্ব ও বিশুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। কোনো উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থ-রূপ সর্বদাই একরূপ।

জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলে যাবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করো। অতি জঘন্য মানুষ দেখলে তার বাইরের দুর্বলতাকে লক্ষ্য কোরো না, লক্ষ্য কোরো তার হৃদয়নিহিত ভগবানকে, আর তার নিন্দা না করে বোলো, হে স্বপ্রকাশক, হে জ্যোতির্ময়, ওঠো। হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, হে সর্বশক্তিমান, হে অজ অবিনাশী, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করো। তুমি যে ক্ষুদ্রতায় আবৃত আছ, আবদ্ধ আছ, এ তোমাতে সাজে না। তোমার মধ্যে যে অমিতশক্তি দৈত্য প্রসুপ্ত আছে তাকে জাগ্রত করো, শৃঙ্খলমুক্ত করো। অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনারই উপদেশ। শুধু নিজরূপ স্মরণ করো, তার অর্থ শুধু সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরকেই স্মরণ করো, সেই সদাশিব সদাশক্তি সদাশুদ্ধ পুরুষকে। যে মুহূর্তে আমি অদ্বৈতবাদী, সেই মুহূর্তে মৃত। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মা, আমি নিখিল বিশ্বের একেশ্বর সম্রাট। যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে 'রাজা কোথায়', 'রাজা কোথায়' বলে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার উদ্দেশ পাবে না যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বদ্ধতা সত্য নয়, এ খণ্ডতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই, কোনোদিন হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।'

এই বুঝি হিন্দুর বেদান্ত। মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করে সকলে। কী কথা! কী শাশ্বত সত্য কথা!

'বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয় না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয় না, ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। আমিত্বকে বিনাশ করতে বলে না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাই বুঝিয়ে দেয়। আপাতপ্রতীয়মানের মধ্য থেকে বার করে সত্যরূপকে।'

'আমরা আবার ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাই!' বলাবলি করে শ্রোতার দল: 'ভারতবর্ষই পাঠাক এখানে মিশনারী।'

ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন। কী ধর্ম তুমি ভারতবর্ষকে শেখাতে পারো, কী তোমার স্পর্ধা, তোমরা কোথায় ছিলে, ভারতবর্ষ যখন বেদান্ত দিয়েছে, যখন দিয়েছে বৌদ্ধবাদ যা হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি! কোথায় তোমরা ছিলে যখন হিন্দু বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সুতরাং ধর্মের কথা বোলো না, পারো তো তার কাছে রুটি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও রুটি তৈরি করবার যন্ত্র, নিরন্নকে খাদ্য দাও, দাও তাকে খাদ্য উৎপাদন করবার বৈজ্ঞানিক উপায়। পরশাসন তাকে অজ্ঞানে-দারিদ্র্যে জর্জর করে রেখেছে, দাও তাকে সেই শেকল-ভাঙার সামর্থ্য। তাকে মহৎ হতে পবিত্র হতে দয়ালু হতে শোনাতে যাবার দরকার নেই। সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র আছে, দয়ার সে নিত্যনির্ঝর। তাকে ক্ষুধা থেকে রোগ থেকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র শোনাও—যদি সে মহত্ব সে পবিত্রতা সে করুণা তোমার থাকে।

'আপনি কোথায় আছেন? আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন।' কত লোক সস্নেহ অনুরোধ করতে লাগল।

'আপনাকে যদি অতিথি রূপে পাই, আমরা ধন্য হই, আমাদের গৃহ ধন্য হয়ে ওঠে।'

'শুধু ধন্য? আমাদের গৃহ পুণ্যময় হয়ে ওঠে।'

'মন্দির হয়ে ওঠে।—আপনি যাবেন?'

দেশে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কী বলব! জানো, আমার আর এখন এক কপর্দক অভাব নেই। আমার বাড়ি ভাড়া বা খাইখরচার জন্যে এক পয়সাও লাগে না। ভাবতে পারো? ইচ্ছে করলে এই শহরের যে কোনো সুন্দর বাড়িতে আমি থাকতে পারি। এ বাড়ি নয় তো ও বাড়ি, সব সময়েই কারু না কারু অতিথি হয়ে আছি। এত সুখ যেন কল্পনার অতীত ছিল। ইউরোপে যেতে যে আমার খরচ লাগবে, জানো, তাও আমি এখান থেকে পাব। ক্ষণে ক্ষণে বুঝছি প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন আর আমি তাঁর আদেশ পালন

করবারই চেষ্টা করছি। জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালো বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ শুধু একজন—আর কেউ নয়, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ।'

ধর্মসভার প্রতিনিধিদের বাড়িতে রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অনেকে। শুধু আগ্রহ নয়, সভার কার্যালয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন করছে কেউ কেউ। আমি স্থান দিতে পারি একজনকে, আমি একাধিক। বেশ উদারস্বভাব দেখে কাউকে পাঠাবেন, কিংবা বড় জোর একজন খ্রীস্টান দেশের লোক।

মিসেস জন লিয়ন, ২৬২ মিচিগান এভিনিয়ুতে থাকে, সেও একজন চেয়ে পাঠাল। কোনো শর্ত আরোপ করে দেয়নি। ধর্মের ব্যাখ্যাতা যখন তখন নিশ্চয়ই সাধারণের বাইরে।

খবর এল, তোমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একজনকে।

বাড়ি তখন অতিথিতে ভর্তি, শহর-মফস্বল থেকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছে এই ধর্মসভার আর্কষণে, কোনো ঘরই আর খালি নেই। এখন এই প্রতিনিধিকে জায়গা দিই কোথায়? মিসেস লিয়ন ভাবনায় পড়লেন। দেরি নেই, আজ সন্ধ্যায়ই তো সে আসছে।

তোর ঘরটা খালি করে দে। বললেন বড় ছেলেকে।

কে আসছে?

কই, নাম পাঠায়নি তো। যে আসুক, ঘর একখানা তাকে দিতে হবে। তুই কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে।

কে এমন সে নবাবপুত্তুর! ছেলে গজগজ করতে লাগল, কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হল না।

আসতে-আসতে সেই মধ্যরাত্রি!

ঘন্টা শুনে দরজা খুলে দিয়ে তো সবাই বাক্যহীন। এ কি! স্বামী বিবেকানন্দ!

মিসেস লিয়ন স্বামীজিকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। এইখানে থাকবেন আপনি।

ঘর নিয়ে নয়, বাড়িতে থাকা নিয়েই আপত্তি উঠল। প্রবল, প্রমত্ত আপত্তি। আপত্তি উঠল বাড়িতে যারা আত্মীয়-বন্ধু সমবেত হয়েছে

তাদের দিক থেকে। এ কালা-আদমির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা চলবে না আমাদের। না, কিছুতেই না। হলই বা না ধর্মবক্তা কিন্তু গায়ের রঙ তো অবিমিশ্র সাদা নয়। যে করে পারো তাড়াও গেরুয়াধারীকে।

মিসেস লিয়ন মহা কাঁপরে পড়লেন। হোমরাচোমরা সব আত্মীয়, তাদের চটানো দুঃসাধ্য। এদিকে স্বামীজিও আমন্ত্রিত। তাঁর প্রতিও বা রূঢ় হই কি করে?

আজ রাতটা শান্ত হয়ে কাটাও সকলে। মিসেস লিয়ন আত্মীয়দের প্রবোধ দিতে চাইলেন। কাল সকালে না হয় স্বামীজিকে সামনের হোটেলে উঠে যেতে বলব।

সকালে লাইব্রেরি-ঘরে স্বামীজির টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিসেস। মিস্টার লিয়ন খবরের কাগজ পড়ছেন।

'এখন কি করা! 'মিসেসের স্বরে কুণ্ঠার কুয়াশা জড়ানো।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না মিস্টার।

'নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এখন কি করে বলি হোটেলে গিয়ে উঠুন!'

'কাকে কী বলবে?' কাগজের মধ্যে ডুবে থেকেই প্রশ্ন করলেন মিস্টার।

'স্বামীজিকে।'

'তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।' কাগজ ফেলে দিয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন মিস্টার।

'তাড়িয়ে দেব?' মিসেস লিয়ন পিছিয়ে গেলেন দু পা।

'একশোবার দেবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার: 'এ সব আত্মীয়ের মুখদর্শন করাও পাপ। এত বড় লোক, আমি পাব কোথায়? বলে কিনা কালো? অন্তরজ্যোতিতে কী দিব্যদীপ্তিমান পুরুষ, কার সাধ্য ওঁর সামনে এসে দাঁড়াক একবার দেখি। আগুনের আবার রঙ কী! কী রঙ বসন্তের! তুমি স্বামীজিকে বলো যতদিন খুশি তিনি থাকুন এ বাড়িতে, আর ওঁরা, আমাদের একচক্ষু আত্মীয়েরা, যে যার পথ দেখুন, কেটে পড়ুন। আর যদি থাকতে চান মিলে-মিশে থাকুন এক আকাশের নিচে একই মাটির মত।'

মিস্টার লিয়নের এই রোষরুদ্র মূর্তি দেখে আত্মীয়েরা সমস্ত জোর খুইয়ে বসল। যাব-যাব করেও যেতে পারল না। থাকল মিলে-মিশে ঘাড় গুঁজে।

স্বামীজির উদার উপস্থিতিই ভেঙে ফেলল অন্ধ জেদের উদ্ধত প্রাচীর। এক খাবারের টেবিলে বসল সবাই পাশাপাশি।

আমরা সকলেই সেই এক অমৃতের অধিকারী। এক পঙক্তির সরিক। এক ভোজ্যের ভাগীদার।

লিয়নদের একটি নাতনি আছে, ছ বছর বয়স, তার সঙ্গে স্বামীজির খুব ভাব। নাম কর্নেলিয়া।

'তোমাদের দেশের গল্প বল না।' কর্নেলিয়া এসে অনুনয় করে।

'আমাদের দেশের গল্প! উঃ, সে কত বড় দেশ—জানো, কত বানর আছে সেখানে, গাছে-গাছে লাফানো পাল-পাল বানর, আর কত ময়ূর, আর ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়া কত সবুজ টিয়ে—যাবে তুমি আমাদের দেশে? কত বড়-বড় বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, কী সুন্দর ছায়া, কী সুন্দর কচি-পাতার শিরশির—'

যেন পরী-অপ্সরীর দেশ। কর্নেলিয়ার চোখে স্বপ্নের রঙ লাগে। বলে, 'ও কি, থামলে কেন?'

স্নেহের তুলি দিয়ে আরো কত কি ছবি আঁকেন স্বামীজি। গল্পের আনন্দে কর্নেলিয়া একেবারে স্বামীজির কোলের উপর উঠে বসেছে। বলছে, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'তুমি তো ইস্কুলে পড়। তোমার ভূগোলের বই নিয়ে এস। দেখিয়ে দি।'

কর্নেলিয়া ভূগোলের বই নিয়ে এলে মানচিত্রে লাল জায়গাটা চিহ্নিত করলেন স্বামীজি। এই আমাদের দেশ। ইংরেজের অহঙ্কারে রক্তিম। আমাদের বেদনায় রক্তাক্ত।

'জানো, আমাদের দেশ গরিব।' বললেন স্বামীজি, 'তোমার বয়সের কত মেয়ে লেখবার-পড়বার সুযোগ পায় না।' লিয়ন-দম্পতির দিকে তাকালেন: 'আমি এ দেশে শুধু আমার ধর্মের কথাই বলতে আসিনি,

আমার দেশের দৈন্য কি করে মোচন করতে পারি তারও উপায় খুঁজতে এসেছি।'

ধর্মসভার একটা বিজ্ঞান-শাখা বলে বিভাগ আছে। সেখানেও বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। নানা দুরূহ বিষয়ের উপরেই বলছেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ব ও বেদান্তদর্শন কিংবা ভারতের ইদানীন্তন ধর্ম কিংবা হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব কিংবা বৌদ্ধধর্মই হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ রূপ। 'হিন্দুত্ব ছাড়া বুদ্ধত্ব নেই।' বলছেন স্বামীজি, 'আবার বুদ্ধত্ব ছাড়া হিন্দুত্ব পঙ্গু। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মেশাতে হবে বুদ্ধকরুণা। অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে মানবীয়তা। দৈবের সঙ্গে জৈবের গ্রন্থি।'

শুধু কি ধর্মসভায়? ধর্মসভার বাইরেও বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে।

বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাচ্ছেন। ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তিনি যে মহৎ কাজ করবেন তারই উদ্দেশে এ দান। তোমার দেশের লোকদের আমরা চিনি না, কিন্তু যে দেশের লোক তুমি, তার যদি উপকারে আসতে পারি আমরা থাকব না পিছিয়ে।

স্বামীজির তো টাকার থলে নেই, একটা রুমালে করে বেঁধে আনেন টাকা। মিসেস লিয়নের কোলে ঝরঝর করে ঢেলে দেন। মিসেস লিয়ন তাঁকে চেনান কোনটা কোন ধরনের মুদ্রা, কোনটার কত মূল্য। তারপর একত্র করে স্বামীজির পক্ষে নিজের ব্যাঙ্কে রেখে দেন জমা করে।

'কি সুন্দর টুপি তোমার মাথায়'! কর্নেলিয়া চোখ বড় করে তাকায়।

'এ টুপি কে বললে? এ খোলা যায় আবার বাকানো যায় গোল করে।' হাসিমুখে বললেন স্বামীজি।

'তবে ফেলনা খুলে।' কর্নেলিয়ার চোখে জ্বলন্ত কৌতূহল।

'খুলে ফেলব?'

'আবার যখন পাকিয়ে জড়িয়ে নিতে পারবে তখন খুলে ফেলতে দোষ কি। দেখি না!'

'তোমার যখন ইচ্ছে—' স্বামীজি অনায়াসে খুলে ফেললেন পাগড়ি। নতুন করে কি ভাবে ফের বাঁধতে হয় শিখিয়ে দিলেন কৌশল।

'আমাদের আমেরিকার খাওয়া নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হচ্ছে না।' বললেন মিসেস লিয়ন, 'নিশ্চয়ই ফিকে লাগছে, হয়তো বা জোলো—'

'না, না, আমার বেশ ভালো লাগছে, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।' বললেন স্বামীজি, 'যখন যেমন তখন তেমন এই আমার জীবনের শিক্ষা, যে দেশে যে আচার।'

তবুও স্বামীজির জন্যে এক বোতল সস্ কিনেছেন মিসেস লিয়ন যদি তিনি স্বাদে একটু বা ঝাঁজ পান।

'এই সস্ দু এক ফোঁটা আপনার মাংসের প্লেটে ঢেলে নিতে পারেন।' মিসেস লিয়ন বললেন উৎসুক হয়ে।

অঢেল হাতে বোতল উপুড় করলেন স্বামীজি।

কর্নেলিয়া তো বটেই, টেবিলের আর-সকলে চেঁচিয়ে উঠল 'এ কি সর্বনাশ! এ সস্ যে ভীষণ ঝাল।'

স্বামীজি মুচকে হাসলেন। পরম আরামে খেলেন মাংসটা।

সেই থেকেই খাবার টেবিলে স্বামীজির জন্যে রোজ এক বোতল সস্ রাখছেন মিসেস। যা ওঁদের কাছে মরণ তাই স্বামীজির কাছে ছেলেখেলা।

৫১

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তবু কিনা আমেরিকানদের কুণ্ঠা। একটু বা উন্নাসিক অবজ্ঞা।

'আপনাদের মধ্যে কজন পড়েছেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ?' ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে-দিতে একদিন মাঝপথে হঠাৎ থেমে পড়লেন স্বামীজি। শ্রোতাদের মধ্যে কোথাও বুঝি বা লক্ষ্য করেছেন একটু বিরাগের ভাব, একটু বা বিদ্রূপের। হুঙ্কার করে উঠলেন: 'যাঁরা যাঁরা পড়েছেন, দয়া করে হাত তুলুন। তুলুন। সত্যের কাছে যাঁরা সাহসী তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন না। অকপট হোন।'

কত গণ্যমান্য শিক্ষিত বিদগ্ধের ভিড়, কিন্তু হাত তুলল মোটে তিনজন।

তেজস্বী সিংহের মত কেশর ফোলালেন স্বামীজি। তীক্ষ্ণ প্রহারের মত বর্ষণ করলেন তিরস্কার। মোটে তিনজন! আর তাতেই আপনাদের জনমত। আপনাদের বিচার করার দুঃস্পর্ধা।

নিজেদের বিদ্যার বহর দেখে মাথা হেঁট করল আমেরিকানরা।

আসলে ওদের তত দোষ নেই, ওদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আর এই ভুল বোঝানোর পাণ্ডা হচ্ছে ইংরেজ—ভারতবর্ষের সর্বশোষণের যে অজগর। শোনো, আমার কাছ থেকে শেখ। হিন্দুধর্মই সমস্ত বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছে, পেরেছে করতে। তোমরা কোথায় ছিলে যখন হয়েছে সে উদার শঙ্খনাদ! তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে পুরুষ—তোমার আমার মধ্যে এক যে সেই সূর্য—তাকেই দেখেছে মুক্ত চক্ষে। আয়ত চক্ষে।

শোনো আমি যা বলছি।

তোমার কথা না শুনি এ আমাদের সাধ্য কি। তুমি দুর্বার সত্যের তেজে সমুজ্জ্বল। তুমি অপ্রতিরোধ্য।

তিনি চলেন, তিনি আবার নিশ্চল। তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটস্থ। তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে, আবার তিনি সমস্ত জগতের বহির্ভূত। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপের সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের মুখ ঢাকা। হে পূষন্, হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্ম, আমার উপলব্ধির জন্যে সেই আচ্ছাদন অপসারিত করো। হে মহৎ একাকী, হে নিয়ন্তা, তোমার রুদ্রতেজ সংবরণ করো, তোমার শোভনতম কল্যাণতম রূপ আমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষও যে, আমিও সে-ই। শোনো। যে সমুদয় বস্তু সেই পুরুষে এবং সমুদয় বস্তুতেই সেই পুরুষকে দেখে সেই দর্শনের বলে তার আর কোনো ঘৃণা নেই অসূয়া নেই, নেই ভেদবুদ্ধি। সেই একদর্শীর একত্বদর্শীর কোথায়ই বা মোহ, কোথায়ই বা শোক। পূর্ণর সঙ্গে পূর্ণ যোগ করলে সমুদ্ভূতও পূর্ণ—পূর্ণর থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে অবশিষ্টও পূর্ণ।

আরো শোনো।

বলছেন স্বামীজি, 'এ নয় যে খ্রীস্টান হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক, বা হিন্দু কি বৌদ্ধ খ্রীস্টান হোক। আসল কথা পরস্পর পরস্পরের ধর্মসৌরভ গ্রহণ করুক। নিজের-নিজের প্রাণবায়ু ঠিক রাখুক, নিশ্বাসে নিক প্রতিবেশী ফুলের সুগন্ধ। ব্যক্তিত্ব বিশুদ্ধ রেখে উদার সমন্বয়। আর এ জেনো ধার্মিকতা বা পবিত্রতা বা চিত্তের বিশালতা কোনো মঠ বা মন্দির বা গির্জের একচেটে নয়। প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতেই এক মন্ত্র লেখা—শান্তি আর কল্যাণ, প্রেম আর মৈত্রী।'

খ্রীস্টান মিশনারীরা রুষ্ট হন। তাদের ভাত মারা যায় বুঝি। এতকাল তারা বোঝাতে চেয়েছে যে হিন্দুধর্ম শুধু পুতুলপুজো, এক বাণ্ডিল কুসংস্কার। বজ্রবিদ্যুন্ময় বাত্যার মত স্বামীজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মতবাদের উপর, সমস্ত ধূমধূলি মেঘকুয়াসা উড়িয়ে দিয়ে উদঘাটিত করলেন অখণ্ড আকাশের উদার নীলিমা। হিন্দুধর্মই বিশ্বজনীন, বেদান্তের হিন্দুর বসবাস শুধু দেশে নয় বিশ্বে, শুধু বা বিশ্বে নয় ত্রিভুবনে।

'আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য,' বলছেন স্বামীজি, 'তা এই যে মানবাত্মা অজ, অবিনাশী, সর্বব্যাপী সর্বভৌমিক। কোনো বাক্য কোনো বেদ এর মহিমা প্রকাশ করতে অক্ষম, যার সামনে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী—শুধু নরনারীই নয়, উচ্চতম দেবতা থেকে তোমার পদতলস্থ ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করলে ভৌতিক উন্নতি হবে, চিন্তার উপর প্রয়োগ করলে মনীষার বিকাশ হবে আর নিজের উপর প্রয়োগ করলে মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠবে। জড় আমাদের লক্ষ্য নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। আর মানুষকে ঈশ্বর করার ধর্মই হিন্দুধর্ম।'

আর তোমরা, পাদ্রীরা, এসব কী কাণ্ড করছ বল দেখি। তোমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের স্কুলপাঠ্য বইয়ে ছবি ছেপেছ যে হিন্দু মা তার সন্তানকে গঙ্গায় কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করছে। আর বলিহারি

তোমাদের রুচি, মাকে কৃষ্ণকায়া করে তার শিশুকে করেছ শ্বেতাঙ্গ। যাতে সহজেই তোমাদের দেশের লোকের সহানুভূতি জাগে ঐ শিশুর উপর। হিন্দু তার শত্রুদের পীড়ন করতে চায়—তাই ছবি ছেপেছ, সেই হিন্দু তার স্ত্রীকে এক খুঁটিতে বেঁধে পোড়াচ্ছে যাতে তার ঐ স্ত্রীর ভূত শায়েস্তা করতে পারে শত্রুদের। সেদিন বইয়ে দেখলাম এক পাদ্রী সাহেব তাঁর কলকাতা-দর্শনের বিবরণ দিচ্ছেন। লিখছেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে আর তার চাকার নিচে পড়ে পিষ্ট হবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছে ধর্মোন্মত্ত জনতা। এসব গাঁজাখুরি পেলে কোথায়? মেমফিস শহরে সেদিন এক পাদ্রী বললেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে শিশুদের কঙ্কালে পরিপূর্ণ একটা করে পুকুর আছে। এ সবের মানে কী? খ্রীস্টশিষ্যদের হিন্দুরা কী করেছে যে প্রত্যেক খ্রীস্টান ছেলেমেয়েদের শোনানো হবে হিন্দুরা মন্দ, হিন্দুরা দুষ্ট, পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরা জঘন্যতম জীব, এক কথায় বর্বর বিশেষ। যাতে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা চাঁদা দেয় মিশনে, হিন্দু-উদ্ধারে। হিন্দুদের ধর্ম-ব্যাপারে শিক্ষিত-সংস্কৃত করতে না পারলে যেন তাদের ঘুম নেই, ঘুচবে না মাথাব্যথা। কিন্তু আমি এসব হেঁট মাথায় মেনে নেব না কিছুতেই, সবলে ছিন্ন করব সব মিথ্যার কুয়াশা। চোখে চোখ রেখে আমাকে দেখ, কান পেতে শোনো আমার কথা—আমিই সমস্ত মিথ্যার জাগ্রত প্রতিবাদ, অভ্রান্ত সত্যের জ্বলন্ত উপস্থিতি।

'হ্যাঁ, বলো, আমাকেও আমার মা জলে কুমিরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন,' স্বামীজি বলছেন শ্লেষ করে, 'আর আমি তোমাদের বাইবেলের জোনার মত আবার পারে উঠে এসেছি।'

যীশুখ্রীষ্ট শিরোধার্য, কিন্তু তাঁর নামে যে মারামারি কাটাকাটি করছ, দেশেবিদেশে জ্বালিয়েছ যে নির্যাতনের আগুন, তাতে তার মুখ প্রশান্ত বা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কি? যদি আজ এখানে তিনি থাকতেন মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে একটুকরো পাথর পেতেন কিনা সন্দেহ।

'কী যীশুর ধর্ম তা আমার কাছ থেকে শোনো।' খ্রীস্টধর্মের প্রেম আর ভক্তির কথা বলতে লাগলেন স্বামীজি।

'তুমি এত কথা, খ্রীস্টধর্মের আদর্শের কথা, কী করে জানলে?' এক ধর্মযাজক জিগগেস করলেন স্বামীজিকে।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'যীশু যে প্রাচ্যের লোক। আমারই দেশবাসী। তাঁর কথা আমি ভালো জানব না তো আর কে জানতে পারবে?'

শোনো, যারা ভয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা অধম, অক্ষম, অপরিণত। ঈশ্বর এক প্রচণ্ড পুরুষ, তাঁর এক হাতে দণ্ড আরেক হাতে চাবুক, তাঁর কথা না শুনলে শাস্তি পেতে হবে, তারই জন্যে তাঁকে উপাসনা করব? কিংবা তাঁর আদেশ পালন করলে জুটবে কিছু পার্থিব সুখ সেই লালসায়? আমি কি ভিক্ষুক না কি আমি ক্রীতদাস? আমি প্রেমী। আমি সমর্থ, আমি কৃতার্থ, আমি পরিপূর্ণ। আমার ভালোবাসায় কেনা-বেচা নেই, আমি দোকানদারি করতে বসিনি। একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাকে ভালোবাসলাম, সে কি আমার কাছে কিছু চায়, না, আমিই কিছু প্রার্থনা করি তার কাছে? তবু তাকে দেখে আমার কত আনন্দ কত শান্তি কত প্রসাদ, আর মনের কোণে কোথাও যদি এতটুকু ভয় থাকে, ভালোবাসাই তো পারে তা দূর করতে। পথিপার্শ্বে তরুণী মা দাঁড়িয়ে আছে, একটা কুকুর ডাকলেই সে ভয় পেয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু যদি তার শিশু তার সঙ্গে থাকে আর যদি কোনো সিংহ এসে তার শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই মা কোথায় যাবে মনে করো? তার ঘরে, না, সিংহমুখে? অবশ্যই সিংহমুখে, যেহেতু প্রেম তাকে নির্ভয় করেছে, পরিণামের কথা ভাববারও সময় দেয়নি। আর এই সে প্রেম যার বিকল্প নেই, যার জন্য আর দ্বিতীয় পাত্র নেই। যাকে ভালোবাসা মানেই সকলকে ভালোবাসা।

পাদ্রীরা যদি বা ক্ষান্ত হয়, স্বদেশের লোকই শত্রুতায় মাতে। আর এ যে-সে লোক নয়, ধর্মনেতা, শিকাগোর সভায় বক্তা সেজে এসেছে। নিজে বিশেষ কলকে পায়নি বলেই স্বামীজির প্রতি ঈর্ষা। চাল নেই চুলো নেই কোথাকার এক যুবক সন্ন্যাসী এসে মুহূর্তে তাঁর ও তাঁর দলের

জাঁক ভেঙে দিল, এ অসহ্য। স্বামীজির পূর্ববৃত্তান্ত জানেন কিছু, কর্তৃপক্ষ উৎসুক হয়ে জিগগেস করল সেই লোকটিকে। জানি না? খুব জানি। ধর্মনেতা মনের সুখে ঝাল ঝাড়ল। ও একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে। ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনে না, নামও শোনেনি কোনোদিন। লোক ঠকানোই ওর ব্যবসা, সন্নেসীর ভেক ধরে এখন এসেছে বিদেশে।

না, না, এ আমরা মানতে প্রস্তুত নই। চোখের সামনে দেখছি যে ভাস্বর মূর্তি। নবোদিত সূর্যের মত সুন্দর, যার মুখে এমন সত্যস্বচ্ছ কথা, দুই চোখে অগাধ আহ্বান, জ্যোতির্ময় আনন্দধামের সঙ্কেত, তাকে প্রতারক বলি কি করে, কি করে বলি এ সব শুধু অভিনয়? অগ্নিময় আন্তরিকতাকে কি স্পর্শমাত্রই চেনা যায় না? এ এক দৈবী দীপ্তি। দৈবী দীপ্তি ছাড়া এ কিছু নয়।

তবু দেখা যাক আরো পরীক্ষা করে।

'আমাকে লোকে উপহাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, বদমাস জোচ্চোর বলেছে, আর তাদের কথা ভেবেই সব সহ্য করছি।' লিখছেন স্বামীজি: 'এ জগৎ দুঃখের আবাস কিন্তু আবার তা শিক্ষার মন্দির। এ দুঃখ থেকেই আহরণ করি সহিষ্ণুতা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে শত বিপদে-বৈফল্যেও মানুষকে নিষ্কম্প রাখে। যারা আমাকে ভণ্ড বলে তাদের কোনো দোষ নেই। তারা ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষীণদৃষ্টি—পানাহার, অর্থোপার্জন, আর বংশবৃদ্ধি—এই নিষ্প্রাণ নিয়মে তারা আবদ্ধ। তাদের কাছে যেও না। যারা ধনী, গণ্যমান্য, উচ্চপদাসীন, তাদের জীবনীশক্তি নেই, তারা মৃতকল্প, তাদের ভরসা রেখো না। ভরসা শুধু তোমাদের উপর, যারা পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু উদ্দীপ্ত-বিশ্বাসী। বৎস, কোনো কৌশলের প্রয়োজন নেই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্যে প্রাণে-প্রাণে কাঁদো আর ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। সাহায্য আসবেই আসবে। যে আন্তরিক হয় কিছুই আর তার অন্তরালে থাকে না।'

অনেক সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে স্বামীজির বক্তৃতার জন্যে ভিড় করেছে। তাদের কারু কারু বা ইচ্ছে স্বামীজিকে সংসারপথে টেনে

নিয়ে যায়, ভ্রষ্ট করে সন্ন্যাসধর্ম থেকে। তার জন্যে মিসেস লিয়নের খুব দুশ্চিন্তা। লোকব্যাপারে অনভিজ্ঞ, সর্বদা অন্যমনস্ক, শিশুর মত সহজনির্ভর, আকস্মিক কোনো ভুল করে না বসে। গেলেন তিনি স্বামীজিকে সতর্ক করতে, মায়ের সস্নেহ উদ্বেগে।

মায়ের উদ্বেগের উত্তরে স্বামীজি বললেন, 'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার জন্যে ভয় করো না।' গদগদগাঢ়স্বরে বললেন স্বামীজি, 'এ সত্যি, আমি মুক্ত প্রান্তরে গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাতেই অভ্যস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি রাজপ্রাসাদে পালঙ্কে শুয়েও ঘুমিয়েছি আর রাজার আদেশে তার দাসী সারারাত ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে আমাকে ব্যজন করেছে। আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। প্রলোভনে আমার ভয় নেই—গুরু আর গেরুয়াই আমার রক্ষাকবচ।'

'গেরুয়া?'

'হ্যাঁ, গেরুয়াই তো বিলাসব্যসন আর কামকাঞ্চনের প্রতিষেধ। আজ যদি গেরুয়া জগতে না থাকত তাহলে ভোগলালসা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যত্ব হরণ করে নিত।'

'আর গুরু?'

'হ্যাঁ, আমার পরম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন। আমি যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় খাঁটি আছি কারু সাধ্য নেই আমাকে বশীভূত করে বা আমার প্রতিবন্ধক হয়। আমি যদি সংসারত্যাগ না করতাম তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা প্রকাশিত হত না। আমার গুরুদেবের সত্যই রাখবে আমাকে সত্য পথে, অকম্প পবিত্রতায়।'

দৃঢ়ব্রত সর্ববন্ধনির্মুক্ত স্বামীজি। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই কিছুতেই। বিমলবোধ শিশু, তন্তুতে তন্তুতে সাধু, অকৃত্রিম সারল্যের অমিয়নির্ঝর। আত্মার অভিঃমন্ত্রের উদ্ভাসক, অদ্বৈত বেদান্তঘন দেহ, কে তাতে ছায়া ফেলে! অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মমূর্তি—কে তার কাছে ঘেঁষে! শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপ্রসূতা আধ্যাত্মিক গঙ্গা যে বইয়ে দিয়েছে তাকে দেখা মাত্রই ধুয়ে যাবে অস্বাস্থ্য। উত্থিত হবে প্রার্থনা, হে

নির্মলকান্তি, তোমার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ আর দ্রোহ, দ্বেষ আর অনৃত ভাসিয়ে নিয়ে যাও। অবিদ্যাকে নিঃশেষনির্মূলিত করো। ক্ষুদ্রসত্তা থেকে মুক্তি দাও।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন স্বামীজি। যারা প্রলুব্ধ করতে এসেছিল প্রণত হল পদপ্রান্তে।

সকলে বুঝল পরাক্রান্ত মহান সূর্যের মতই একা-একা ভ্রমণ করছেন স্বামীজি। চোখে চরম জ্ঞানের জ্যোতি, জিহ্বায় উপনিষদ, মুখমণ্ডলে বুদ্ধের শান্তি, যীশুখ্রীস্টের প্রেম। আর কারু সংশয় নেই, এ লোক ঈশ্বরের প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট আধিকারিক পুরুষ। ঊর্ধ্বহস্তে শুধু কৃপা আর অভয়। কণ্ঠস্বরে পরম সত্যের বজ্রনির্ঘোষ, কখনো বা করুণার জলপ্রপাত। আর সমস্ত উপস্থিতিই উদার বন্ধুতায় উচ্ছ্বসিত।

'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার এক জায়গায় শুধু প্রলোভন!' বললেন স্বামীজি।

'কোথায়?' মিসেস লিয়নের চোখে বা ভয়ের আভাস।

'কোনো মানুষে নয় মা।' স্বামীজি হাসলেন : 'আমার প্রলোভন আমেরিকার এই বলিষ্ঠ সংগঠনে। সর্বত্র বিরাটের যজ্ঞে বিরাটের নিমন্ত্রণ।'

শুধু তাই? দয়া নয়? ভালোবাসা নয়? নয় অজস্র উদার অভ্যর্থনা?

যে দরজায় গিয়ে দাঁড়ান সে দরজাই খুলে যায়। যার চোখের দিকে তাকান সেই আলোর জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে।

কেন? আমেরিকানদের মধ্যে ধর্মের প্রবণতা প্রবল বলে।

কিন্তু চতুর্দিকে এত খ্যাতি আর যশকীর্তন, বিলাসবিচিত্র সমাদর— স্বামীজি নিরালায় কাঁদতে বসলেন। আমি বিবিক্তসেবী সন্ন্যাসী, আমার স্বাধীনতা গেল, আমি পত্র-পত্রিকার মুখাপেক্ষী হলাম। আর যেখানে আমার দেশের লোক না খেয়ে মরছে সেখানে আমার সুখসৌভাগ্যভোগ অসহ্য। হে ঈশ্বর, তবু জানি তোমার অনন্ত শক্তিই

আমার রক্ষক, তাই আমাকে নির্ভয়-নির্বিচল রাখবে। লিপ্ত হতে দেবে না, মুগ্ধ হতে দেবে না। বিরত হতে দেবে না।

৫২

ফরাসিনী গায়িকা এমা কালভে তখন শিকাগোতে। মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গান গাইতে এসেছে। এর আগে মাতিয়ে দিয়েছে নিউ ইয়র্ক, তারো আগে ইউরোপ। যে শহরেই গিয়েছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—সুরের আগুন। ঝড় তুলে দিয়েছে—সুরের ঝড়।

লালসাবাসিনী বিলাসিনী কালভে। ঝড়ের মতই দুর্দান্ত। আগুনের মতই লেলিহান।

একটি মাত্র মেয়ে, তারই উপর তার যাবজ্জীবনের ভালোবাসা। সেও এসেছে মায়ের সঙ্গে।

একদিন, কেন কে জানে, অপেরায় যেতে তার মন উঠছে না—সন্ধে থেকেই মনে কেমন বিষাদের ছায়া। কারণ কি? কোন কারণই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অকারণে খারাপ হয় না মন? তা হোক, তাই বলে গান গাইবে না থিয়েটারে?

সেদিন প্রথম অঙ্কে কী অপরূপ সুন্দর গান গাইল কালভে। প্রথম অঙ্কটা দারুণ জমল। যেন একটা জ্বলন্ত আনন্দের বন্যা খেলে গেল। হাততালি আর থামতে চায় না।

বিরতির সময় কালভের মনে হল বুক কাঁপছে, চোখে ঝাপসা দেখছে, দেহেমনে নেমে এসেছে অকাল ক্লান্তির মালিন্য। ঠিক করলে নামবে না আর দ্বিতীয় অঙ্কে। ম্যানেজার বিপদ দেখল। কী হয়েছে তোমার? কারণ কিছু বলা যায় এমন তো দেখি না চোখের উপর। তবে গাইবে না কেন? গাইব, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে তো! সত্যি, আমার কী হয়েছে, কেন আওয়াজ বেরুবে না? দ্বিতীয় অঙ্কেও নামল কালভে। পরিপূর্ণ কণ্ঠে গান গাইল। গান শেষে নিজের

সাজঘরের দিকে গেল, মূর্ছিতের মত ভেঙে পড়ল চেয়ারে। ম্যানেজারকে বললে, ঘোষণা করে দিন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নামব না শেষ অঙ্কে। কী সর্বনাশ, একটা না হয় ডাক্তার ডাকি। না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তার কী করবে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কালভে, অন্যের কাঁধ ধরে-ধরে এগুলো রঙ্গমঞ্চের দিকে। হ্যাঁ, তৃতীয় অঙ্কেও গাইল সে, আর এমন গাইল যেমনটি কোনোদিন শোনেনি শিকাগো। উত্তাল জয়ধ্বনি করতে লাগল সবাই। জয়ধ্বনির প্রত্যাভিবাদন করবার জন্যে দাঁড়াল না কালভে। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে সে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে—তার জন্যে যেন আর আলো নেই হাওয়া নেই। তাড়াতাড়ি সে ছুটে এল তার সাজঘরে—কিন্তু এ কি, ঘরে এরা সব কারা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ম্যানেজার নিজে, আর আরো সব তার থিয়েটারের লোক। সকলের মুখ গম্ভীর, শোকচ্ছায়াচ্ছন্ন। যা কালভের মনে ডাক দিয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনো দুর্বিপাক উপস্থিত।

তোমার মেয়েটি মারা গেছে। তোমার যে বন্ধুর বাড়িতে তাকে রেখে তুমি এখানে এসেছিলে গান করতে, সেই বন্ধুর বাড়িতে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে। সে পুড়ছে আর তখন তুমি গান গাইছ, গেয়ে চলেছ।

কালভে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

তারপর কালভের জীবনে এল এক উন্মাদ পরিচ্ছেদ। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। তার অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে জানালে তার সঙ্কল্প।

বান্ধবী বললে ব্যাকুল হয়ে, 'তুমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবে?'

'কে স্বামীজি?'

'শোননি তাঁর কথা? পড়োনি কাগজে? সেই এক কল্যাণবন্ধু হিরণ্ময় পুরুষ। দেখবে চলো তাঁকে। তাঁর কাছে বলবে তোমার দুঃখের কথা।' বান্ধবী গাঢ় হল নিভৃতিতে: 'তিনি আমার বাড়িতেই আছেন।'

'না, ওসবে আমার স্পৃহা নেই।' যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে কালভে বললে, 'আমি নদীর জলে ঝাঁপ দেব। জলে ডুবে না মরলে আমার গায়ের জ্বালা, আমার মেয়ের গায়ের অগ্নিদাহের জ্বালা নিভবে না।'

বারে-বারে অনুরোধ করছে বান্ধবী, বারে-বারে প্রত্যাখ্যান করছে কালভে।

তিন-তিনবার নদীর দিকে চলল কালভে, আশ্চর্য, তিন-তিনবারই পথ ভুল করল। এ কি, এ সে কোন পথে এসে পড়েছে! এ যে তার বান্ধবীর বাড়ির দিকের রাস্তা। তিন-তিনবারই নদীর বদলে বান্ধবীর বাড়ি।

বারে-বারেই সে একটা মোহের থেকে উঠে আসছে বুঝি। তবে কি স্বামীজিই তাকে ডাকছেন?

কোথাকার কে স্বামীজি! প্রতিবারেই ব্যর্থের মত ফিরে এল কালভে।

এবার, চতুর্থবার, ঠিক-ঠিক সে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুবে। একেবারে নদীর অভ্যন্তরে। এবার আর সে পথ ভুল করবে না। ভুল করলেও পথের মাঝেই সংশোধন করে নেবে। আর ফিরবে না বাড়ি।

এবার একেবারে বান্ধবীর বাড়ির সদরদরজায় গিয়ে পৌঁছুল। বাটলার খুলে দিল দরজা। মন্ত্রচালিতের মত কালভে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, ডুবে গেল চেয়ারে।

বান্ধবী এসে বললে, 'পাশের ঘরে স্বামীজি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলো। তাঁর সামনে দাঁড়াও গিয়ে নীরবে। তিনি যতক্ষণ কথা না বলেন স্তব্ধ হয়ে থেকো। দেখো সেই মহিমাময়ের সান্নিধ্যে, স্তব্ধতায়, কী শান্তি, কী সুধা!'

'না' করতে পারল না কালভে। পাশের ঘরে ঢুকল সে ধীর পায়ে, নম্র নির্মল মুখে স্বামীজির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল দেখল নতচক্ষে ধ্যানের মৌনে বসে আছেন এক প্রশান্ত পুরুষ। মাথায় পাগড়ি, গায়ে গেরুয়ার ঢেউ। সমস্ত ইন্ধন দগ্ধ করে ফেলা নির্ধূম আগুন। আগুন হয়েও অমৃতের সেতু।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামীজি। কালভের মুখেও কথা নেই।

চোখ তুললেন স্বামীজি। বললেন, 'বৎসে, দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে তুমি আছ। কিন্তু ঝড়ের মধ্য থেকেই তোমাকে তোমার শান্তি কুড়িয়ে নিতে

শান্ত হও। শান্ত হওয়াই জীবনের সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ প্রত্যুত্তর। বোসো।'

সামনে টেবিল রেখে বসেছিলেন স্বামীজি, টেবিলের ওপারে বসল কালভে।

স্নেহভরা স্বরে স্বামীজি বলতে লাগলেন কালভের অতীত জীবনের কথা। এমন সব খুঁটিনাটি ব্যাপার যা তার নিভৃততম বন্ধুরও জানবার কথা নয়। কী ভীষণ, এ যে প্রায় অলৌকিক কাণ্ড।

'সে কি, আমার সম্বন্ধে এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?' কালভে বিস্ময়ে প্রায় পাথর হয়ে গেল: 'আমার এ বান্ধবীরও তো এসব জানবার কথা নয়। আর তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া—' স্বামীজি মৃদু-মৃদু হাসলেন।

'তা ছাড়া এই সব গোপন কথা, লোকচক্ষুর আড়ালে ব্যক্তিগত কথা, এ সবই বা আপনার সঙ্গে কে আলোচনা করতে যাবে—'

আমি না জানি তো আর কে জানবে—এমনি উদার সহানুভূতির চোখে তাকালেন স্বামীজি। যারা আর্ত, যারা শান্তির পিপাসু, তাদের সমস্ত ইতিহাস, যন্ত্রণার ইতিহাস, আঘাত-অপমানের ইতিহাস, সব আমাকে জেনে নিতে হবে—তারা যদি দুঃখে বা লজ্জায় তা প্রকাশ করতে না চায়, আমাকেই ডুব দিতে হবে অতীতের সমুদ্রে, চিকিৎসক যদি রুগীকে না জানে তা হলে সত্যিকার উপশম দেবে কোত্থেকে?

'কেউ আমাকে কিছু বলেনি, কারু সঙ্গে আলোচনাও হয়নি এ নিয়ে।' স্বামীজি সান্ত্বনাপারিপূর্ণ চোখে তাকালেন কালভের দিকে: 'আমি তোমাকে, তোমার জীবনকে, আগাগোড়া উদ্ঘাটিত দেখতে পাচ্ছি। খোলা বইয়ের মত পড়তে পাচ্ছি সমস্ত পৃষ্ঠা। তুমি চঞ্চল হয়ো না। স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে।'

স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে—সমস্ত সমস্যার কী নিটোল সমাধান!

অন্ধকারের পরপারে এ কে উন্নত-উজ্জ্বল পুরুষ। ক্ষমা স্নেহ ও

সমত্ববুদ্ধির ঔদার্য—কে এ মাধুর্যের অখণ্ড-ভাণ্ডার! কোলের উপর দুখানি হাত রেখে স্থির হয়ে বসে রইল কালভে।

বিরাটের সান্নিধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও জীবনের জ্বর চলে যায়। শোক চলে যায়, পাপ চলে যায়, পিপাসাও চলে যায়।

এ কে আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন নির্লেপ-নিরাময় পুরুষ! বিরজ, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু। মালিন্যরহিত, শোকরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত আকাশাত্মা। এমন এক আনন্দ আছে যা জানলে আর ভয় থাকে না, স্বামীজি যেন সেই আনন্দ। স্বপ্রকাশ সৎ-বস্তু।

অতলগহন শান্তি পেল কালভে। পেল শেষ সদুত্তর। বলিষ্ঠ আশ্রয়। অভয় প্রতিষ্ঠা। আত্মহত্যার ইচ্ছা মুছে গেল মন থেকে।

ফিরে যাবার সময় আবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন স্বামীজি: 'ভুলো না কী বললাম। প্রফুল্ল থাকো, সর্বদা ও সর্বত্র আনন্দ বিকিরণ করো। স্বাস্থ্য ভালো করো, ভালো রাখো। নিজের দুঃখ নিয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না। তোমার কল্পনা ও আবেগকে একটা শাশ্বত প্রকাশের আবেগে রূপায়িত করো। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার। দরকার তোমার আর্ট, তোমার শিল্পসাধনার জন্যে।'

সমস্ত অস্তিত্বের ক্ষত যেন আরোগ্যরসায়নে প্রক্ষালিত হয়ে গেল। নিশ্চেতন উজ্জীবিত হয়ে উঠল উৎসাহে। জীবনই সেই অমিত উৎসাহ। কোনোরকম মন্ত্রমোহ বা ইন্দ্রজাল রচনা করে নয়, শুধু তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্বের পবিত্রতায় তাঁর জ্বলন্ত জ্ঞানের উচ্চারণে কালভেকে স্বামীজি অভিভূত করে ফেললেন। হাসতে খেলতে নাচতে গাইতে আবার শুরু করল কালভে, আবার হয়ে উঠল সে জীবনানন্দিনী নির্মল নদী! কিন্তু এবার, এখন, এ জীবনে তার কত শান্তি কত স্থৈর্য কত নম্রতা। কত অসঙ্গ স্পর্শ। কত সুবিশাল উন্মোচন!

গরীবের ঘরে জন্ম কালভের। কী অমানুষিক পরিশ্রমে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দুর্দিনের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রস্ফুটিত করেছে। কঠিন শিলা থেকে মুক্তি দিয়েছে শিল্পকে। যেমন রূপ তেমনি যৌবন তেমনি দৈব কণ্ঠের মাধুরী। সমস্ত পশ্চিমের গায়িকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, বর্ণনা

করেছেন স্বামীজি। আরো কত গায়ক-গায়িকা আছে কিন্তু কালভের মত কেউ নয়, না বিত্তে না বিদ্যায়। শুধু সঙ্গীতে নয়, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সে অগ্রগণ্য। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মত কেউ নেই এমন শিক্ষা-দাতা। দুঃখ ও দারিদ্র্যই খুলে দিয়েছে জীবনের দুই বাতায়ন। এক মৈত্রী, দুই অনহঙ্কার। দুই খোলা জানলা দিয়ে এসেছে মাধুর্যের হাওয়া। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। তাকিয়ে দেখ বাইরে। নিরবচ্ছিন্ন মুক্তাকাশ। ঐ আকাশ না থাকলে কে প্রাণধারণ করত সংসারে! সমস্ত আকাশই মধু।

মঠে ফিরে এলে স্বামীজিকে চিঠি লিখল কালভে। স্নেহোৎসুকা কন্যার প্রশ্ন, সামান্য প্রশ্ন : বাবা, তুমি কেমন আছ, কি করছ, কি করবে ভাবছ।

স্বামীজি লিখছেন কালভেকে : 'আমি অনেকটা ভালো আছি। যতটা আশা করেছিলাম তার তুলনায় অবিশ্যি কিছু নয়। নিরিবিলি থাকবার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে। আমি চিরকালের মত অবসর নেব! আর কোনো কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরোনো ভিক্ষাবৃত্তি শুরু হবে।'

চরকির মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্বামীজি। এ শহর থেকে ও-শহর, এ প্রতিষ্ঠান থেকে ও-প্রতিষ্ঠান।

একটা লেকচার-ব্যুরোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল, তাঁকে সারা আমেরিকা বক্তৃতা দেবার জন্যে ঘোরানো হবে যার বিনিময়ে তাঁকে দেওয়া হবে দক্ষিণা—উপযুক্ত দক্ষিণা।

টাকা পেলে কত লোকহিতকর কাজ করা যায় ভারতবর্ষে। কত বিভব বিলাস, বিত্ত-প্রতিপত্তির দেশ এই আমেরিকা, আর ভারতবর্ষে শুধু নিঃস্ব-নিরন্নের ভিড়। কত বড়-বড় প্রাসাদ এখানে আর ভারতবর্ষে পর্ণকুটির নয়তো গাছতলা। কিন্তু যাই বলো, ভারতবর্ষের ছাইমাখা কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর যে আত্মিক মহত্ত্ব, যে প্রদীপ্ত সভ্যতা, তার লেশ-মাত্রও এখানে নেই। এদের বাহ্যিক সভ্যতার বিস্তীর্ণ আচ্ছাদনের নিচে যা আছে তাইই ছাই। অন্তরে এরাই নিঃস্ব, অমৃতান্নহীন।।

ফরমায়েস-মত লৌকিক বিষয় কী বলব, ভারতবর্ষের নারী, হিন্দুর প্রথাপদ্ধতি বা বর্ণবৈষম্য—আমাকে ধর্মের কথা বলতে দাও, বলতে দাও আমার গুরুর কথা।

মাস্টার মশায়ের কথা মনে পড়ল বুঝি স্বামীজির। ঠাকুরের ঘরে ঠিক বিকেলবেলাটিতে এসে হাজির হয়েছে। নরেন ঠাকুরের কাছে বসে, এক পাশে ভবনাথ। ঠাকুর হেসে বলছেন, 'একটা ময়ূরকে বেলা চারটের সময় আফিং খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা এসে উপস্থিত। আফিঙের মৌতাত ধরেছিল, ঠিক সময়ে আফিং খেতে এসেছে।'

ঈশ্বর-কথার মত কথা নেই। ঈশ্বর-প্রেম 'কলসে-কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।'

কে তোমার গুরু ?

গ্রাম্যভাষায় কথা বলে সে এক পরমসুন্দর সদানন্দ পুরুষ। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁকে দেখে আক্ষেপ করে বলেছেন, আমরা কেবল পড়েছি, আর ইনি না পড়েই সেই বেদবেদান্তের ফল। আমরা কেবল ঘোল খেয়েছি আর ইনি মাখন খেয়েছেন।

তোমাদের যীশু পিত-পিতা করে পাগল। আর আমার গুরু মা-মা করেন। বলেন, বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। বাপের চেয়ে মায়ের উপর বেশি জোর খাটে। মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে মা মামলা ছেড়ে দেয়, হেরে যায়।

ঈশ্বর কি একটা ভাবের বুদ্বুদ ? নাকি দুর্বল মানুষের কল্পনার রামধনু ?

ঈশ্বর এক বিজ্ঞানের ব্যাপার, এক বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদিত সত্য।

আমাদের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অগ্রে ও পশ্চাতে এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। আমাদের এই ব্যক্ত জগৎ এক অব্যক্তের অংশ মাত্র। বলবে, অনন্ত অজ্ঞাতকে জানবার চেষ্টা কেন ? যেটুকু জ্ঞাত সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তো চলে। তাই বা চলে কই ? জানব না-জানব না করেও দিনে দিনে আমরা জেনেই ফেলেছি, কিছুতেই অল্পকে নিয়ে পরিমিতকে

নিয়ে স্থির থাকতে পারছি না। জ্ঞানের চরম বিষয়ই যে সেই অনন্ত অজ্ঞাত, অনন্ত অব্যক্ত, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগমনে তাই ইঙ্গিত করছি অহরহ। যে অব্যক্তের অংশ এই ব্যক্ত জগৎ, যে অনন্ত সত্তার ক্ষুদ্র প্রকাশ এই জীবসত্তা, তাকে না জানলে এই জীব-জগতের ব্যাখ্যা হবে কি করে? সুতরাং জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করে উপায় নেই।

বলছেন স্বামীজি : এথেন্সে বক্তৃতা করছেন সক্রেটিস। ভারত থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে গ্রীসে, তাকে বলেছেন সক্রেটিস, মানুষকে জানাই মানুষের সেরা কাজ। মানুষই মানুষের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।

ব্রাহ্মণ বললে, 'ঈশ্বরকে না জানলে মানুষকে জানবেন কি করে? যতক্ষণ ঈশ্বর অজানা ততক্ষণ মানুষও অজানা।'

সেই অনন্ত অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সত্তা এবং অনন্ত অব্যক্ত বা নামাতীত বস্তুই ঈশ্বর।

যে কোনো জড়বস্তু নিয়ে বিচার করো, তার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হও, দেখবে স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে এসে পৌঁছুচ্ছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে, অণু অণীয়ানে। সর্বশেষে সূক্ষ্মতমে, অণিষ্ঠে। তখন আর জড় নেই, চলে গিয়েছে চেতনে। এবং চেতন থেকে মহত্তম পরতম শক্তিতে। আর তখন পদার্থবিদ্যা নেই। পদার্থবিদ্যা উপনীত হয়েছে দর্শনে।

জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই ধর্ম। আর এই ধর্মই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে রেখেছে। যদি ধর্ম চলে যায়, যদি শুধু বর্তমান অস্তিত্বের মুহূর্তমাত্রকেই নিয়ে আমরা তৃপ্ত থাকতে চাই, তা হলে মানুষকে পশুর ভূমিতে নেমে পশুর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এই ধর্মই মানুষকে নেমে যেতে দিচ্ছে না, উচ্চে, উচ্চতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের সমস্ত ভৌতিক ও মানসিক উন্নতির মূলে ওই ঊর্ধ্বপ্রেরণা। ওই প্ররোচক শক্তি।

কিন্তু ধর্ম কি দারিদ্র্য দূর করতে পারে? পারে না। বলছেন স্বামীজি, কত কিছু দিয়েই তো কত কিছু হয় না। মনে করো, তুমি একটা জ্যোতির্ষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছ, একটি শিশু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জিগগেস করল, এতে কি কিছু খাবার পাওয়া যায়? তুমি

উত্তর দিলে, না, তা পাওয়া যায় না। তখন শিশু বললে, তবে ও দিয়ে কী লাভ হবে? শিশু তার নিজের দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র জগতের লাভালাভের বিচার করে। তেমনি যারা অল্পদৃষ্টি, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাদের বিচারও ঐ শিশুর বিচার। হীরে কিনতে গিয়ে বেগুনওয়ালার ছ আনা সের দাম দেওয়ার মত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ-নিজ ওজনে বিচার করতে হবে। অনন্তকে বিচার করতে হবে তাই অনন্তের ওজনে। ধর্ম মানুষের সর্বাংশ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমস্তকে আশ্রয় করে। তাই শুধু ক্ষণকালের ভিত্তিতে তার মূল্যনির্ণয় ন্যায়সঙ্গত হবে না।

ধর্ম তো অনেক কিছুই পারে না। কিন্তু, বলতে গেলে, পারে কী?

মনুষ্য নামক প্রাণীকে দেবতা করতে পারে। তাকে দিতে পারে অনন্ত আনন্দময় মহাজীবনলাভের অধিকার।

আর এই ধর্মই হিন্দুর।

ভারতবর্ষ তো বর্বরের দেশ, স্বামীজিকে দেখে-শুনে এ আর কেউ বলতে পারছে না। কারু সাহস নেই বলে হিন্দুধর্ম অকিঞ্চিৎকর কিংবা ভারতবাসীরা অসভ্য। স্বামীজির সামনে প্রখরতম, মুখরতম শত্রুও ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তবু হীনমতি কেউ-কেউ পত্র-পত্রিকায় তাঁর অযথা নিন্দা করে। ভক্তের দল রুষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীজিকে বলে, লিখিত প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করুন, যোগ্য প্রত্যুত্তর দিন। স্বামীজি হেসে বলেন, 'কে নিন্দুক কে বা নিন্দিত? কে বা প্রশংসক, কার বা প্রশংসা? সব বাক্যের বুদ্বুদ, আসল যা সত্য, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, রোধ করতে পারবে না, পারবে না গোপন করতে।' তারপর বললেন স্বগতোক্তির মত: সকলেই যদি তোমার যশোগান করে তা হলে তোমার অক্ষমতা তুমি বুঝবে কি করে? ধৈর্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, প্রসন্নতা —এ সব তোমার মধ্যে প্রকাশ পাবার সুযোগ পাবে কি করে, যদি তোমার প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধবাদী কেউ না থাকে? যদি তুমি সন্তাপের ক্রুশ বহন না করো তা হলে তুমি ঈশ্বরের চিহ্নিত হলে কি করে?

কিন্তু স্বামীজি বিরক্ত হলেন লেকচার-ব্যুরোর উপর, যারা তাঁকে

ঠকিয়ে টাকা লুটছে পকেট পুরে। প্রথম-প্রথম একেকটা বক্তৃতার জন্যে তাঁকে নশো ডলার করে দিচ্ছিল, এখন ক্রমশই, কমাচ্ছে টাকার পরিমাণ। ব্যাপার কি? প্রতি সভাতেই তো উদ্বেল জনতা, তবে গেট-ম্যানি কম হচ্ছে বলে তো অনুমান হয় না। দৃষ্টি একটু সজাগ করলেন স্বামীজি। দেখলেন, সেদিন এক ঘণ্টার এক বক্তৃতায় আদায় হল আড়াই হাজার ডলার কিন্তু তাঁকে দেওয়া হল মাত্র দুশো।

দরকার নেই আমার টাকায়! আমি এমনই ঘুরে-ঘুরে বেড়াব। বলে বেড়াব ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা।

লেকচার-ব্যুরোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন স্বামীজি।

যিনি অনাদি কিন্তু জগতের আদিভূত, যাঁকে আশ্রয় করে এই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হচ্ছে, যাঁকে দর্শন করলেই এই সংসারচক্র নিবৃত্ত হয়, সেই সংসারতিমিরহারী শ্রীহরির স্তব করি। যাঁর অংশবিশেষ থেকে এই অশেষ বিশ্ব আবির্ভূত, আবার যিনি বিশ্বকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন, যাঁর সান্নিধ্যহেতুই জীবের সুখদুঃখের অনুভব, সেই সংসারতিমিরহারী শ্রীহরির স্তব করি। যিনি সর্বজ্ঞ সর্বময় হয়েও অগণন বিভক্তরূপে প্রতীয়মান, যিনি অনন্ত আনন্দময় কল্যাণগুণধাম, যিনি অব্যক্ত হয়েও ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে প্রতিভাত. যিনি সদসৎ সমস্ত পদার্থস্বরূপ, যিনি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বস্তুরই অর্থ নেই, যাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পরমার্থ সত্তা উপলব্ধ হয় না সেই সংসারতিমিরহারী শ্রীহরির উপাসনা করি।

৫৩

টমাস কুক এণ্ড সন্সের ক্যাশিয়ার কালীকৃষ্ণ দত্ত হেড আফিসে চিঠি লিখছে। [illegible] করে স্বামী বিবেকানন্দের গতিবিধির খবর পাঠান কলকা[illegible]-বান্ধবরা, তার সন্ন্যাসী ভাইয়েরা সকলেই তাঁর জন্যে উৎ[illegible],

শুনতে [illegible] তিনি ঝড় তুলে দিয়েছেন।

যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়েছেন। সে সব ভ্রমণ ও বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই আসছে না এদেশে। ধর্মমহাসভার তুমুল কাণ্ডটাও আগাগোড়া জানা যাচ্ছে না। আপনারা ছাড়া আর কেউ নেই যার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে। আপনাদের জাহাজেই উনি গিয়েছিলেন এখান থেকে। সুতরাং আপনারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠান তা হলে তাঁর স্বদেশবাসীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আপনাদের কাছে।

সমগ্র বিবরণ ধীরে-ধীরে এসে পৌঁছুতে লাগল।

বরানগরের মঠের সন্ন্যাসীরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল। আমাদের সেই নরেন। আমাদের সেই বীরেশ্বর।

'কেন, ঠাকুর বলেননি নরেন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে? বলেননি, লালজ্যোতির মধ্যে বসে আছে নরেন্দ্র! বলেননি, ওর মদ্দের ভাব, ওর উঁচু ঘর, অনন্তের ঘর। ও একটা তোলপাড় করে ছাড়বে।'

আর নরেন কী বলছে?

হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছে শিকাগো থেকে: 'শুধু মানুষের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে জানা সম্ভব। যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজিত তবুও তাঁকে আমরা শুধু এক বিরাট মানুষরূপেই কল্পনা করতে পারি। যদি খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পুজো করলে কোনো ক্ষতি না হয় তবে যে পুরুষোত্তম জীবনে চিন্তায় বা কাজে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করে নি, তাঁকে পুজো করলে কী ক্ষতি হতে পারে? এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তথ্য প্রচার করলেন যে সকল ধর্মই সত্য, সব মতই এক পথে, সব পথই এক ঈশ্বরে।'

আবার লিখছেন এক আমেরিকান [illegible]: 'বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এতে আমি তোমার [illegible]মাত্র বিশ্বাসই যে মানুষের ত্রাণ করতে পারে তাও মা[illegible] এতে আবার গোঁড়ামি আসবার সম্ভাবনা আ[illegible]ই ভবিষ্যতের দ্বার রুদ্ধ।

জ্ঞান ? জ্ঞান ঠিক পথ, কিন্তু এখানেও ভয়। জ্ঞান না দাঁড়ায় শুধু শুকনো পাণ্ডিত্যে।

আর ভক্তি ? ভক্তি খুব বড় জিনিস কিন্তু এও ভয়শূন্য নয়। এতে আসতে পারে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা। আর বিহ্বলতাই নষ্ট করে দিতে পারে খাঁটি শস্যটুকু।

এ তিনের সামঞ্জস্য যে করতে পারে সেই আসল পুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই এই তিনেই সমন্বয়।

যার যা খুশি বলুক, শ্রীরামকৃষ্ণের মত এমন উন্নত চরিত্র কারু কোনো কালে দেখিনি। যে তাঁকে যেভাবে নিক কিছু এসে যায় না। যা খুশি বলুক তাঁকে আচার্য, বা আদর্শপুরুষ বা মহাপুরুষ, যে আরো এগুতে চায় বলুক তাঁকে পরিত্রাতা বা ঈশ্বর, কিছু বাধা দিতে যেও না। শুধু এইটকু জেনো যে তাঁকেই কেন্দ্রস্বরূপ করে ধরে চলতে হবে ঘুরতে হবে দুনিয়ায়। আয় তোরা যে যেখানে আছিস, সবাই চলব একসঙ্গে, রামকৃষ্ণরাজ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলের সমান অধিকার। অদ্বৈতবাদী অজ্ঞেয়বাদী অভেদবাদী প্রভেদবাদী সব এক জোট।'

কেশব সেনের চেলা অমৃত বসুর কথা মনে পড়ে। কেশবের সঙ্গে প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বর আর নিশ্চল ভক্তি করত রামকৃষ্ণে। তাকে খেপাবার জন্যে তার আসল মনোভাব জানবার জন্যে বিপরীত ভাব ধারণ করত নরেন।

'কী এমন ছিল ঐ লোকটা।' নরেন বলত গম্ভীর মুখে : 'পুতুল পূজো করত, আর থেকে থেকে ভিরমি যেত। ওতে আবার ছিল কী! মাথার ব্যামো আর চোখের ভ্রান্তি।'

'তোমার মুখে এই কথা ?' অমৃত তেড়েফুঁড়ে উঠত।

'কেন, আমাকে রেখে-ঢেকে বলতে হবে নাকি ? সত্য কথা বলতে পারব না ?' বিস্ময়ের ভান করত নরেন।

'তোমাকে তিনি কত ভালোবাসতেন, কত সন্দেশ খাওয়াতেন নিজের হাতে—তোমার শেষে এই প্রতিদান! তাঁকে অবজ্ঞা করে কথা কইছ ?'

'সন্দেশ খাওয়াতেন বলে মিষ্টি কথাই বলতে হবে? সত্যি কথা বলা চলবে না?'

'সত্যি কথা? পরমহংস মশায়ের মত কটা লোক হয়েছে জগতে? তুমি যে এত অপদার্থ হয়েছ তা জানতাম না। তাঁরই খেয়ে-পরে তাঁরই নিন্দে করছ?' রাগে গরগর করতে লাগল অমৃত।

নরেন তবু ছাড়ল না কটূক্তি। যতই সে মৌচাকে খোঁচা মারে ততই মধু ঝরে অনর্গল, অমৃত অমৃত হয়ে ওঠে।

'যাও, তোমার সঙ্গে তাঁর কথা কইতে নেই। তোমার দর্শনও দুর্ভাগ্য।' উঠে পড়ল অমৃত, দুর্জনসংসর্গ দ্রুত ত্যাগ করল।

শ্রদ্ধাভক্তির একটা অগ্নিস্রাবী পর্বত। যতই ধুলোবালি ছুঁড়ি ততই সে নির্মলনীল আকাশ হয়ে থাকে। জানতুম না আগে, অমৃতের এমন উর্জিতা ভক্তি। এমন ধনুকটঙ্কার।

অমৃত রাগ করে চলে গেলে বাবুরামকে নরেন বললে, 'একটা লোককে সারা জীবনের মত চটিয়ে রাখলাম।'

আহেরিটোলার সুরেন বসু স্বামীজির কাছে সন্ন্যাস নেবে ঠিক করেছে। অমৃতের সঙ্গে দেখা সুরেনের। অমৃত একেবারে মুখিয়ে উঠল: 'কি হে সুরেন, গুরু কি আর খুঁজে পেলে না? শেষকালে একটা কায়েত ছোঁড়ার কাছে সন্ন্যাস নিলে?'

'আপনার কি আর শহরে গুরু জুটল না,' পালটা জবাব দিল সুরেন, উত্তরকালে স্বামী সুরেশ্বরানন্দ: 'শেষকালে একটা বদ্যির চেলা হলেন?'

বদ্যির চেলা মানে কেশব সেনের চেলা।

সেই ঠাকুর আর রাখালের সামনে গান গাওয়া মনে পড়ছে। গান গাইছে নরেন আর ঠাকুর কাঁদছেন। রাখালও কাঁদছে।

নরেন গাইছে: 'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান।'

আরো গাইছে, আবার গাইছে মাতোয়ারা হয়ে: 'তুমি হাতকি দর্পণ, মাথকি ফুল, তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল। তুমি অঙ্গকি মৃগমদ, গীমকি হার, তুমি দেহকি সর্বস্ব, গেহকি সার। পাখিকো পাখ, মীনকো পানি, তেমতি হাম বঁধু তুয়া মানি॥'

সেই একবার মৃত্যুভয় এসেছিল, চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল নরেন, ওগো আমার তুমি এ কী করলে ? আদ্যোপান্ত অন্ধকার, এ কী বিভীষিকা ! সে যে রামপ্রসাদের 'কালো হতেও অধিক কালো ।' তাতে সব ডুবছে, সব তলিয়ে যাচ্ছে, ধীর মন্থরে, অনিবার্যরূপে—দেশ, কাল, অনুভূতি, অভিজ্ঞান, মূল পল্লব—নিঃসীম, নিস্তল। কিন্তু এ কী, এ কী রূপ অন্ধকারের, অন্ধকারে অন্ধকারই লুক্কায়িত, এ যে অকথিত সুখ, অস্পন্দিত প্রাণ, অহংশিখাহীন নিরুপাধিক দীপ্তি। ওগো, তুমি আমার এ কী করলে, কোথায় নিয়ে এলে, কোন গম্ভীর নির্বাণে—

'মিস্টার—' ট্র্যামের কণ্ডাকটার এসে দাঁড়ালো কুণ্ঠিত হয়ে।

স্বামীজি চোখ মেললেন।

'ট্রাম টার্মিনাস ঘুরে আবার ফিরে চলেছে।' বললে কণ্ডাকটার। 'কোথায় আপনার নামবার কথা ?'

লজ্জিত হলেন স্বামীজি। একটু খেয়াল ছিল না, ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলেন ! তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। স্থির করলেন এবার ঠিক নজর রাখবেন কোথায় তাঁর নামবার স্টপ।

এত ব্যস্ততা এত মুখরতা, তবু অবকাশ পেলেই আত্মভাবে তন্ময় হয়ে যান স্বামীজি। যত ভাবেন হবেন না, তবু চারিদিকের ছুটোছুটি কলকোলাহলের মধ্যেও কি করে কে জানে ছুটে যায় অবকাশ আর ক্ষণেকের মধ্যেই বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে যায়। তোমার প্রকৃতিগত যে ধ্যানধারণার ভাব, কিছুতেই তার থেকে তোমার বিচ্যুতি নেই। লৌকিক জগতে যতই তোমার কাজ থাক না, ভুলো না তুমি আবার আলোকলোকের।

যে বাড়িতে শিকাগোতে আছেন স্বামীজি সে বাড়ির ভদ্রমহিলার কোন এক ব্যবসাতে শরীক রকফেলার। হ্যাঁ সেই ধনকুবের রকফেলার।

একবার দেখা করবে স্বামীজির সঙ্গে ? আমার বাড়িতেই আছেন।

রকফেলার গ্রাহ্য করে না। কে না কে এক হিন্দু সাধু। কী এমন ঠেকা তাকে দেখে আসার !

চলো না। তার বন্ধুরাও তাকে টানাটানি করে। দেখবে সাধারণের

বাইরে, তোমার সাধুত্বের কল্পনার ঊর্ধ্বে। দেখবে আর চলে আসবে এ হবার নয়। দেখবে আর থমকে দাঁড়াবে ক্ষণকাল।

যদিও রকফেলার তখনো একডাকের রকফেলার নয়, তখনো ছোঁয়নি সে সৌভাগ্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা, তবু সে তখনো একজন কঠিন ব্যক্তিত্বের ব্যবসায়ী, আর যা ব্যবসায়ের বাইরে তাতে তার স্পৃহা নেই। যদি ডলার থাকে তবেই কিছু বলার থাকতে পারে। সাধ্য নেই তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ নড়ায়-টলায়।

কিন্তু সেদিন হল কী?

সেদিন কে তাকে ঠেলতে লাগল রাস্তায়। কেউ তাড়া করলে যেমন লোকে ছোটে তেমনি। আর আশ্রয়ের জন্যে, আয় তো আয় সোজা তার বান্ধবীর বাড়িতে। সামনেই পড়ল বাটলার, তার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাকে চাই? এইখানে এই বাড়িতে একজন হিন্দু সাধু আছে না? তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাটলার স্বামীজির ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল। কিন্তু কে এসেছে না এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করার তাঁর এখন সময় হবে কিনা এসব হদিস জানবার জন্যে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করল না রকফেলার। সবলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অনাহূত।

কিন্তু, আশ্চর্য, সহসা দাঁড়াল সে এক আশ্চর্যের মুখোমুখি।

যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ভদ্রতা-শিষ্টতা অস্বীকার করে বন্যের মত অসভ্যের মত ঢুকে পড়েছে তার দিকে স্বামীজী ফিরেও তাকালেন না। একটা টেবিলের সামনে বসে তিনি লিখছিলেন, চোখও তুললেন না। এত দৌড়ঝাঁপ গোলমাল একটা আঁচড়ও টানতে পারল না তাঁর স্তব্ধতায়,তাঁর অভিনিবেশে।

'আমি রকফেলার।'

যেন তার সব তিনি জানেন সব তিনি দেখে নিয়েছেন এমনি উদাসীন মুখে স্বামীজি বললেন, 'বোসো।'

রকফেলার বসল। চুপ করে রইল। সেই স্তব্ধতা তার সমস্ত সত্তায় শান্তি ঢেলে দিতে লাগল।

একটি-একটি করে স্বামীজি তাকে তার অতীত দিনের কথা বলতে লাগলেন।

'এ কি, এ তুমি কী করে জানলে ?' রকফেলার লাফিয়ে উঠল।

'শোনো আমি আরো জানি। জানি তোমার ভবিষ্যৎ।'

'ভবিষ্যৎ ?'

'হ্যাঁ, অদূর-সুদূর সমস্ত, সমস্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।'

'কী দেখছ ?'

'দেখছি তোমার অনেক-অনেক টাকা। কিন্তু দেখছি এ টাকা তোমার নয়।'

'আমার নয় ?'

'না, দেখছি এ ঈশ্বরের টাকা। তোমার কাছে গচ্ছিত আছে। তুমি এ টাকা ঈশ্বরের সন্তানদের জন্যে, দুঃস্থ ও দুর্বল সন্তানদের জন্যে বিতরণ করছ অকাতরে।'

'তোমার কী স্পর্ধা, তুমি এ কথা বলো।' দারুণ বিরক্ত হল রকফেলার। 'পরের টাকা লোকে এমনি বেশি দেখে! পরের টাকা নর্দমার জলে ভাসিয়ে দিতে কারু গায়ে লাগে না। যত সব বাজে কথা।'

সামান্য মৌখিক বিদায়-অভিবাদন না জানিয়েই বেরিয়ে গেল রকফেলার।

'হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাস কী বলছে ?' চিঠি লিখছেন স্বামীজি : বলছে, আমি সাধু অসাধু দুজনেরই পদবন্দনা করি। কিন্তু হায়, দুজনেই সমান দুঃখদাতা। অসাধু লোক কাছে এলেই আমার যন্ত্রণা আর সাধু লোক আমাকে ছেড়ে যখন চলে যায় তখন আমার প্রাণহরণ করে নিয়ে যায়।

আমার সুখের আর কী আছে ? ভালোবাসবারই বা কী আছে ? ভগবানের যারা প্রিয়, ভক্ত আর সাধু, তাদেরকে ভালোবাসাই আমার অনন্ত সুখ অনন্ত প্রেম।

হে আমার প্রিয়তম, হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি, তুমি বাজো, বাজতে থাকো। তুমি যেদিকে চালাও যেদিকে আকর্ষণ করো আমি

সেই দিকেই যাব। যিনি আমাদের প্রিয়তম তাঁর কত শক্তি কত গুণ তার কে লেখাজোখা করবে? আমাদের কল্যাণ করবারও তাঁর কত শক্তি। কিন্তু চিরদিনের জন্যে বলে রাখছি, আমরা কিছু পাবার জন্যে ভালোবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই। আমরা প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিয়ে দিয়েই ভরে উঠতে চাই। চলতে-চলতেই পেতে চাই অমৃত।

মূর্খ, তুমি কার সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ? চেয়ে দেখ, আমি তাকে সরু একগাছি সুতো দিয়ে গলায় হারের মত করে বেঁধে নিয়ে চলেছি। ঐ হার প্রেমের হার, ভাবের সুতো। যিনি অসীমস্বরূপ তিনি আমার ভালোবাসায় বাঁধা পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে চলে এসেছেন। যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তাঁর এরকমভাবে ধরা পড়তে এতটুকুও বাধছে না।'

কদিন পরে আবার স্বামীজির কাছে ছুটে এল রকফেলার। তেমনি অঘোষিত ঢুকে পড়ল স্বামীজির ঘরে।

সেই দিনের সেই মূর্তি। স্বামীজি এতটুকু চঞ্চল হলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি বসে রইলেন নত নেত্রে।

'কী, হল? এখন খুশি?' টেবিলের উপর একতাড়া কাগজ ফেলল রকফেলার। কোথায় কোন জনহিতের প্রতিষ্ঠানে বিপুল দান করছে তার পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড টাকার একটা চেক।

'আশ্চর্য, আপনার কথাই ফলল।' বললে রকফেলার, 'দুঃস্থ-দুর্বলের জন্যেই দান করছি—এই সর্বপ্রথম। কী, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না?'

তবু স্বামীজি তাকালেন না চোখ তুলে। টেবিলের উপর থেকে কাগজগুলি টেনে নিলেন নিজের কাছে। পড়তে লাগলেন।

বললেন, 'ধন্যবাদ তো তোমারই আমাকে দেওয়া উচিত।'

কোনো উত্তপ্ত অভিনন্দন নয়, নয় বা কোনো উদ্বেল প্রশংসা। যেন এ অনেক দিনের জানা কথা। এ হবেই। এ হতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের দিকে-দিকে স্বামীজির উদ্দেশে জয়ধ্বনি উঠল। তিনি

আমেরিকাতে হিন্দুধর্মের গৌরবপতাকা উড্ডীন করেছেন। মুখোজ্জ্বল করেছেন হিন্দুর, তার দেশের, তার ধর্মের, তার ঐতিহ্যের।

রামনাদের রাজা, ভাস্কর সেতুপতি, পাঠালেন জয়পত্র। খেত্রীর রাজা অজিত সিং দরবার বসালেন। সংবর্ধনা করলেন স্বামীজির। মাদ্রাজের গণ্যমান্যরাও সভা করলেন। পাঠালেন সানন্দ অভ্যর্থনা। সব খবর পৌঁছুতে লাগল স্বামীজির কাছে। তিনি বুঝলেন এ তাঁর নিজের স্তুতি নয়, তাঁর দেশের স্তুতি, এ তাঁর নিজের মর্যাদা নয়, তাঁর ধর্মের মর্যাদা।

কিন্তু কলকাতা, তাঁর জন্মস্থান কী করল ?

জয়ের উৎফুল্লতায় কলকাতাও প্রমত্ত হয়ে উঠল। টাউনহলে প্রকাণ্ড সভা বসল। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হলেন। ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, লোকে লোকারণ্য সভা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা। যে শোনে যে দেখে সেই রোমাঞ্চিত হয়, নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতে গর্বে মাথা উঁচু হয়ে ওঠে।

অভিনন্দনপত্র পাঠানো হল স্বামীজিকে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দকে।

'হিন্দুত্বের মহিমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার এই শ্রম ও ত্যাগ, উৎসাহ ও ঔদার্য আমাদের, হিন্দুদের, তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ করে রাখবে। তুমি আমাদের সম্মানিত করেছ, গৌরবমুকুটে ভূষিত করে হিন্দুত্বকে বসিয়েছ রাজোত্তম সিংহাসনে। তুমি ছাড়া আর কে পারত ব্যাখ্যা করতে! তোমার ছাড়া কার ঐ বেদোজ্জ্বলা বাণী বেদান্তস্নিগ্ধ ভাষা। অল্পক্ষণের বক্তৃতার মধ্যে তুমি ছাড়া আর কে অত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে পারত! চিরকাল আমাদের হিন্দুধর্মকে ঘরে-বাইরে অপব্যাখ্যায় বিড়ম্বিত হতে হয়েছে, তুমি সর্বপ্রথম মোচন করলে অজ্ঞান ও অবজ্ঞার কুয়াশা। অপরিচিত দেশের প্রতিকূল জনগণ তোমাকে শুনে মুগ্ধ হল আশ্বস্ত হল, লুটিয়ে পড়ল বশ্যতায়। তারা বাধ্য হল তোমার প্রতি সদয় হতে তোমাকে মাথায় করে রাখতে। তোমার ধর্মের মর্মবাণী শুনতে। তুমি আমাদের সক্ষম সারথি হও, আমাদের সনাতন ধর্মের নিহিতার্থকে উদঘাটিত করো। ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন, উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে রাখুন।'

শুধু কলকাতায় নয় ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে বেজে উঠল এক মন্ত্র : বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা বিবেকানন্দ। বেদান্তনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থ নির্মল-নিরাময় বিবেকানন্দ।

হে তপোজ্জল দৃপ্ত সন্ন্যাসী, তোমার অভিঃমন্ত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি কর্মমূর্তি, তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ করো। আমাদের উত্তাল জীবনসমুদ্রের পারে অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ হয়ে বিরাজ করো সর্বক্ষণ।

'দিনরাত বলো, ঈশ্বর, তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্বামী, আমার দয়িত, আমার সর্বস্ব। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, কিছুমাত্র না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে। আর জানি তুমিই আমি আমিই তুমি।' মিস হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'ধন চলে যায় রূপ চলে যায় আয়ু চলে যায় কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও বাসি হয় না তেতো হয় না একঘেয়ে হয় না। যদি ঈশ্বরে লেগে থাকতে পারো তবে দেহের কোথায় কী হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা দুঃখ বিঘ্ন এসে ভয় দেখাতে থাকে, যখন মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা দেয়, তখনো বলো, হে ভগবান, হে আমার প্রিয়তম, তুমি আমার কাছেই রয়েছ, তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে সরে যাওনি। আমার দুঃখ হোক, তুমি সুখে থাকো। আমার মরুভূমিতে তুমি নিত্য আনন্দের কালিন্দী।

৫৪

তদানীন্তন আমেরিকার সবচেয়ে বড় বক্তা রবার্ট ইঙ্গারসোল। প্রতি বক্তৃতায় তাঁর ফি পাঁচ থেকে পাঁচশো ডলারের মধ্যে। তেমন বুঝলে কখনো বা ছ'শো।

ইঙ্গারসোল অজ্ঞেয়বাদী। যাকে স্পষ্ট করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে জানা যাবে না তার সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? ঈশ্বর থাকলে আছেন না থাকলে নেই, তাতে আমার কী ক্ষতিবৃদ্ধি? আমি ভালো হয়ে বাঁচি,

ভালো করে থাকি, ভালো পথে গাড়ি চালাই। ধর্ম আবার কিসের? সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে জানা, থাকতে পারাই ধর্ম।

'তুমি অমন দুর্ধর্ষ স্পষ্ট করে কথা বলো কেন?' ইঙ্গারসোলের সঙ্গে দেখা হতে একদিন বললে স্বামীজিকে। 'আমার মত ঘোঁয়াটে রাখতে পারো না?'

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'কথা যে মুখের থেকে আসে না, প্রাণের থেকে আসে।'

'তবে যে রকম কথা শ্রোতারা পছন্দ করবে সেই দিকে একটু চোখ রাখবে বৈকি। শ্রোতাদের সমাজ বা রীতিনীতি নিয়ে সমালোচনা করতে সতর্ক হওয়া দরকার।'

'আমার বলার মূলে সত্য, সত্যের প্রেরণা, তাই কার কী পছন্দ হচ্ছে না হচ্ছে আমি গ্রাহ্য করি না।'

'কিছুকাল আগে এসে এরকম ভাবে প্রচার করলে ওরা তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত, নয়তো গাছে বেঁধে মারত পুড়িয়ে।'

'বলো কি, এত ধর্মান্ধ ছিল আমেরিকা?' স্বামীজী অবাক হলেন।

'অন্তত টিলিয়ে বার করে দিত দেশ থেকে।'

'বিশ্বাস করি না। তোমাকে দিলেও আমাকে দিত না, পারত না দিতে।'

'কেন?' ইঙ্গারসোল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল: 'তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কি? তুমিও প্রচারক আমিও প্রচারক। বরং আমি এদেশের লোক, আমার প্রতিই এদের আনুকূল্য স্বাভাবিক। আর তুমি তো বিদেশী, কালা আদমি, পুত্তলপূজক।'

হাসলেন স্বামীজী: 'কিন্তু, জানবে, আমি প্রেমপ্রেরিত। তোমার মত কাউকে ক্ষুব্ধ করে, ক্রুদ্ধ করে, কাউকে বা শুষ্ক করে রাখে। আর আমার ধর্মে কোথাও বিরোধ নেই, অস্বীকৃতি নেই, প্রত্যাখ্যান নেই, কাউকে ঠেলে বার করে দেয় না, কাউকে বা রাখে না দূরস্থ করে। সবাইকে বুকের কাছে টেনে আনে, তুমিই সেই বলে সম্ভাষণ করে, মানুষকে মহত্তম পদবীর ভূষণ পরায়। তা ছাড়া যীশুখ্রীষ্টকে আমি

ভালোবাসি, আর তার মা মেরী মাধুর্যের প্রতিমা, আমাদের গণেশ-জননী, অখিলতৃপ্তিস্বরূপা জগন্মাতা ভগবতী।'

'তোমার ভয় করে না এসব বলতে?'

'যার অন্তরে ভালোবাসা আছে তার আবার ভয় কী? জানো পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার চেয়েও আমার ভালোবাসা বেশি। এক-এক করে সকলকে পরিপূর্ণ বিলিয়ে দিয়েও ভাণ্ডার বেশি থাকে, কিছুতেই ক্ষয়ব্যয় হয় না।' উজ্জ্বল চোখের প্রসন্ন প্রেমাভা চারদিকে বিস্তার করলেন স্বামীজি।

বক্তৃতার টানে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায়ই তুজনের দেখা হয়। সেদিনও দেখা হলে, আবার কথা উঠল কে বেশি উপভোগ করছে, ইঙ্গারসোল না স্বামীজি।

'ইন্দ্রিয়চেতনার বাইরে আর সমস্তই যখন অজ্ঞেয়,' বলছে ইঙ্গারসোল, 'তখন যা জ্ঞেয় গ্রাহ্য আস্বাদ্য তাই লুটেপুটে ভোগ করে নিচ্ছি। আমিই বেশি করে নিংড়ে রস বার করে নিচ্ছি নেবুর থেকে।'

'বেশি করে নিংড়োলে তেতো হয়ে যাবে। অত তাড়াহুড়োর দরকার কী?'

'তাড়াহুড়ো করব না? তুদিন পরে মরে যাব যে।'

'কিন্তু, আমি জানি,' আমার মৃত্যু নেই। আমি জানি কোথাও ভয় নেই, শেষ নেই, বিচ্ছেদ নেই। তাই আমি ধীরে-সুস্থে নিংড়োই, প্রত্যেকটি বিন্দু, প্রত্যেকটি মুহূর্ত পুরোপুরি সম্ভোগ করি। আমার রসও বেশি স্বাদও বেশি।'

'কোন অর্থে?'

'আমি সন্ন্যাসী যে। আমার কোনই পার্থিব বন্ধন নেই, না স্ত্রী-পুত্র না বা বিষয়-আশয়। আমি তাই শত্রু-মিত্র বিমুখ-উৎসুক সমস্ত নরনারীকে ভালোবাসতে পারি। নিকটতম থেকে দূরতম পর্যন্ত।'

'পারো?'

'পারি। যেহেতু প্রত্যেকেই আমার কাছে ঈশ্বর—ঈশ্বরপ্রতিচ্ছায়া। মানুষকে ঈশ্বর ভেবে ভালোবাসার আনন্দ একবার ভাবো দেখি। এ

কি নেবুর প্রত্যেকটি বিন্দুকে পরিপূর্ণ আস্বাদ করা নয়? আর, বলো তো, এ রস কি ফুরোয় কোনদিন?'

নানা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্বামীজি। শিকাগোকে কেন্দ্র করে যেতে লাগলেন এখানে-ওখানে। হেলের বাড়ি, ৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিয়ু, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

কোথায় না যাচ্ছেন! ম্যাডিসন, উইসকোনসিন, মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা, ডিসময়েনিস, মেমফিস, টেনেসি, আইওয়া, সেণ্ট লুই, ইণ্ডিয়ানাপোলিস, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বস্টন, কেম্ব্রিজ, বালটিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন আর নিউইয়র্ক। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কী? তাঁর বক্তব্য ধর্ম। তাঁর বক্তব্য ঈশ্বর। মানুষই ঈশ্বর।

তাঁর ম্যাডিসনের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখছে উইসকোনসিন স্টেট জার্নাল:

'কাল এখানকার গির্জায় প্রখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। কী অপূর্ব বললেন তিনি। পৌত্তলিক, কিন্তু তাঁর অনেক কথাই খ্রীষ্টধর্ম মেনে নিতে পারে। তাঁর ধর্ম বিশ্বের মত বিস্তীর্ণ, কাউকে তা প্রত্যাখ্যান করে না, বরং সত্য যেখানেই থাক, নির্বিশেষে তা গ্রহণ করতে সমুৎসুক। অন্ধতা বা কুসংস্কার বা অলস অনুষ্ঠান ধর্ম নয়। ভারতীয় ধর্মে তার স্বীকৃতি নেই।'

মিনিয়াপোলিসে এলে সেখানকার পত্রিকা লিখছে:

'তাঁর কথায় কী প্রগাঢ় আন্তরিকতা! ধীরে ধীরে বলেন, বলেন স্পষ্ট স্বচ্ছ কণ্ঠে। প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত, পর্যাপ্ত-অর্থ, হৃদয়স্পর্শী। যে শুনবে সেই কথার শান্তিতে ও শক্তিতে কৃতনিশ্চয় হবে। হিন্দু-ধর্মের সার কথা কী? আত্মা, প্রতিদেহে যা বাস করছে, তাই ঈশ্বর। আর যে ঈশ্বরত্ব মানুষের মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে সুপ্ত হয়ে তার উদ্বোধনই ধর্ম। মানুষের মধ্যে দুটো বিরুদ্ধ স্রোত কাজ করছে, ভালো আর মন্দ। ভালো যদি প্রবল হয় মানুষ যাবে ঊর্ধ্বতর উন্নততর চেতনায়, আর মন্দ প্রবল হলে যাবে প্রতিকূলে। এই ভালোর বিকাশে ধর্মই প্রধান সহায়ক।'

স্বামীজিকে কেউ বলে ব্রাহ্মণ পুরোত, কেউ বা রাজামহারাজা। তবে উনি যে সব বিষয়ব্যাপার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তা কারু বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু তার সন্ন্যাসনাম কারু কাছেই যথার্থ স্পষ্ট নয়। সবাই তাকে ডাকে কানন্দ বলে। বিবে-টা নাম আর কানন্দ-টা উপাধি।

এহ বাহ্য, আগে কহ আর। কী উচ্চারিত ব্যক্তিত্ব, চক্ষুভরা কী সে উজ্জ্বলতা, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন কারু থেকে অনুমতি চেয়ে নয়, নিজের সহজাত দৈবাদিষ্ট অধিকারে। শুধু কথার কথা বলছে না, বলছে মুক্তাত্মার অন্তরের কথা। আর কী সুন্দর আলখাল্লা আর পাগড়ি আর কোট। তুমি কি দেখবে না শুনবে? দেখাই শোনা আর শোনাই দেখা।

'হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তারা শিক্ষা বলতেও বোঝে শুধু ধর্মই। যা দিয়ে আমি অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কী করব? সব জাতের কেবল একটাই মাত্র কর্তব্য নেই। প্রত্যেককেই কি দোকানদার হতে হবে? না, প্রত্যেককেই করতে হবে মাস্টারি? না, সব জাতই কেবল লড়াই করবে পরস্পর? পৃথিবীর সব জাতির কর্মের সমন্বয় দরকার। ভগবান্ মানবজীবনের অর্কেস্ট্রাতে ভারতবর্ষকে কেবল আধ্যাত্মিক সুরটাই বাজাবার ভার দিয়েছেন।'

আরো বলছেন স্বামীজি: 'তোমাদের ধর্ম কী? দোকানদারি, স্রেফ দোকানদারি। কেবল ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করা: আমাকে এটা দাও ওটা দাও, আমার জন্যে এটা করো ওটা ধরো। শুধু আমার সম্ভোগের পথ সুগম করে দাও। হিন্দুরা মনে করে এই ভিক্ষে চাওয়াটা হীনকর। মাঙনেসে ছোটা হো যাতা। আমি স্বভাবে আছি আমার আবার অভাব কী! হিন্দুরা নিতে চায় না, তারা দিতে চায়। তারা দিতে পারে। তাদের দেবার জিনিস ভালোবাসা। আর, ভালোবাসা নেই কার? আর, কে বলবে, আমার ভালোবাসা ফুরিয়ে গিয়েছে?

শোনো, হিন্দু বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়, শুধু মানুষকে ভালোবেসে। মানুষই ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

আর তোমাদের ভঙ্গিটা কী? যতক্ষণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছ ততক্ষণই

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি সদয় আছ, আর যেই পড়বে দুঃখে-দুর্দিনে তখন ঈশ্বর নামঞ্জুর। হিন্দুর ওসব পাটোয়ারি নেই। হিন্দুর শুধু ভালোবাসার সম্বন্ধ। ঈশ্বর তার কাছে বাবা, মা, নয়তো সন্তান। সুখে রাখলেও বাবা, দুঃখে রাখলেও বাবা। কোলে রাখালেও মা, ফেলে রাখলেও মা। শান্ত হলেও সন্তান, দুরন্ত হলেও সন্তান। অঘটন ঘটলেও তার ঈশ্বর, না ঘটলেও ঈশ্বর। সপ্তাহভোর কাজ করছ ডলারের জন্যে, উপার্জনের মুহূর্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলে আর সমস্ত আস্থা রাখলে নিজের পকেটে। হিন্দুরা বলে তুমি কৃপা করে আমাকে এ টাকা দিয়েছ, এ তোমার টাকা। তাই আমি এ টাকা তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। যে মানুষ দুঃস্থ দুর্গত, তাদের সেবায় এ টাকা ব্যয় হলেই তোমার পাওয়া হবে, দেওয়া হবে তোমাকে। যেহেতু তোমরা শিক্ষিত, যেহেতু তোমরা ধনী, শক্তিমান, সেহেতু তোমরা ভাবছ ঈশ্বরকে পাবার হলে তোমরাই পেয়েছ, তোমরাই বুঝেছ পুরোপুরি। তাই যদি হবে তবে তোমাদের মধ্যে এত পাপ কেন, কেন এত কাপট্য? ঈশ্বরকে ছোঁয়া মানেই সোনা হয়ে যাওয়া, সরল হয়ে যাওয়া। আমৃত্যুকাল আনন্দ-সুন্দর হয়ে থাকা।'

স্বর্ণকুণ্ডল আগুনে পুড়লে সোনাই হয়ে যায়, দুধে দুধ ঢাললে যোগ-ফল দুধই হয়, জলে জল মেশালে জলের বেশি আর কিছু হয় না—সেইরূপ ত্বং, তুমি-পদার্থ জীব তার উপাধি ছেড়ে দিয়ে তৎ, সে-পদার্থ পরব্রহ্মে মিশলে একই থাকে, একই হয়ে যায়। তা হলে আর বিধি কী, নিষেধ কী!

'হ্যাঁ, ভারতবর্ষে আছে কুসংস্কার—কোন দেশে না আছে?' বলছেন আরো স্বামীজি: 'তা নিয়ে কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে চাই তীব্র লিপ্সা, জ্বলন্ত আকূতি। ঈশ্বরকে কামনা করা ছাড়া আর জীবন কী! জীবন থেকে জীবনে এক অফুরন্ত কান্নাই ঈশ্বর।'

কোন একটা পশ্চিমি শহরে এসেছেন স্বামীজি, কতকগুলি যুবক এসে তাঁর কাছে ভারতীয় দর্শনের কথা শুনতে চাইল।

'কে তোমরা?'

'আমরা ফেলনা নই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছি।' হাসল ছেলেরা : 'পাশের গাঁয়ে আমরা থাকি।'

'ওখানে কী করছ?'

'কৃষি ও পশু পালন করছি। খেটেখুটে আসছি ফার্ম থেকে। তাই পোশাক আর চেহারার এই চেহারা।' ছেলেরা ঘিরে ধরল স্বামীজিকে : 'সর্বত্র আপনার নামে ঢাক বাজছে—এমন বক্তা আর হয় না। আমাদের গাঁয়ে যেখানে আমাদের ফার্ম, সেখানে গিয়ে কিছু বলুন না, আমরা একটু শুনি।'

'কী বলব?'

'ভারতীয় যোগের কথাই বলুন।'

'বুঝতে পারবে?'

'কেন পারব না? আপনি বললে সব বোধগম্য হবে।'

'বেশ,যাব একদিন।' স্বামীজি রাজি হলেন।

দলের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল : 'ভারতীয় যোগের মূল কথা কী?'

'নির্বিচলতা।' বললেন স্বামীজি : 'সর্ব অবস্থায় অনুদ্বিগ্ন থাকা।'

বিষয় বিপণিতেই হোক, সংসারের কর্মকোলাহলেই হোক, হোক বা যুদ্ধক্ষেত্রে, যোগীর কিছুতেই বিক্ষেপ-বিচ্যুতি নেই। সে সমাধিনিষ্ঠ, সে অভ্রান্তচিত্ত। এ সমাধি ধ্যানমুদ্রিতনেত্রে নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতার অবস্থা নয়, এ সমাধি ভগবৎসত্তার সমুদ্রে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দেওয়া—ভগবানের প্রেমের আনন্দে নিজের সমস্ত কামনাকে বিসর্জন দেওয়া—তিনি যে দেহ দিয়েছেন তা দিয়ে তাঁরই কর্ম করা আর অন্তরে সর্বথা তাঁতেই বর্তমান থাকা। 'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।' এ যোগী নিত্যসমাহিত নিত্যযুক্ত নিত্যমুক্ত, যুদ্ধ তার কী করবে, কী করবে তার সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়? সে ঈশ্বরে অনন্যমন।

পাশের গাঁয়ে গেলেন স্বামীজি। ছেলেরা এল চারিদিক থেকে। জুটল গাঁয়ের আরো মোড়ল-মাতব্বর।

কোথায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন ? আমাদের এখানে মঞ্চ নেই, বেদী নেই, কিছু নেই।

খালি একটা পিপে ছিল পড়ে। তাই উলটিয়ে দিয়ে বললে, 'এখানে দাঁড়ান, এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিন।'

তাই সই। ওলটানো পিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন স্বামীজি।

কিছুক্ষণ পরেই বক্তব্যে তন্ময় হয়ে গেলেন।

দেখি কেমন তোমার ভারতীয় যোগ। দেখি কেমন তোমার ঈশ্বরস্থিতি !

বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে লাগল ছেলেগুলি—প্রায় স্বামীজিকে লক্ষ্য করে। তাঁকে আঘাত না করে অথচ ঠিক তাঁর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যায় শুধু এইটুক সতর্ক থাকো। দেখি কী করে। দেখি বক্তৃতা থামায় কিনা। হাত তোলে কিনা সমর্পণের বা পরাভবের ভঙ্গিতে। নয় তো বা পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে।

কানের পাশ দিয়ে প্রায় মাথা ছুঁয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্চে গুলি, তবু এক চুল নড়লেন না স্বামীজি। এক বিন্দু চাঞ্চল্যকৌতূহল দেখালেন না। থামলেন না এক নিশ্বাস।

কী ব্যাপার ঘটছে, কেন এই আকস্মিক যুদ্ধোদ্যম, জানতে চাইলেন না, দৃকপাত দূরের কথা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ভয় নেই চিন্তা নেই বিক্ষোভ নেই, আসক্তি নেই অভিমান নেই, নিজের কর্তব্য নিজের বক্তব্য শেষ করলেন।

আনন্দে মহাকলরব তুলে ছুটে এল ছেলেরা। স্বামীজিকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই না হলে খাঁটি লোক, এই না হলে পুরুষোত্তম। বন্দুকের গুলিকে যে ভয় করে না, এই বর্বরোচিত দুর্ব্যবহারেও যার স্খলনপতন নেই, সেই তো মহাযোগী। কাকে যোগ বলে বুঝে নিয়েছি।

সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগ। যোগীই যতচিত্ত, নিরাশী, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ভয়-নিঃসংশয়। ঈশ্বরেই তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ঈশ্বর ছাড়া তার

কেউ নেই, কিছু নেই। 'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন।' যোগই সমস্ত কর্মের কৌশল। যোগেই অনাময় পদলাভ।

৫৫

ট্রেন থেকে নামছেন, এক নিগ্রো কুলি এগিয়ে এল স্বামীজির কাছে। কি এক অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা হাজির স্টেশনে, কুলিও ভাবলে আমিও ভিড়ে যাই সে দলে। আমিই তো বেশি করে সংবর্ধনা করব। উনি যে আমার দেশের লোক, আমারই জাতভাই।

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল কুলি। বললে, 'শুনেছি আমাদের জাতির মধ্যে আপনি একজন মস্তবড় হয়েছেন, সর্বত্র আপনার জয়, তাই আমরা খুব গর্বিত আপনার জন্যে, আপনাকে তাই অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি।'

স্বামীজি একটুও প্রতিবাদ করলেন না। ভুল ভাঙালেন না। নিজেকে ছোট ভাবলেন না। ক্ষোভ বা বিরক্তির রেখা আঁকলেন না মুখে। রসিকতা করেও বললেন না, আমার গায়ের রঙ কি তোমার মতই কালো? আর আমার নাক চোখ মুখ?

কী করলেন? বদান্য হাতের উত্তপ্ত আত্মীয়তার মধ্যে কুলির হাত-খানি টেনে নিলেন। ডাকলেন ভাই বলে। বললেন, 'ভাই, ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে।'

এ রকম ঘটনা আরো ঘটেছে।

দক্ষিণাঞ্চলে, হোটেলে উঠতে যাচ্ছেন, হোটেলের কর্তা বাধা দিয়েছে, এখানে হবে না।

'কেন?'

'আমাদের এখানে নিগ্রোদের জায়গা নেই।'

'কেন নিগ্রোরা কি দোষ করল?'

'তাদের গায়ের রঙ।'

কিন্তু আমি তো নিগ্রো নই, আমি ভারতীয়, প্রাচ্যদেশের অধিবাসী —এ সব কিছু বললেন না স্বামীজি। ফিরে চললেন।

সে কি? তাঁর বক্তৃতা-ভ্রমণের আমেরিকান ম্যানেজার বললে, 'ফিরে যাবেন কেন? আমি সব বুঝিয়ে বলছি এদের। নিগ্রোদের সম্বন্ধেই তো ওদের আপত্তি। আপনি তো নিগ্রো নন।'

'না, কিছু বলতে হবে না। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।'

সন্ধ্যায় বক্তৃতা হল স্বামীজির। পরদিন সকালে খবরের কাগজে ফলাও করে তার বিবরণ বেরুল। বেরুল স্বামীজির ছবি। তাঁর প্রদীপ্ত প্রশংসা। সেই কাগজ হোটেলের কর্তারও হাতে এসে পড়ল। একি! এ যে সেই লোকটির ছবি যাকে নিগ্রো বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, তিনি তো নিগ্রো নন। কই সে কথা তো বললেন না মুখ ফুটে। দেখ দেখ কত বড় মহাপুরুষ! চলো যাই ক্ষমা চেয়ে আসি।

দাড়ি কামাবার সেলুনেও ঐ রকম।

'এখানে হবে না।'

'কেন?'

'আমরা কালো চামড়ার নিগ্রোকে কামাই না।'

চলে এলেন স্বামীজী।

'সে কি কথা?' তাঁর এক পাশ্চাত্ত্য ভক্ত রেগে উঠল: 'কেন ওদের বললেন না আপনি কে? কার সাধ্য আপনাকে ফেরায়?'

'তার মানে,' হাসলেন স্বামীজি, 'ওদের আমি বোঝাব যে আমি নিগ্রো নই, আমি নিগ্রোর চেয়ে উঁচু, নিগ্রোর চেয়ে মানী। অন্যকে ছোট করে আমি বড় হব? আমি কি তারই জন্যে এসেছি পৃথিবীতে?'

'তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার জিনিস কোনো ক্ষুদ্র মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছেন স্বামীজি: 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসেন যদি তিনি ভাবেন স্বামী স্বাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিকতর ভালোবাসবেন যদি তিনি জানতে পারেন স্ত্রী স্বয়ং

ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাও সন্তানদের বেশি ভালোবাসেন যিনি তাদের ব্রহ্মস্বরূপ দেখবেন। সেই ব্যক্তি তার মহাশত্রুকেও ভালোবাসবে যে জানবে ঐ শত্রুও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তি সাধুব্যক্তিকে ভালো-বাসবে যে জানবে ঐ সাধুব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই লোকই আবার অসাধু ব্যক্তিকেও ভালোবাসবে যে জানবে সেই অসাধু পুরুষের পিছনেও প্রভু রয়েছেন। যাঁর কাছে এই ক্ষুদ্র অহং একেবারে মরে গিয়েছে এবং তার জায়গা ঈশ্বর এসে অধিকার করে বসেছে সে জগৎকে চালাতে পারে ইঙ্গিতে। তার কাছে কোথাও দুঃখ কোথায় ক্লেশ, কিসের দ্বন্দ্ব কিসের বিরোধ! তখনই সে বলবার অধিকারী হবে, জগৎ কী সুন্দর! আর চারদিকে যা দেখছি সবই মঙ্গলস্বরূপ। তখন ঘৃণা ঈর্ষা অশুভ অশান্তি চিরকালের জন্য বিদায় নেবে। তখন দেবতায় দেবতায় খেলা, দেবতায় দেবতায় কাজ, দেবতায় দেবতায় ভালোবাসা। তখন কে কাকে আর দরিদ্র বলে ঘৃণা করবে, কে কাকে অপরাধী বলে চাইবে শাস্তি দিতে? চার দিকে ঘৃণার বীজ, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার বীজ না ছড়িয়ে শুধু একবার ভাবো যা দেখছ যা অনুভব করছ সবই তিনি। যখন তোমার মধ্যে আর অশুভ থাকবে না তখন তুমি আর অন্যায় দেখবে কি করে? তোমার মধ্যে থেকে যদি চোরই চলে যায় তা হলে কাকে আর তুমি চোর বলবে? যে বায়ু শ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করছি তার তালে-তালে বলো, তত্ত্বমসি, চন্দ্রে-সূর্যে অণুতে-রেণুতে সমস্ত পদার্থে এই ধ্বনি উচ্চারণ করো, তুমিই সেই, সে ছাড়া আর কিছু নেই। জগতে নরনারীদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও যদি স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে খানিকক্ষণের জন্যেও বলে, হে মানুষ হে পশুপাখি, হে সকল রকমের জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ, তা হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী বদলে যাবে।

হ্যাঁ, আমি ভারতীয়। এ বলতে আমি গর্বিত। তোমার গায়ের চামড়া কটা বলেই তুমি শ্রেষ্ঠ এ অভিমান ত্যাগ করো। আমার মধ্যে শাদা, পীত আর কালো তিন রঙই রয়েছে। শাদা বলতে ইংরেজ, পীত বলতে চীন আর কালো বলতে নিগ্রো। এই দেখ আমার মঙ্গোলীয়

চোয়াল, যাতে বুলডগের গোঁ আর আমার রক্তে তাতারী কর্মশক্তি। হ্যাঁ আমিই তো যথার্থ আর্য।'

ডেট্রয়ট ফ্রি প্রেস কাগজ লিখছে : শ্রোতারা সবাই অবাক, একজন কালো চুল ও কালো চামড়ার লোক কী সম্ভ্রান্ত ঋজুতায় দাঁড়িয়েছে তাদের সামনে, অদ্ভুত পোশাকে, কিন্তু সে পোশাকের কী বিস্তীর্ণ সমারোহ, আর তাদেরই ভাষার অনর্গল কথা বলে তাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। আর বিষয় কী বিচিত্র! 'মানুষের ঈশ্বরত্ব'। আবহাওয়া বিশ্রী অথচ বক্তৃতা আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে থেকেই সমস্ত হল্ লোকে লোকারণ্য। একটি তিল ধারণেরও স্থান নেই। কে না গিয়ে ভিড় করছে! যাকেই গণনা করতে পারো শিক্ষিত বলে, তাকেই খুঁজে পাবে এখানে। আর মেয়েদের তো কথাই নেই। দলে-দলে এসেছে। ড্রয়িংরুমে যেমন সাধারণ বক্তৃতামঞ্চেও তেমনি, সমান দুর্ধর্ষ। চলো দেখে আসি সেই রাজাকে, শুনে আসি তার সমুদ্রনির্ঘোষ। কখনো কখনো বা সেই স্বরে মৃদুমধুর বিষণ্ণতার সুর। শঙ্খ আর বীণা বাজাচ্ছেন একসঙ্গে। আর সমস্ত জনতা এক নিদারুণ স্তব্ধতায় একসঙ্গে একটি নিশ্বাস ফেলছে। আর কী সত্য যে তিনি বলছেন তা যেন প্রত্যক্ষ প্রদীপের মত জ্বলছে। তাকে দেখতে কারু ভুল হচ্ছে না।

'যা কিছু দেখছ, স্থাবর জঙ্গম, সমস্তই সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। সেই চৈতন্যস্বরূপই আমাদের প্রভু। যা কিছু সৃষ্টি সবই প্রভুর পরিণাম, আরো যথার্থ বলতে গেলে প্রভু স্বয়ং। তিনিই সূর্যে চন্দ্রে তারায় দীপ্তি পাচ্ছেন, দীপ্তি পাচ্ছেন অন্ধকারে, ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ আকাশে। তিনিই জননী ধরণী, তিনিই মহোদধি। তিনিই শীতল বৃষ্টি, স্নিগ্ধ আকাশ, আমাদের রক্তের মধ্যে শক্তি। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। যার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই বেদীও তিনি, যে আলো দিয়ে আপনাদের মুখ দেখছি সেই আলোও তিনি। তিনি সঙ্কুচিত হতে-হতে অণু হন আবার বিকশিত হতে-হতে আকাশ হন। যে পরমাণু সেই ঈশ্বর। 'তুমিই পুরুষ তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্বে ভ্রমণশীল যুবক। তুমিই আবার বৃদ্ধ, দণ্ড ছাড়া চলতে পারো না এক পা। হে প্রভু, তুমিই

সকল, তুমিই খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড। জগৎ প্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই শুধু মানববুদ্ধি মানবযুক্তি পরিতৃপ্ত। এক কথায় বলতে গেলে, আমরা তাঁর থেকেই জন্মাই, তাঁতেই বাঁচি, আবার তাঁতেই ফিরে যাই।'

খ্রীষ্টান মিশনারিরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছে—এর মানে কী? এ একটা প্রত্যক্ষ অপমান। যেখানেই পারছেন সেখানেই তীক্ষ্ণধার হচ্ছেন স্বামীজি। ধরো একজন পাপী হিন্দু আছে, কাল সে তোমার হাতে ধর্মান্তরিত হল, আর তুমি বলবে, তক্ষুনি-তক্ষুনি, এমনি সে ইন্দ্রজাল, সে পাপমুক্ত হয়ে গেল, উদ্ধারিত হল পবিত্রতায়। এ পরিবর্তন আসে কি করে? কি করে তা দাবি করতে পারো? তার কি নতুন দেহ হল না নতুন আত্মা হল? তোমরা বলো ঈশ্বর তার পরিবর্তন ঘটালেন। ঈশ্বরই তো পরিপূর্ণ পবিত্রতা। আর মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। তবে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়াচ্ছে, যাকে তোমরা ধর্মান্তরিত করলে, সেই লোক ঈশ্বর যদিও বটে কিন্তু অপবিত্র ঈশ্বর। তোমার ধর্মে নিয়ে এসে তুমিই ঈশ্বরকে পবিত্রতা দিলে। এ বিশুদ্ধ পাগলামি ছাড়া আর কী!

আমাদের দেশে আমরা সব সহ্য করি, শুধু সইতে পারি না অসহিষ্ণুতা। তুমি আমার ধর্ম নিয়ে বা আর কারু বিশ্বাস নিয়ে অসহিষ্ণু হবে এই আমাদের দুঃসহ। 'তুমি ভুল আমিই ঠিক'—এ কথা বলার স্পর্ধা তোমার হয় কি করে? শুধু তরবারির জোরে, রাজদণ্ডের ঔদ্ধত্যে। তুমি কী জানো আমার কথা, আমার বিশ্বব্যাপ্ত ব্রহ্মবাদের কথা! সেই দুই ব্যাঙের গল্প মনে পড়ছে। এক ব্যাঙ কুয়োতে থাকে, সেই কুয়োতে এক সমুদ্রের ব্যাঙ এসে লাফিয়ে পড়ল। বললে, ভাই, সমুদ্র দেখে এলুম। কুয়োর ব্যাঙ বললে, সে কত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, সে ভাই বোঝাতে পারি আমার এমন বিদ্যে নেই, হয়তো তোমারও তেমন বুদ্ধি নেই। বটে? কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে লাফ দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল। বললে—এতটা? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। কুয়োর ব্যাঙ তখন আগের চেয়ে আরো খানিকটা বেশি দূরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। বললে, এতটা? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। তখন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লাফ দিল। বললে, কি এতটা

হবে ? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। সমুদ্রের ব্যাঙ তো ভারি মিথ্যুক, কথা কেবল বাড়িয়েই চলছে। সমুদ্রের ব্যাঙকে কুয়ো থেকে তাই তাড়িয়ে দিল কুয়োর ব্যাঙ।

আর স্বামীজি যখনই দেশের কথা বলেন, বলেন, আমার দেশ, আমার মা। এ যেন সন্ন্যাসীর সুর নয়, এ এক সন্তানের সুর।

নরেন বিদেশে গিয়ে দিগ্বিজয় করেছে শ্রীশ্রীমার এ আনন্দ আর ধরে না।

'আহা যখন গান গাইতেন ঠাকুর, যেন মধু ভরা, যেন ভাসতেন গানের উপর। সে গানে কান ভরে আছে। আর আমার নরেনের কী পঞ্চমেই সুর ছিল ! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ির বাড়িতে। বললে, মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই আবার আসব, নতুবা এই শেষ। আমি বললুম, সে কি ? তখন বললে, না, না, আপনার আশীর্বাদে শিগগিরই ফিরব।'

আমার মা, আমার দেশ !

তুমিই সংসারসুখপ্রহননী, সর্বগ্রন্থিবিভেদিনী, ব্রহ্মজ্ঞানবিনোদিনী। তুমি আমাকে উদ্ধার করো। তুমি বেদবদনা সম্ভাবনাভাবনা কুলকুঠার-ঘাতিনী। তুমি আমাকে পথ দেখাও।

যে ধর্ম স্বামীজির মত প্রতিনিধির জন্ম দিতে পারে সে না জানি কত মহনীয় ! এখন এই কথাই আমেরিকাবাসীদের মুখে-মুখে।

'সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ।' চিঠি লিখেছেন স্বামীজি : 'প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ মাত্র এই, কোথাও আবরণ ঘন কোথাও তরল। সূর্য কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট। বিভিন্ন উপাধির মধ্যে সেই এক আত্মারই প্রকাশ। সেই এক আত্মারই পরিচয়। তাই মানুষের প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত। ঘৃণা নিন্দা অনিষ্টচেষ্টা নয়, কোন কিছুতেই নয়।'

কী বলছে উপনিষদ ? সমস্ত অণুতে-পরমাণুতে সমস্ত রন্ধ্রে-ছিদ্রে, সমস্ত রূপে-স্তূপে অনুরূপ হয়ে স্রষ্টা প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সমগ্র সৃষ্টিই

তাঁর বিগ্রহ। তাঁর প্রকট লীলা। কিন্তু কই, স্বয়ং তিনি কই ? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কী করে দেখি তাঁকে ?

ক্ষুর কোশে বা আধানে ঢাকা আছে, আগুন যেমন কাঠে। অগ্রভাগ থেকে অন্তভাগ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন। খাপ দেখে তুমি ক্ষুর দেখছ না, কাঠ দেখে তুমি দেখছ না আগুন। কিন্তু ক্ষুর আর আগুন দুইই আছে। খাপের যতটা ব্যাপ্তি ক্ষুরেরও তাই। কাঠের যতটা আয়তন আগুনেরও তাই। নৈনেন কিং নানাবৃতং, নৈনেন কিং চ নাসংবৃতম। এমন কিছুই নেই যা তাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, এমন কিছুই নেই যা তাঁর দ্বারা নয় অনুপ্রবিষ্ট। অন্তর্বহিঃ উভয়ত্র তিনি ব্যপ্ত হয়ে আছেন, প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। কোশের আবরণ খোলো, দেখতে পাবে ক্ষুর। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করো, দেখতে পাবে আগুন। আবরণই বাধা, উন্মোচন বা ঘর্ষণই সাধক। অভ্যাস বা প্রযত্নই সাধন। সেই সাধনে যখন আবরণ সরে যাবে তখন মনশ্চক্ষে বা তৃতীয় নেত্রে দেখতে পাবে তাঁকে।

সেই পূর্ণের উপাসনা করো। যখন কথা বলছ তখন তিনি বাকরূপে, যখন দেখছ তখন চক্ষুরূপে, যখন শুনছ তখন কর্ণরূপে, যখন চিন্তা করছ তখন তিনি মনরূপে প্রতিভাত। তাঁর আংশিক প্রতীতিতে তৃপ্তি নেই। সমস্ত ক্রিয়া বা সত্তার একীভূত যে অভিব্যক্তি, যে সর্বভূতগত সর্বাশ্রয়, সেই পূর্ণের সন্ধান করো, সেই এক ও অদ্বিতীয়ের সন্ধান। কী করে সন্ধান করবে ? পদেনানুবিন্দেৎ। তোমার গৃহপালিত প্রিয় পশুটি কোন দূর গভীর অরণ্যে পালিয়ে গেছে। তাকে তুমি কী করে খুঁজবে ? মাটিতে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে। তেমনি রূপে-রূপে খুঁজবে তুমি সেই অরূপকে, সেই অপরূপকে। রূপে-রূপেই তাঁর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। প্রতি রূপে তিনি অনুরূপ হয়ে রইলেন। কিন্তু কেন ? শুধু স্ব-রূপ প্রকাশ করবার জন্যে। 'পূর্বে ওঁর এই রূপ ছিল' বা 'পরে এঁর এই রূপ হল'—এসব কথা তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। অন্তর ও বাহ্য এরকম ভেদবাচক ভিন্ন-ভিন্ন সত্তাও তাঁর নেই। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই সর্বাত্মক।

সপ্তাহে বারো থেকে চৌদ্দ, কি তারও বেশি, বক্তৃতা দিচ্ছেন

স্বামীজি। শরীর-মন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে তবু নিস্তার নেই। আবার ডাক, আবার নিমন্ত্রণ। কিন্তু কি আর বলব, বক্তৃতার আর বিষয় কই? যা বলবার ছিল সবই তো বলেছি এখানে-ওখানে। শুধু একই কথা বারে বারে বলব, বলব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে?

নিস্তেজের মত শুয়ে পড়েছেন স্বামীজি। ঘুমিয়ে পড়েছেন?

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলেন দূর থেকে তাঁকে কে ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে আসছে তাঁর কাছে। একেবারে তাঁর ঘরে তাঁর শয্যাপার্শ্বে। এ কি, কী বলছ? কী বলছি শোনো কান পেতে, শোনো মন দিয়ে। এ কি, বক্তৃতা দিচ্ছ? হ্যাঁ, অবহিত হয়ে শোনো, পরে তুমি কী বলবে, কী তোমার বক্তব্য, জেনে রাখো।

হ্যাঁ, কথা তো একই। যখন একের কথা তখন এক কথাই তো হবে। কিন্তু বিচিত্ররূপে পরিবেশন। এক ছানার ঠাসা থেকে নানান রকম মেঠাই। মূল এক, বৃক্ষ এক, কিন্তু শাখাপ্রশাখা বিচিত্র। অন্তহীন একেকে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করো।

কখনো কখনো দুজন আসছে। কী বক্তৃতা দেওয়া যায় তাই নিয়ে তারা তর্ক করছে আলোচনা করছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলছে।

কখনো এমন সব কথা উঠছে যা স্বামীজি কখনো শোনেননি। এমনি সব ভাব যা কখনো আসেনি চিন্তায়। এ কী অভিনব!

হ্যাঁ, মনের মধ্যে গেঁথে নাও। কালকের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত করো নিজেকে।

'স্বামীজি, কাল অত রাত্রে কার সঙ্গে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা কইছিলেন?' পাশের ঘরের লোক জিগগেস করল প্রভাতে।

সে কী? এ ঘরে এসে স্বপ্নে যে দুজন লোক তর্ক করছিল তাদের কথা শুনতে পেয়েছে পাশের ঘর?

'হয়তো ঘুমের মধ্যে আমিই বকছিলাম।' স্বামীজি পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, না, আপনি একা নন তো। আরো একজন ছিলেন। তার সঙ্গে তুমুল কথা কাটাকাটি করছিলেন আপনি।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, এক স্বর আপনার আরেক স্বর আরেকজনের।'

'কই আর কেউ আসেনি তো ঘরে। আমি তো কিছুই টের পাইনি।'

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার সরল। এ হচ্ছে যোগশক্তির খেলা। ইচ্ছাশক্তির প্রতি-ফলন। তীব্রভাবে ইচ্ছা করেছি আমার বক্তব্য উদ্ঘাটিত হোক, সেই বক্তব্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। গভীরে মনোনিবেশ করে খুঁজেছি তার স্বচ্ছতা, তার স্পষ্টতা। তা ক্রমে স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

তবেই দেখ মনের শক্তি মনের ব্যাপ্তি কত দূর। এই মনই তোমার গুরু। এই মনকেই সেবা করো শ্রদ্ধা করো একমনে। যদি কোনো বিস্ময় কোনো রহস্য এখনো থেকে থাকে তা এই মনে। মনেই সমস্ত রহস্যের সমাধান, সমস্ত বিস্ময়ের সমাপন।

পঞ্চবটীতে ধুনির সামনে নিশ্চল সমাধি উপভোগ করছে তোতাপুরী।

ঠাকুর বললেন, 'তুমি তো ব্রহ্মদর্শন করেছ তবু রোজ-রোজ ধ্যান অভ্যাস করো কেন ?'

তোতাপুরী তাঁর লোটার দিকে ইঙ্গিত করল। বললে, 'দেখছ কেমন ঝকঝক করছে আমার লোটাটা ? নিত্যি ওকে মাজি বলেই তো ওর এমন ঔজ্জ্বল্য। যদি না মাজি, ফেলে রাখি, তাহলে ওর দশা কী হবে ? তখন কি থাকবে ওর এই চাকচিক্য ? তাই মনেরও প্রতি দিনের মার্জনা চাই। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে মনের বারে-বারেই সংস্পর্শ হচ্ছে। সেই সংস্পর্শ থেকে ময়লা জমছে তার মধ্যে। তাই প্রত্যহ চিত্ত-মন ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা মার্জিত করতে হয়। নইলে মনও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।'

'ঠিক, ঠিক, খাঁটি কথা বলেছ।' বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু তোমার এ কথা খাটবে শুধু তখুনিই যখন ঘটিটা পেতলের। ঘটি যদি পেতলের হয় তাকে রোজ মাজা দরকার। না মাজলে তার জেল্লা-জৌলুস কিছু থাকবে না। কিন্তু ঘটি যদি সোনার হয় ?'

চমকে ঠাকুরের দিকে তাকাল তোতাপুরী।

'ঘটি যদি সোনার হয় তাহলে কি আর মাজা দরকার? না মাজলে কি সোনার ঘটিতে ময়লা জমে?'

তোতাপুরী শিষ্যের কথা শুনে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। গুরু মিলে তো লাখ, চেলা মিলে তো এক। বললে, 'পেতলের লোটা যদি সোনা হয়ে যায় তখন তাকে আর কে মাজে? ব্রহ্মস্পর্শে চিত্ত যদি চিৎ হয়ে যায় তখন আর কিসের সাধন-ভজন?

আমি নিঃসঙ্গচিত্ত। প্রকৃতির বিকার দশবিধ, শতবিধ, সহস্রবিধ হোক, তাতে আমার কী! মেঘ কখনো মহাকাশকে স্পর্শ করে না। তবে প্রকৃতি-বিকৃতি আমাকে স্পর্শ করবে কেন? আমি সকলের আধার, আমার থেকেই সকলের প্রকাশ, আমি সর্ব বস্তুতে অবস্থিত অথচ আমাতে কিছু নেই। আমি শুদ্ধ শাশ্বত অটল অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্ম।

'আমার মধ্যে অষ্টৈশ্বর্যের আবির্ভাব হয়েছে।' নরেনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন ঠাকুর: 'আমি তোকে তা দিয়ে যেতে চাই।'

নরেন শুধিয়েছিল: 'ও দিয়ে কি আমার ঈশ্বর দর্শন হবে?'

'না, তা হবে না।'

'তবে ও ছাইপাঁশ দিয়ে আমি কী করব?'

'জগৎসংসারকে তাক লাগিয়ে দিবি। সমস্ত বিশ্ব তোর পায়ের কাছে প্রণত হবে।'

'ঈশ্বরকে দেখে আমিই বিস্মিত হতে চাই। আমিই চাই প্রণত হতে।' দান প্রত্যাখ্যান করে দিল নরেন।

তারপর অপ্রকট হবার আগে ঠাকুর তাঁর সমস্ত শক্তি নরেনকে সঁপে দিয়ে ফকির হয়ে গেলেন। দেবার আগে জিগগেসও করলেন না সে নিতে প্রস্তুত আছে কিনা, করলেন না তার সমর্থনের অপেক্ষা। এ নরেনের ন্যায্য প্রাপ্য। স্বপ্নদৃষ্টি সেই ঋষির কাছে শিশুর সমর্পণ।

এখন স্বামীজি দেখলেন তাঁর মধ্যে যোগজ-শক্তির বহুবিস্তীর্ণ আবির্ভাব হয়েছে। সূচনা অনেক আগে থেকেই হয়েছিল, এখন যেন দুর্দাম দীপ্তিতে ঘটেছে তার বিস্ফোরণ। কাউকে দেখা মাত্রেই তার সমগ্র অতীতকাল স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। লোকটার মনের মধ্যে কী তা পড়ে নিতে পারছেন নিমেষে। দেখতে পাচ্ছেন যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের চেহারা। এ শক্তি অর্জন করবার জন্যে তাঁর কোনো প্রয়াস ছিল না। যোগস্থ হবার শক্তি আয়ত্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই এ বিভূতি নিজের থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এ শক্তি দেখতে বা প্রয়োগ করতে তিনি ব্যস্ত নন, যদিও তিনি জানেন কিছু একটা ম্যাজিক না দেখাতে পারলে সাধারণত লোক অভিভূত হতে জানে না।

কিন্তু সেদিন এক ধনী আমেরিকান খুব প্রগলভতা করছিল। ব্যঙ্গ করছিল হিন্দুর যোগকে। বলছিল স্বামীজিকে, 'আমার মনে এখন কী ভাবনা বলতে পারেন? দিতে পারেন তার ফটোগ্রাফ? আঁকতে পারেন আমার অতীতের চিত্র?'

এ সব ব্যাপারে স্বামীজির ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু এ লোকটার চাপল্য ও লঘুতার শাসন দরকার।

লোকটার দু চোখের মধ্যে স্বামীজি তাঁর দু চোখ নিবদ্ধ করলেন। লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল তপ্ত দুই অগ্নিশলাকা তার শরীরের অস্থি মাংস ভেদ করে অন্তস্তলে গিয়ে ঢুকছে। কোনো অবরোধ কোনো আবরণ দিয়ে তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। দেখে নিচ্ছে জেনে নিচ্ছে তার সমস্ত প্রচ্ছন্নকে।

ভয় পেয়ে করুণকণ্ঠে লোকটা চিৎকার করতে লাগল: 'আর না, আর না। স্বামীজি, আপনার ঐ অগ্নিশর ফিরিয়ে নিন। আমার সমস্ত গোপন কথা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে আর কিছুতেই ঢাকতে পারছি না, লুকোতে পারছি না—'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন স্বামীজি। চাইলেন স্নেহের চোখে, করুণার চোখে।

মেমফিস শহরে মিস গিনি মুন-এর বোর্ডিং হাউসে আছেন স্বামীজি। সেখানে এক প্রসিদ্ধ খবরের কাগজের রিপোর্টার দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে।

ঘরে ঢুকেই তো ভদ্রলোক অবাক।

সুন্দর সুপুরুষ। বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত ললাট, সহানুভূতিতে আলোকিত চক্ষু। কালো চুল ও কালো চোখে মানুষ এত জ্যোতির্ময় হতে পারে এ প্রায় ভাবনাতীত।

'আমেরিকায় কী তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল?' জিগগেস করল রিপোর্টার।

'এ দেশের মেয়েরা। যেমন শ্রী তেমনি শক্তি। আর কত দয়া! যদ্দিন এখানে এসেছি মেয়েরাই বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার দেবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এমন কি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে বাজারে। কত ভাবে যে সাহায্য করছে বলে শেষ করতে পারব না।'

'আর কী ভালো লাগল?'

'এ দেশে দরিদ্র নেই। ইংরেজরাও ধনী বটে কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যাও সেখানে অল্প নয়। এখানে একটা কুলি ছ-টাকা রোজের কম খাটে না। চাকর রাখতে গেলে খাওয়া-পরা বাদ সেই ছ-টাকা মাইনে। এখানে যেমন রোজগার তেমনি খরচ। আর আমাদের দেশ? গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ছ-টাকা।'

পরে আরো বলেছেন স্বামীজি: 'আমাদের দেশে যদি কারু নীচ কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নেই, সে গেল। কেন হে বাপু? কী অত্যাচার! এ দেশের সকলের আশা আছে, সুযোগ-সুবিধা আছে—আজ গরিব, কাল সে ধনী হবে বিদ্বান হবে জগজ্জয়ী হবে। কিন্তু আমাদের দেশে একবার যে গরিব সে চিরজন্মই গরিব। এ দেশেও দোষ আছে বৈকি। ধর্ম বিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নিচে

কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এদের আমরা নাগাল পাবার মধ্যেই নেই। এদের সামাজিক ভাবটা আমরা নেব আর দেব এদের আমাদের অপূর্ব ধর্মের শিক্ষা। আমি এদেশে এসেছি বেড়াতে নয়, স্ফূর্তি করতে নয়, নাম করতে নয়—শুধু দরিদ্রের উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।'

রিপোর্টার জিগগেস করলে, 'যে খ্রীষ্টধর্ম মানে, মৃত্যুর পর, তোমাদের ধর্মমত অনুসারে, তার কী হবে?'

'যদি সে ভালো লোক হয় মুক্ত হবে। শুধু সে কেন, যে ঘোর নাস্তিক, সেও যদি ভালো হয়, আমরা বিশ্বাস করি, তারও মুক্তি অনিবার্য। তাই শেখাচ্ছে আমাদের ধর্ম। তার শুধু এক কথা। শুধু ভালো হতে বলা। আমাদের মতে তাই সব ধর্মই ভালো। ধর্মে-ধর্মে যারা ঝগড়া করে তারাই মন্দ।'

'তোমাদের দেশের লোকেরা নাকি নানান রকম ম্যাজিক করতে পারে?'

'কী রকম ম্যাজিক?'

'শূন্যে উঠে বসতে পারে, নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে মাটির নিচে?'

'আমরা অলৌকিকে বিশ্বাস করি না।' বললেন স্বামীজি, 'কিন্তু বিশ্বাস করি, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই ঘটতে পারে লোকাতীত। আমি নিজের চোখে এখনো দেখিনি যে কেউ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পরাস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু আমি দেখেছি বহু হঠযোগী, যারা এই সাধনায় তৎপর। এই সাধনায় তারা দীর্ঘদিন রয়েছে অনশনে। এত তারা কৃশ করেছে নিজেদের যে যদি তাদের পেটের উপর হাত রাখো, তৎক্ষণাৎ ছুঁতে পারবে তাদের মেরুদণ্ড। কিন্তু নিশ্বাস রোধ করে থাকার কথা যা বলছ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার উদাহরণ।'

'স্বচক্ষে?' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আলোড়িত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, তাতে আর ভুল নেই। দেখেছি মাটির নিচে, গর্ত করে,

একটা লোক গিয়ে বসল, তার মাথার উপর মাটি চাপা দিয়ে সমস্ত রন্ধ্র অবরুদ্ধ করে দিল। মাটির নিচে লোকটার সঙ্গে এতটুকু খাদ্য নেই, পানীয় নেই, শুধু নিরেট মাটি আর নিরবকাশ অন্ধকার। মাথার উপরে ক্রমে-ক্রমে ঘাস গজাল, শষ্য গজাল, সবাই ঠিক করল লোকটাই মাটি হয়ে গিয়েছে। কতদিন পরে খুঁড়ে তোলা হল লোকটাকে। দিব্যি চেয়ে আছে, বেঁচে আছে, শ্বাস ফেলছে পরিষ্কার।'

সবাই একেবারে অভিভূত।

'আর তোমাদের দেশের রোপট্রিক? সেই দড়ির খেলা?' আরেকজন বলে উঠল, 'সেই যে শুনেছি শূন্যে দড়ি ছুঁড়ে মারলে দড়ি খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর সেই দড়ি বেয়ে একটা লোক উপরে উঠতে থাকে আর উঠতে-উঠতে অদৃশ্য হয়ে যায় শূন্যে—'

'শুনেছি কিন্তু দেখিনি।' বললেন স্বামীজি।

'তুমি একটা কিছু জাদু দেখাও না।' একজন খুব পিড়াপিড়ি করতে লাগল: 'সন্ন্যাসী হবার আগে তোমাকেও নিশ্চয়ই থাকতে হয়েছিল মাটির নিচে—'

'না, ওসব কিছুই করতে হয়নি।' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন স্বামীজি, 'ও সবের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী? ওতে কি মানুষ ভালো হয়, না, সাধু হয়, না, পবিত্র হয়? তোমাদের বাইবেলের শয়তান তো অমিতশক্তি কিন্তু সে কি ঈশ্বরের মতো ভালো, ঈশ্বরের মতো মধুর?'

স্বামীজি তখন মঠে, ঠিক শয্যাশায়ী না হলেও অসুস্থ। কবরেজি ওষুধ খাচ্ছেন আর তার কঠোর নিয়ম পালন করতে গিয়ে আহার-নিদ্রা ছেড়েছেন। খেতে পাচ্ছেন না কিছু, চোখের দু পাতাও একত্র হচ্ছে না ঘুমে। তবু তারই মধ্যে কাজ করে চলেছেন, পড়াশোনায়ও ছেদ টানছেন না।

নতুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কেনা হয়েছে মঠে, সার-সার কেমন ঝকঝক করছে বইগুলো। শরৎ চক্রবর্তী, স্বামীজির শিষ্য, বলছেন, 'এত বই এক জীবনে পড়া, পড়ে ওঠা অসম্ভব।'

'বলিস কিরে ?' হাসলেন স্বামীজি : 'আমি তো দশ খণ্ড সেরে এখন একাদশ খণ্ড ধরেছি।'

'বলেন কী ?' শিষ্য তো অবাক : 'দশ খণ্ড পড়ে ফেলেছেন এরই মধ্যে ? প্রথম থেকে শেষ—প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ?'

'প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা না পড়লে বই পড়া হয় কী করে ?' স্নেহময় প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, 'কি রে, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ?'

কথার ভাবেই তো সে সন্দেহ প্রকাশ করেছে শিষ্য। মুখ ফুটে এখন 'না' বলবার উপায় কোথায় ?

'বেশ তো জিগগেস কর না যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো বই থেকে।' অভয় দিলেন স্বামীজি।

এ-খণ্ড ছেড়ে ও-খণ্ড, বেছে-বেছে কঠিন-কঠিন প্রশ্ন জিগগেস করতে লাগল শিষ্য। স্বামীজি অবলীলাক্রমে তাদের ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, স্থানে-স্থানে বইয়ের ঠিক-ঠিক ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করতে লাগলেন। দেখি এবার এ-খণ্ড, এবার আরেক পরিচ্ছেদ। সব ক্ষেত্রেই সমান ফসল। কোথাও বিচ্যুতি নেই, স্খলন-পতন নেই।

'এ কী করে সম্ভব হতে পারে ?' শিষ্য অভিভূত হয়ে পড়ল : 'এ মানুষের সাধ্য নয়।'

স্বামীজি বললেন, 'ছাখ একেই বলে ব্রহ্মচর্যের শক্তি। কোথায় কী ম্যাজিক লাগে এর কাছে ? একমাত্র ঠিক-ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলেই সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়। স্মৃতিধর, শ্রুতিধর হয়ে যাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ যেতে বসেছে ছারেখারে।'

'শুধু ব্রহ্মচর্য ?' এতেও যেন সম্পূর্ণ স্বস্থ হতে পারছে না শিষ্য : 'শুধু ব্রহ্মচর্য রক্ষার ফলেই এই অমানুষিক শক্তি ? দেশে তো আরো কত আছে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। পারবে, পারবে তারা এই কীর্তিতে অধিষ্ঠিত হতে ? যাই বলুন মশায়, ব্রহ্মচর্য ছাড়াও আরো কিছু আছে। আরো কিছু আছে।'

স্বামীজি চুপ করে রইলেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঘরে ঢুকলেন, শরৎকে উঠলেন শাসিয়ে : 'তুই তো

বেশ লোক। দেখতে পাচ্ছিস স্বামীজি অসুস্থ, খেতে-ঘুমতে পাচ্ছেন না। কই গল্প-সল্প করে তাঁর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা নয়, যত দুরূহ বিষয় তুলে তাঁকে ক্লান্ত করছিস। কবরেজ কী বলেছে? বলেছে চুপচাপ থাকতে।'

শিষ্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু স্বামীজি গর্জন করে উঠলেন: 'নে, রেখে দে তোর কবরেজি। এরা আমার সন্তান, এদের উপদেশ দিতে দিতে যদি আমার দেহটা যায় তো যাক, বয়ে গেল।'

বেলগাঁওয়ে হরিপদ মিত্রের বাড়ি যখন ছিলেন তখন একদিন হঠাৎ ডিকেন্সের পিকউইক পেপারস থেকে মুখস্থ বলতে শুরু করলেন। এক নাগাড়ে প্রায় দু-তিন পাতা। বইটা হরিপদর বহুবার পড়া, তাই সে অনায়াসে বুঝতে পারল কোন জায়গাটা উদ্ধৃত করছেন স্বামীজি। কিন্তু হরিপদর বিস্ময়ের অন্ত নেই। পিকউইক পেপারস তো একটা সামাজিক বই। সন্ন্যাসী মানুষ, সে বই পড়লেনই বা কোথায় আর পড়লেনই বা কেন?

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, মুখস্থ রাখলেন কি করে?

তাই জিজ্ঞেস করলে হরিপদ, 'কবার পড়েছেন বইটা?'

'দু-বার।' বললেন স্বামীজি, 'একবার ছেলেবেলায়, ইস্কুলে, আরেকবার এই মাস পাঁচেক আগে।'

'পাঁচ মাস আগে! পড়তেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল?' হরিপদর চোখ প্রায় কপালে উঠল: 'আর পাঁচ মাস পরেও সে স্মৃতি ম্লান হল না?'

'তার কী করি বলো?'

'কিন্তু আমাদের কেন মনে থাকে না?'

'একান্ত মনে পড়োনা বলে। ব্রহ্মচর্যে সমারূঢ় নও বলে।'

হরিপদর বাসায় দুপুরে একাকী ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন স্বামীজি। হঠাৎ তিনি আপন মনে অট্টহাস্য করে উঠলেন। কিছু একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে, সেটা দেখা দরকার, এই ভেবে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল হরিপদ। কই, কিছুই বিশেষ হয়নি তো। যেমন

একা ছিলেন তেমনি একা আছেন স্বামীজি। যেমন পড়ছিলেন তেমনি শান্ত ভঙ্গিতে পড়ছেন নিবিষ্ট হয়ে। তবে কি হাসিটা স্তব্ধতারই বিস্ফোরণ? আবার হাসেন কিনা, কখন হাসেন, শোনবার জন্যে আকুল ও অনড় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল হরিপদ।

প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। অথচ স্বামীজি তাঁকে দেখছেন না, চঞ্চল হচ্ছেন না। সমস্ত মন বইয়ে সমর্পিত, বইয়ের বাইরে আর তাঁর মননচিন্তনের অবকাশ নেই। চুম্বক যেন লোহাকে ধরে আছে নিবিড় করে।

অগত্যা একটা শব্দ করল হরিপদ। স্বামীজি চোখ চাইলেন। বললেন, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বুঝি?'

'অনেকক্ষণ।'

'কিছু বলবে?'

'না। দেখছিলাম কাকে বলে তন্ময়তা।'

'হ্যাঁ, যখন-যে কাজ করবে, একমনে একপ্রাণে, সমস্ত ক্ষমতাকে একাগ্র করে তন্নিষ্ঠ হয়ে করবে।' মৃদু হাসলেন স্বামীজি: 'পওহারী বাবাকে দেখেছ? যে অনন্যচিত্ততা নিয়ে ধ্যান জপ পূজা পাঠ করছেন ঠিক সেই অভিনিবেশে মাজছেন তাঁর পিতলের ঘটিটি। ঘটিটি মাজছেন, কাছে দাঁড়িয়ে করোনা কেন বাক্যালাপ, একটিও উত্তর পাবে না। হয়তো বা সেই বাসন-মাজার মধ্যেও তিনি তন্ময় ব্রহ্মচিন্তায়।'

যে কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারে আর বাইরে কোনো কর্ম না করলেও অন্তরে যার ব্রহ্মচিন্তারূপ নিরন্তর কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে সেই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই যোগী, সেই কৃৎস্নকর্মকৃৎ—তারই সমস্ত কর্ম করা হয়েছে।

মঞ্চের অমিতবিক্রম বীর, পরাক্রান্ত কেশরী, দৈবাধিকারে বক্তা, তাঁর ধর্মের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি—এমনিতরো আরও অনেক বিশেষণে আমেরিকার পত্র-পত্রিকা স্বামীজিকে বিভূষিত করতে লাগল। একবার তাঁর কাছে গিয়ে বোসো, শুধু মুগ্ধ নয়, স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। এমন সুন্দর করে আর কে কথা কইতে পারে? এমন সুন্দর করে কে আর পারে

তর্কে জিততে? আর, ইংরেজি ভাষার উপরে কী অনবদ্য দখল। শুধু স্পষ্টতা আর দ্রুততাই নয় তার সঙ্গে অলঙ্করণের কারুকার্য। ভাষা যদি হৃদ্য না হয় তবে বক্তব্যই বা রুচ্য হবে কী করে?

বোর্ডিং হাউস ছেড়ে অতিথি হয়েছেন ব্রিঙ্কলির বাড়িতে। শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা। বাক্য আর বাক্য। ঈশ্বর বাক্যের অতীত, কিন্তু এমন রহস্য, বাক্যই আবার তাঁর বিভূতি, তাঁর জ্ঞানৈশ্বর্য।

নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ক্লাবে "হিন্দুধর্ম" নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আদিম পাপের জন্যেই মনুষ্যজীবনের পতন—এ আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকটি মানুষই ঈশ্বরের মন্দির। তার আদিম পাপ নয়, তার আদিম শুদ্ধতা। মানুষের আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই আদিম শুদ্ধতায় ফিরে যাওয়া। আর এই ফিরে যাওয়ার পথ হচ্ছে পবিত্রতা আর প্রেম।

যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে থাকেন তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা কতটুকু দেখছি? যতটুকু দেখছি তাকেই জগৎ বলছি স্পর্ধাভরে। জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভূমির বাইরে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তবু ঐ অসম্ভব প্রশ্ন করতে ছাড়ি না। আমরা যদি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন এক অংশমাত্রই সব সময়ে দেখি তাহলে আমাদের বোধও অসম্পূর্ণ। সর্বত্যাগী ঈশ্বর এত বৃহৎ যে এই জগৎই তাঁর অংশমাত্র। যতই বিজ্ঞান বাড়বে ততই আবার বিস্ময় বাড়বে। পূর্ণতা পাবে কোথায়, কখন? যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তার বাইরে যেতে পারবে, তখন। তাকে পাবে যুক্তিবিচারের অতীতে, অহংজ্ঞানের ওপারে, প্রকৃতিতত্ত্বের বাইরে। সেই বাইরেই সাম্য আর সামঞ্জস্য। আর ঐ সাম্যে আর সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা। আর পূর্ণই সত্যস্বরূপ।

কী সুন্দর বলছেন। বলছেন, ঈশ্বরের ভয় থেকেই যদি ধর্মের আরম্ভ, ঈশ্বরের প্রেমেই ধর্মের পরিণাম।

যীশুখ্রীষ্ট আসুন, আমি তাঁকে প্রণাম করব। আর সেই সঙ্গে প্রণাম করব বুদ্ধকে। আর কৃষ্ণকে। এই সর্বদেবনমস্কারই হিন্দুত্ব।

পারবে তোমরা মেনে নিতে সবাইকে?

"মানুষ ও তার নিয়তি"—এ নিয়ে আবার বক্তৃতা দিলেন ওয়্যানস কাউন্সিলে।

কেন ও-কথা ভাবছ যে আমাদের পাপের শাস্তি দেবার জন্যে ঈশ্বর দুর্ধর্ষ রাজার মত বসে আছেন চাবুক হাতে? কিংবা আরেক হাতে তাঁর ফুলের মালা, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করবার জন্যে? কে পাপী, কে পুণ্যবান? উঠে দাঁড়াও, বলো, আমি জেনেছি আমার নিজের সম্বন্ধে চরম সত্য কথা। আমি নিজেই ঈশ্বর। আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। তাই আদিম পাপ নয়, আদিম পবিত্রতা। কাকে তুমি পাপী বলছ? ও আসলে হীরে, শুধু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। ওর গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাও, ও আবার হীরে, প্রথম থেকেই হীরে। এক মুঠো বালি নিংড়ে তেল বের করবে এ বরং বিশ্বাস করব কিন্তু একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসীতে পরিবর্তন করতে পারবে না এ কিছুতেই স্বীকার করব না।

ছাগলের পালে একটা বাঘিনী পড়েছিল। এক ব্যাধ দূর থেকে দেখে তাকে মেরে ফেললে। বাঘিনীর পেটে বাচ্চা ছিল, তখুনি সেটা প্রসব হয়ে গেল। বাচ্চাটা প্রথমে ছাগলের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়ে পরে ছাগলের দলে মিশে ঘাস খেতে লাগল। শুধু তাই নয়, ছাগলের মত লাগল ভ্যা-ভ্যা করতে। অন্য জানোয়ার দেখে ছাগলেরা যেমন পালায় বাঘের বাচ্চাটাও পালাতে লাগল দেখাদেখি। একদিন সেই পালে সত্যি-সত্যি একটা বাঘ এসে পড়ল। ছাগলের সঙ্গে সেই বাঘের বাচ্চাটাও দৌড়ে পালাল। তখন বাঘটা ছাগলদের পিছু না গিয়ে সেই ঘাসখেকো ব্যাঘ্রশাবকটাকে ধরলে। যতই কেননা ভ্যা-ভ্যা করুক তার আজ ত্রাণ নেই কিছুতেই। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল সেই বাঘ। বললে, এই জলের মধ্যে তাকা, নিজেকে ছাখ স্বচক্ষে। কী দেখছিস? আমার যেমনি হাঁড়ির মত মুখ তোরও ঠিক তেমনি। এই নে, খা। ঘাস নয়, যা তোর খাদ্য, মাংস খা। তার মুখে খানিকটা মাংস গুঁজে দিল বাঘ। ঘাসখেকোটা কোনে মতেই খাবে না, কেবল ভ্যা-ভ্যা করে। রক্তের গন্ধ পেয়ে আস্তে আস্তে এগুলো, মাংসের টুকরোটা মুখে পুরে লাগল চিবোতে। বা, খেতে-খেতে বেশ লাগছে।

তখন, বাঘ জিগগেস করলে, কী বুঝছিস? বাঘের বাচ্চা বললে, বুঝেছি তুমিও যা আমিও তাই। বেশ, তবে এখন কী করবি, কোথায় যাবি? বাঘের বাচ্চা বললে, স্ববাসে—স্বধামে যাব। বলে বাঘের সঙ্গ ধরে বনে চলে গেল।

গর্জন করো, ভ্যা-ভ্যা কোরো না। স্বরূপকে চেনো। বলো আমি ছাগল নই আমি বাঘ। আমি চিনেছি নিজেকে। আমি আর ঘাস খাবার দলে নই।

এমনি এত কথা বলছেন স্বামীজি। বিদেশীদের কাছে নতুন সব কাহিনী।

কতকগুলো অন্ধ হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ বস্তুটার নাম হাতি। চোখে তো দেখতে পায় না, হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেল বর্ণনা করতে লাগল। কেউ দিল শুঁড়ে হাত, কেউ পায়ে, কেউ ল্যাজে, কেউ কানে। কেউ বললে, হাতি অজগর সাপের মত, কেউ বললে থামের মত, কেউ দড়ির মত, কেউ বা কুলোর মত। ঝগড়া লেগে গেল, ঝগড়া থেকে শুরু হ'ল মারামারি। এ বললে, তুই মিথ্যেবাদী। ও বললে, তুই। তখন সেই আগের লোকটা, চোখওয়ালা লোকটা এসে বললে, তোমরা সকলেই মিথ্যেবাদী, কেউই তোমরা দেখনি হাতিকে। আমাদের ধর্ম নিয়ে যে ঝগড়া এও শুধু অন্ধের হস্তিদর্শন।

আবার বক্তৃতা। এবার পুনর্জন্ম নিয়ে।

কর্ম দিয়েই জন্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এ একটা খুব সুস্থ কল্পনা। আমার কাজ যদি ভালো হয় উন্নততর জীবন পাব এ বিশ্বাস তো মহত্ত্বের প্রতি প্রেরণা। এ বিশ্বাসের পিছনে, আর যাই হোক জাগ্রত থাকে সদবুদ্ধি। যা গেছে তা গেছে। যদি আরো একটু ভালোভাবে যেত। যা করে ফেলেছি তো ফেলেছি। আহা যদি আরো একটু ভালো করে করতাম! তা কী হয়েছে। এখনো অনেক দিন যাবার বাকি। অনেক কাজ না-করা। বেশ তো আর আগুনে হাত দিও না। তোমার প্রত্যেকটি মুহূর্তই নতুনতরো সম্ভাবনা।

ঠাকুরকে নরেন একবার বললেন, 'ভগবান তিনটি বড়-বড় জিনিস

আমাদের দিয়েছেন। মনুষ্যজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা আর মহাপুরুষের সঙ্গ। মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।'

'ঠিক বলেছিস।' বললেন ঠাকুর: 'আমার তো বোধহয় ভিতরে একজন আছেন।' আবার বললেন, 'ব্রহ্ম অলেপ। তাঁতে তিন গুণ বর্তমান অথচ তিনি নির্লিপ্ত। যেমন হাওয়া। হাওয়াতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুইই আছে কিন্তু হাওয়া নির্লিপ্ত। কাশীতে শঙ্করাচার্য যাচ্ছেন পথ দিয়ে, চণ্ডাল তাকে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললে। শঙ্কর বললেন, ছুঁয়ে ফেললি? চণ্ডাল বললে, ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁইনি। আত্মা নির্লিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আমিও তাই। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণস্বরূপ। এই দেখ এই গামছা আড়াল করলাম—' ঠাকুর গামছাটি নিজের মুখের কাছে ধরলেন: 'আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—মশারি তুলিয়া দেখ—'

'আর ভক্ত?' জিগগেস করল নরেন।

'ভক্তমায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, মা, পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা সব অবস্থাই নেয়, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ সবই আছে। মায়াবাদ শুকনো। কী বললাম বল দেখি।' নরেনের দিকে তাকালেন।

'শুকনো।' নরেন বললে।

নরেনের হাত-মুখ স্পর্শ করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর এসব ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর লক্ষণ আলাদা। তার মুখের চোহারা শুকনো হয়।'

নরেনের পেটের অসুখ হয়েছে। বলছে মাস্টারকে, 'প্রেমভক্তির পথে থাকলেই দেহে মন আসে। তা না হলে আমি কে? আমি মানুষও নই দেবতাও নই, আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই।'

আমেরিকার জনতা, মেয়ে-পুরুষ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন হানছে স্বামীজিকে। ধর্মে বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে সব দিকেই তিনি এমন সুরক্ষিত, কেউ কোনো দেয়ালেই বিন্দু ছিদ্র করতে পারছে না। যে

কোনো অবস্থাতেই নিজেকে উঁচু করে তুলে রাখতে পারছেন। আর সব চেয়ে যা আকর্ষণীয় কিছুতেই বিরক্ত হচ্ছেন না, বিনয় থেকে বিচ্যুতি ঘটছে না একটুও। সব সময়েই এমন একটি বালকের সারল্যের ভাব, এমন অপ্রগলভ আন্তরিকতা যে, যে দেখছে যে শুনছে যে প্রশ্ন করছে সবাই সমান তন্ময়।

'বাঙলাদেশে আমার জন্ম, নিজের ইচ্ছায় আমি সন্ন্যাসী; অকৃতদার।' বলছেন স্বামীজি, 'আমার জন্মের পর আমার বাবা আমার এক কুষ্ঠি তৈরি করিয়েছিলেন কিন্তু আমাকে তিনি ঘুণাক্ষরেও বলেন নি তাতে কী লেখা আছে। কয়েক বছর আগে বাবা মারা যাবার পর যখন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন আমার মার কাছে দেখেছিলাম সেই কুষ্ঠি। সেই কুষ্ঠিতে কী লেখা ছিল জানো? লেখা ছিল আমি গৃহহীন সন্ন্যাসী হয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াব।'

হাতের সিগারের ছাই ঝেড়ে ফেলে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামীজি। কি রকম উদাস এক বিষাদের সুর বাজল ঘরের মধ্যে। শ্রোতৃমণ্ডলী সেই স্পর্শে বিধুর, স্নেহাতুর হয়ে উঠল।

'কিন্তু তোমার ধর্ম যদি এতই ভালো তবে তোমাদের দেশ এত দরিদ্র কেন, অধোগত কেন?' তারই মধ্যে প্রশ্ন করে ওঠে একজন।

'তাতে ধর্মের কী? তাই বলে আমার ধর্ম কি দরিদ্র, আমার ধর্ম কি অধোগত? স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বললেন।

'কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে তোমরা পার্থিবতাকে হারিয়েছ। তাতে কী লাভ হয়েছে?' প্রশ্নকর্তা শ্লেষের সুর আনল: ফাঁকা ভবিষ্যৎকে খুঁজতে বর্তমানকে খুইয়েছ। তোমাদের এই নীতি মানুষকে বাঁচাতে শেখায়নি—'

'মরতে শিখিয়েছে।' স্বামীজির উদাত্ত উত্তর।

'আমরা বর্তমান সম্বন্ধে নিশ্চিত।'

'তোমরা কোনো কিছুর সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত নও।'

'আদর্শ ধর্ম তাকেই বলব যা বাঁচতেও শেখায় মরতেও শেখায়—'

'ঠিক বলেছ। আমরা তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থিবতাকে মেলাতে চাচ্ছি—'

'তুমি কি মনে করো না এই পার্থিব সমৃদ্ধিতে পৌঁছুতে গেলে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় মহাবিপ্লব ঘটাতে হবে?'

'হয়তো হবে কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম নড়বে না, টলবে না, হেলবে না, একচুল। সে সনাতন ধর্ম অব্যাহত থাকবে।'

'থাকুক। কিন্তু তোমরা মূর্তি পুজো কর কেন?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'আর তোমরা? তোমরা কার পুজো কর?

'আমরা ভাবের পুজো করি।'

'কী ভাব? ভাব কাকে বলে? সে কি শুধু বাইবেলের কথা না কি তারও কিছু অতিরিক্ত? আমরা মূর্তির পুজো করি না, মূর্তির মাধ্যমে আমরা অমর্তের পুজো করি। আর তোমরা? ভাব কী? ভাব কোথায়? ভাবকে কী বলে ভাববে? কী, কথা কইছ না কেন?'

এক গ্লাশ জলে ছোট এক কণা বাতাস ঢুকিয়ে দাও, দেখবে অন্তরীক্ষে অনন্তের আয়তন পাবার জন্যে সে কী প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। তেমনি আমরাও সংসারপঙ্কে এসে ডুবেছি কিন্তু আমাদেরও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, কী করে বেরিয়ে এসে আমাদের পবিত্রতম সত্তায় আমরা বিস্তার লাভ করব। এই বিস্তার লাভের উপায়ই ধর্ম। সংগ্রামেই একমাত্র অস্ত্র—অমোঘ অস্ত্র।

৫৭

শিকাগোতে মিসেস হেলের দুটি মেয়ে মেরি আর হ্যারিয়েট আর দুটি বোনঝি হ্যারিয়েট আর ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি এক সঙ্গে থাকে। কারু বিয়ে হয়নি, স্বামীজিকে ভাই বলে আর স্বামীজির থেকে ব্রহ্মচিন্তার পাঠ নেয়।

চারটি মেয়ের মুখেই ঈশ্বরের অদৃশ্য স্বাক্ষর। আনন্দের লিপিতে পবিত্রতার পত্র। সর্বোত্তম বৌদ্ধ প্রার্থনা কী? মৃত্তিকার ধূলিতে যা কিছু

পবিত্র, তার কাছেই আমি মাথা নোয়াব। তোমরা ফুলের মত নিশ্বাস ফেল বাতাসে, তোমাদের পা যেন এই ভয়াল পৃথিবীর ধুলোকাদা না ছোঁয়। ডেট্রয়েট থেকে ইসাবেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : যেমন ফুল হয়ে জন্মেছ তেমনি ফুল হয়ে বেঁচে থেকে ফুলের মতই ঝরে পড়ো, এই তোমাদের ভায়ের নিরন্তর প্রার্থনা।

'এ দেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নেই।' লিখছেন স্বামীজি : 'কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়ালু। মেয়েরাই এদেশের সব। পুণ্যবানের গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী। যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু। আর আমাদের দেশে? পাপাত্মার হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী। পাপাত্মানাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ। হরে হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। এদের মেয়েদের দেখেই বলতে হয়, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জাস্বরূপিণী। ত্বং শ্রীস্তমীশ্বরীস্তং হ্রীঃ। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—এ শুধু এদের দেখেই মনে পড়ে। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক, তুমিই বালিকা। আর আমরা বলছি, দূরমপসর রে চণ্ডাল, ওরে চণ্ডাল, দূরে সরে যা। আমরা বলছি, কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী, কে এই মোহিনী নারীকে সৃষ্টি করেছে?'

মা, সংসারসমুদ্রে আমার তরী বুঝি এবার ডোবে। প্রার্থনা করছেন স্বামীজি। ভ্রান্তির ঘূর্ণি উঠেছে, ছুটেছে আসক্তির ঝড়। আমার দাঁড়ি পাঁচজন বোকা আর মাঝিটা স্বয়ং দুর্বল। এদিকে আমার ধৈর্যের পাল ছেঁড়া, এবার তরী বুঝি ডোবে। মা, রক্ষা করো, রক্ষা করো!

তোমার করুণার সমীরণ পাপী-পুণ্যাত্মার অপেক্ষা করে না, তা চিরকাল প্রবাহিত। তোমার করুণায় প্রেমিক আর ঘাতক দুইই বেঁচে আছে। মায়ের করুণাতেই সকলে সিক্ত—যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। প্রকাশ্যের দ্বারা কি প্রকাশিকা কলুষিত হয়, না কি প্রকাশিকা প্রকাশ্যের অপেক্ষা রাখে। সচ্চিদানন্দময়ী চিরপবিত্রা, চির-অপরিবর্তনীয়া মা, তুমি সকলের সত্তারূপে বর্তমান—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। শিশু স্তন্যপান করে, মধুকর মধুপান

করে। মা, তুমিই তাদের পান করাও। তুমিই দুগ্ধ, তুমিই মধু। তুমিই জননী। তুমিই পুষ্প।

'পশ্চিমের শক্তির সঙ্গে কি ভারতবর্ষের শান্তির সংমিশ্রণ হতে পারে?' কে একজন সন্দেহ প্রকাশ করল।

'নিশ্চয়ই পারে।' গর্জে উঠলেন স্বামীজি, 'সিংহের বিক্রমের সঙ্গে মিলতে পারে হরিণের মৃদুতা। এবং দেখো, একদিন তাই ঘটবে। তাই ঘটলেই পৃথিবীর উদ্ধার।'

মিস মার্গারিট কুক ডেট্রয়টের ইস্কুলে জার্মান পড়ায়। একদিন শুনতে গিয়েছে স্বামীজির বক্তৃতা। নিরেট নীরস মানুষ, এই তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা ছিল, কোনো কিছুতেই সে অভিভূত হতে জানে না। কিন্তু স্বামীজির বক্তৃতা শুনে তার কী রকম ভাবান্তর হল। ইচ্ছে হল বক্তাকে অভিনন্দিত করে। জীবনে এমন ইচ্ছা এর আগে আর কোনোদিন হয়নি, কিন্তু সাধ্য নেই এই অদ্ভুত ইচ্ছাকে সে দাবিয়ে রাখে। সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বুঝি অপ্রতিরোধ্য।

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মার্গারিট। স্বামীজি কতক্ষণ তার হাতখানি ধরে রইলেন। মার্গারিটের মুখে কথা নেই। কথা কোনো আছে কিনা সংসারে তাও সে ভেবে পেল না। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'কোনোদিন ভুলব না তাঁর সেই অগাধ অমিয় দৃষ্টি।' পরে একদিন বলছে মার্গারিট, 'আর জানো, কী পেলাম সেই স্পর্শে?'

'কী?' তার বন্ধু মিসেস উড জিগগেস করল।

'সেই স্পর্শে বুঝলাম কাকে বলে পবিত্রতা, কাকে বলে মহত্ত্ব। যেন আকাশকে ছুঁলাম, না, সমুদ্রের হৃদয়কে। জানো, পাছে সেই স্পর্শের স্বাদ চলে যায় সেই ভয়ে হাত ধুইনি তিন দিন।'

'বলো কি, তিঁন্ দিন হাত ধোওনি?'

'না, যেদিন ধুলাম্ সেদিন আমি আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে চেতনার ঝঙ্কার চলছিল তা থেমে গেল।'

মিসেস উড আর কেউ নন আমেরিকার কবি সারা বার্ড ফিলড।

তখন সে বালিকা মাত্র যখন স্বামীজি ডেট্রয়টে। বালিকা হলেও খবরের কাগজ ওলটানো তার অভ্যেস, কিন্তু দিনের পর দিন যে খবরের কাগজই না খোলো, দেখতে পাবে শুধু একজনের ছবি—যার নাম স্বামী বিবেকানন্দ। আর এমন একটা ছবি যার দিকে চোখ পড়লে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আর তোমার সাধ্য কি সে ছবিকে তোমার চোখ উপেক্ষা করে। তুমি জানতেও পারবে না কখন সে ছবির চোখ তোমাকে গ্রাস করে বসেছে।

সারা-র বাপ গোঁড়া ব্যাপটিস্ট, স্বামীজির অভ্যুদয়ে ভীষণ বিরক্ত। ঐ পৌত্তলিকটাকে নিয়ে কেন সকলে এত মাতামাতি করছে, কী এমন আছে ওর কথায়! সমস্ত শহর একেবারে উৎসবের সাজে সেজেছে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তার উত্তেজনা। যেন এসেছে কোন এক রহস্য রাজ্যের অধীশ্বর! আর আহা, কী তার পোশাকআশাক, কী তার বলার কায়দা। ব্রেকফাস্টের টেবিলে সারা-র বাপ একদিন মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে উপস্থিত হল—আহা, এই তার পাগড়ি—আর একটা কথা বলতে লাগল নাকী সুরে—সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করবার চেষ্টায়—আহা, এই তার বচনভঙ্গি।

ছোট মেয়ে সারা এর কোনো প্রতিবাদ করতে পেল না! কিন্তু উত্তর জীবনে সে তার প্রত্যুত্তর দিলে। কী প্রত্যুত্তর? সে সারাজীবন স্বামীজির ভক্ত হয়ে রইল, হয়ে রইল বেদান্তবাদিনী।

আর ডেট্রয়েটের মিসেস মেরি ফাঙ্ক। বলছে, স্বামীজিকে জানা মানেই জীবনের মূল্যবোধ বদলে যাওয়া। নিজেকে ধিক্কার দেওয়া, ইতিপূর্বে কী সব তুচ্ছ জিনিসকেই দামী ভেবে এসেছি। স্বামীজিকে শুনে আর সন্দেহ থাকে না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কেন? সে শুধু ঈশ্বর পাওয়া, ঈশ্বর হওয়ার জন্যে।

সমস্ত ঘর লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বামীজি উঠছেন রঙ্গমঞ্চে। আনন্দমুখর হয়ে সমস্ত জনতা অভিনন্দন জানাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চে উঠছেন যেন কোন এক রাজা না দেবতা—একটা জ্বলন্ত প্রাণের মশাল—যেদিকে তাকাচ্ছেন সেইদিকই

আলোকিত, বশীভূত হয়ে যাচ্ছে। তারপর শুনতে পাচ্ছি, শুরু করেছেন বলতে। সে স্বর নয়, গীতধ্বনি, যেন ইওলিয়ান বীণা বাজছে, কখনো করুণ আর্তি, কখনো ভয়াল গর্জন—কখনো বা প্রগাঢ় স্তব্ধতা। এত প্রগাঢ় যেন হাত দিয়ে ধরা যায়, যেন বা শোনা যায় তার অব্যক্ত মর্মোচ্ছ্বাস। সমস্ত জনতার এক চক্ষু এক কান এক নিশ্বাস। এক পিণ্ড অখণ্ড অনুভূতি।

সেই মিসেস ফাঙ্ক কলকাতায় স্বামীজির সন্ন্যাসী সখাদের কাছে খবরের কাগজের কাটিংস পাঠাচ্ছেন যাতে, যতটা সম্ভব, একটা পূর্ণাবয়ব চিত্র পাওয়া যায় স্বামীজির। 'কত কষ্ট করে ঘুরে-ঘুরে আমি এসব যোগাড় করেছি। কত তিল-তিল পরিশ্রমে। তাই এসব কাটিংস আমার কাছে অমূল্য বস্তু। অনুরোধ করছি, এগুলির কাজ হয়ে গেলে দয়া করে এগুলি আবার আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে আর কিছু নেই। আপনাদের কাছে তো কত আছে, মঠ আছে, তাঁর ঘর আছে, আছে সেই পবিত্র বেলগাছ। আমার কাছে শুধু এই কটি কাগজের টুকরো।'

পাদ্রীর দল অনেকদিন থেকেই খেপে আছে স্বামীজির বিরুদ্ধে, এবার তাদের রাগ চরমে উঠল। জুটল আরো নতুন শত্রু। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু কুৎসাই প্রচার করতে লাগল না, চাইল তাঁকে সশরীরে সরিয়ে দিতে। শুধু এ দেশ থেকে নয়, পৃথিবী থেকে। পাকিয়ে তুলল হত্যার ষড়যন্ত্র।

ডেট্রয়েটে ডিনার খাচ্ছেন স্বামীজি। খাবার শেষে কফি নিয়ে বসেছেন। গল্প চলেছে। কফির কাপ তুলেছেন মুখের কাছে। চুমুক দেবেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন কফিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া। চমকে তাকালেন ব্যাকুল চোখে, এ কি, ঠাকুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখমুখে দুশ্চিন্তা—উদ্বেগ।

'ও রে, ও কফি খাসনে—'বললেন ঠাকুর।

'কেন?' স্বামীজির পেয়ালা-ধরা হাত কেঁপে-কেঁপে উঠল।

'ঐ পেয়ালাতে বিষ—কফিতে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে—'

স্বামীজি পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন। খেলেন না।

প্রসন্ন চোখে তাকালেন ঠাকুর। অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আমাকে কে মারে?' বলছেন স্বামীজি, 'প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন, অনিমেষে দেখছেন অহর্নিশ। আর কেউ নয়, আমার প্রভু, আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।'

যাঁর পাদপদ্মের নখনিঃসৃত জল ত্রিভুবনের পাতক নাশ করে, যাঁর নামামৃত পানে সর্বসন্তাপ দূরে যায়, যাঁর চরণস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা প্রাণময়ী হয়ে ওঠে, সেই আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।

হে বিষয়পাশসংহারিণী রাজপদপ্রদা, আমাকে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। হে সর্বশত্রুবশঙ্করী সঙ্কটনাশিনী সর্বশ্রমহরা, আমাকে, নতজনকে, রক্ষা করো। হে মজ্জজনোত্তারিণী বীরসাধনবাসিনী, সমস্তদোষঘাতিকে, তোমাকে নমস্কার।

গ্রীনএকারে এসেছেন স্বামীজি। কতগুলি ছাত্র এসে জুটেছে। বেদান্ত শিখতে চায় স্বামীজির কাছে। স্বামীজি সমধিক উৎসাহী। তবে, বেশ, বসে পড়ো এই পাইন গাছের নিচে, ভারতীয় রীতিতে, শ্রদ্ধাবিনম্র ভঙ্গিতে। আমিও বসছি, শোনাচ্ছি বেদান্ত।

তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, মনন করতে পারে না, কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নন, অপূর্ণ ও অন্তবিশিষ্টের পক্ষে কী করে পূর্ণ ও অনন্তকে ধারণ করবে? তিনি ছাড়া আর কেউ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নেই। তিনি কেবল অন্তর্যামী নন, তিনি অমৃত, নিত্যসুখদ। তাঁর থেকে পৃথক বা বিযুক্ত হয়ে আমরা যা করি বা ভাবি তাতেই আমাদের আর্তি। তিনি ছাড়া আর সমস্তই দুঃখের। শোনো, তিনিই তোমার আত্মা, তোমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন, তিনিই পুরাণপুরুষ, আদিমপুরুষ।

গ্রীনএকার থেকে মেরী হেল আর হ্যারিয়েট হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'এখানে একটি যুবক রোজ গান করে। তার ভাবী পত্নী ও

বোনের সঙ্গে সে এখানে আছে। এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল—জানো, আমি রোজ সকালে ঐ গাছের নিচে হিন্দুধরণে বসে ওদের সকলকে উপদেশ দিই। ওদের সঙ্গে আমিও সেদিন গেছলাম—তারকাখচিত আকাশের নিচে মাতা বসুন্ধরার কোলে শুয়ে রাতটা কী আনন্দেই যে কেটেছে। মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—সে আনন্দের আর তুলনা নেই। যারা সরাইয়ে রয়েছে তারা কমবেশি অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল কাপট্যলেশহীন। তারা একটু খেয়ালী কিন্তু শুদ্ধাত্মা। জানো, সকলকে শিবোঽহং শিবোঽহং করতে শেখাই আর ওরা সমস্বরে তাই আবৃত্তি করতে থাকে, সকলেই কি সরল, কি অসীমসাহসী। এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।'

ভিতরকার একটা বাণী আমাদের সর্বদা বলছে, আমরা চিরন্তন ক্রীতদাস নই, আমরা নিত্যস্বাধীন। বাণী শোনো আর না শোনো, প্রভুর বাণী চিরজাগ্রত: হে ভারগ্রস্ত, শ্রান্ত, আমার কাছে এস, তোমার ভার অপনোদন করব। বন্ধন আর মুক্তির এই সংগ্রাম, এই হল জীবনের চিহ্ন। এ না থাকলে বুঝবে জীবের আর জীবন নেই। আখেরে জানবে মুক্তিই জয়ী হবে। মুক্তিই সর্ববরেশ্বরী।

শোন বেদান্তের কথা। কী এই জগৎ? স্বামীজি বলছেন, নামরূপায়ত ব্রহ্মই জগৎ। এই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করেই নামরূপাত্মক ভ্রান্তি অভিব্যক্ত থাকে যতক্ষণ তার অধিষ্ঠানের জ্ঞান না হয়। ব্রহ্মই নিঃসীমসুখসাগর। নুনের পুতুল হয়ে ডুবে যাও নুনের সমুদ্রে।

'কী শিখিয়েছেন আমাদের বিবেকানন্দ?' ডক্টর গ্রসম্যান বক্তৃতা দিচ্ছেন: 'শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম, ধর্ম জীবন্ত কর্ম।' আমাদের ভাব আছে, কিন্তু যে কর্ম ভাবেরই রক্তমাংস সেই কর্ম নেই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা বলি কিন্তু প্রাচ্য দেশের লোক হলে তাকে প্রত্যক্ষ অপমান করতে পেছপা হই না। আমাদের ঈশ্বর আকাশে কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে

আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে। প্রতিটি চুলে ঈশ্বর, প্রতিটি তৃণখণ্ডে, প্রতিটি সমীরমর্মরে, প্রতিটি রক্তচাঞ্চল্যে, হৃদয়স্পন্দে। এই তো শেখালেন স্বামীজি।

'আমি তোমাদের যীশুখ্রীস্টকে টেনে নিতে পারি বুকের মধ্যে, টেনে নিতে পারি কি, টেনে নিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার কৃষ্ণকে বুকে টেনে নিতে পারো? পারো না, পারবে না। নেই তোমার সেই হৃদয়-প্রসার। কিন্তু আশ্চর্য, তুমিই সভ্য আমি বর্বর, আমিই পৌত্তলিক আর তুমি ধর্মপ্রাণ!' বলছেন বিবেকানন্দ। আর তা প্রহারের মত আমাদের গায়ে এসে লাগছে!

'আর, তাকিয়ে দেখ, হিন্দু যাকে অতিথি বলে সেই অতিথির দিকে। দরিদ্র সংসার, কিন্তু দ্বারে অতিথি এসেছে, ছোট শিশু মহোল্লাসে তাই ঘোষণা করছে বাপ-মায়ের কাছে। অতিথিই তো স্বয়মাগত ঈশ্বর হিন্দুর কাছে। অতিথিকে পাওয়া মানেই তো সেবাচর্যা করবার সুযোগ পাওয়া। আর এই সেবাচর্যা কাকে? মানুষকে নয়, মানুষবেশী ঈশ্বরকে।'

'আমাদের ধর্ম কবে, কোথায় ও কতক্ষণ?' বলছেন আবার গ্রসম্যান। 'আমাদের ধর্ম রবিবারে, গির্জেয়, সকালে দু-ঘণ্টা। আর হিন্দুর ধর্ম প্রত্যহ, সর্বত্র ও সর্বক্ষণ। নিখিল বিশ্বের অণুতে-রেণুতে, প্রতিটি নিশ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তের ভ্রমরগুঞ্জনে।'

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কি শুধু কথাই কইবেন? কাজে কিছু দেখাবেন না? আরেক দল লোক আন্দোলন শুরু করে দিল।

কাজে আবার কী দেখাবেন?

কেন, ইন্দ্রজাল? যাকে বলে ফকিরের কেরামতি?

যদি ভেলকিই না দেখাতে পারল তাহলে আর হিন্দু হবার কৃতিত্ব কী! দশ হাজার লোকের চোখের সামনে খোলা মাঠে একটা পাইনগাছ গজিয়ে দিতে পারো তবেই তো বুঝি কেমন বাহাদুর! নইলে কথা আর কথা, ঢের-ঢের অমন শুনেছি আমরা। তোমার চেয়েও লম্বা

বক্তৃতা দেবার লোক কম নেই আমেরিকায়। তোমার ধর্ম যদি এতই তেজী তবে দেখাও সেই দড়ির খেলা। দাঁড়ানো দড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কসরৎ।

এর আবার পালটা গাইছে স্বামীজির অনুরাগীর দল।

ধর্ম মানে কি ভোজবাজি? অলৌকিক বলে কিছু নেই এ বলবার সাহস কার আছে? সেই অতিপ্রাকৃতিক প্রচ্ছন্নশক্তির কী রহস্য তাই হিন্দু ঋষিদের অনুধাবনের বিষয়, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক? যে ঐন্দ্রজালিক সেই তাহলে ধার্মিক? যীশুর কাছেও সেই দাবিই করেছিল সেদিন: 'আমাদের ভেলকি দেখাও।' 'তবু কি তোমরা বিশ্বাস করবে?' বলেছিলেন যীশু: 'মৃত লোক উঠে এলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।' যারা অজ্ঞানী তারাই কুহকের খোঁজ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ যদি কিছু শান্তির বাণী নিয়ে এসে থাকেন, পবিত্রতার বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী, তাহলেই তিনি কৃতকৃত্য। যদি ধর্মান্ধের তিনি চোখ ফোটাতে পেরে থাকেন আর অসহিষ্ণুর বধিরতাকে দ্রব করতে, তাহলেই তাঁর এ দেশে আসা সার্থক হয়েছে। আর তিনি তো প্রত্যহই প্রমাণ করছেন যাঁকে আমরা পৌত্তলিক বলছি তাঁর মধ্যে এমন সব গুণ আছে যা পরিচ্ছন্নতম খ্রীস্টানের মধ্যেও নেই। আর কে পেরেছে মানুষের মধ্যে দিব্য উদ্দীপনা জাগাতে, সমস্ত বিদ্বেষকে প্রেমে বিশুদ্ধ করতে, পরিপূর্ণের উপলব্ধিতে দাঁড়াতে স্থির হয়ে। আর কার ললাটে লেখা নির্ভুল ঈশ্বরের ঠিকানা?

আমার ধর্মের মহত্ত্বের প্রমাণে আমি কোনো ম্যাজিক দেখাতে প্রস্তুত নই। বলছেন স্বামীজি। প্রথমত আমি বাজিকর নই, দ্বিতীয়ত আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইন্দ্রজালের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মে আমরা ভেলকি বলে কোনো কিছুকে স্বীকার করি না। তবে এ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাইরে আছে আরো রহস্য যা আরো কোনো গহন শক্তির অধীন, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের সংস্রব কী। ধর্ম দৃঢ় সত্যের উপর দাঁড়িয়ে, হাতসাফাইয়ের চালাকির উপরে নয়। অলৌকিকের এলেকায় না গিয়েও ধর্ম—ধর্ম। আর যদি

কেউ কখনো পৌঁছয়ও সেইখানে তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মও সেখানে পৌঁছয় না।

মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে আছেন স্বামীজি, বাড়ির এককোণে পড়ার ঘরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। তালা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে দরজা। বাড়ির আরেক প্রান্তে বৈঠকখানায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল তাদের মধ্যে স্বামীজি বসে।

সে কী কথা? তাঁকে না ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে? কী করে নিমেষের মধ্যে এলেন তবে তিনি এখানে! তবে কি কেউ তাঁকে খুলে দিয়েছে দরজা? তাই বা কী করে সম্ভব? বা, চাবি তো এইখানে, এই একজন গণ্যমান্যের পকেটে। পকেট থেকে চাবি হাওয়া হয় কী করে?

চলো গিয়ে দেখে আসি। কী করে খোলা হল দরজা! কী ভাবে বেরিয়ে গেলেন!

সকলে সেই পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে ভিড় করল। ঐকী, দরজা খোলা নয় তো! যেমনটি তালাবন্ধ ছিল তেমনি তালাবন্ধই আছে। তবে কি স্বামীজি জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন? তাই বা সম্ভব হয় কী করে? জানলায় শিক ছিল না? জানলা দিয়ে বেরিয়েই বা বাড়ির এ প্রান্তে আসেন কী করে সহসা?

অত গবেষণার দরকার কী! তালা খুলে দেখলেই তো হয়।

তালা খুলে দেখা গেল যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসে আছেন স্বামীজি। বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে।

৫৮

নিউইয়র্কে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে শিষ্যদের রাজযোগ শেখাতে লাগলেন স্বামীজি। বিনামূল্যে শেখাব। আর যা যা খরচ হবে সব আমার। বক্তৃতা দিয়ে-দিয়ে পয়সা কিছু জমেছে হাতে। দরকার হলে আরো বক্তৃতা দেব। রোজগার বাড়াব। কিন্তু পড়িয়ে পয়সা নেব না।

তোমরা কে আছ উৎসাহী সত্যসন্ধিৎসু ছাত্র, এগিয়ে এস। ধ্যান

ধারণা শেখ। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম নয়, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম।

এই অনুভূতি পেতে হলে সর্বাগ্রে শরীর ও মনের সংযমসাধন করা চাই। যে নিয়ম অভ্যাস করলে এই সংযম সহজ হয় তারই নাম রাজযোগ।

যোগ কী?

চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে নানা প্রকার বৃত্তি বা আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই যোগ।

যোগ দু রকম। অভাবযোগ আর মহাযোগ।

যখন নিজেকে শূন্য ও সর্বগুণবিরহিত ভাবে চিন্তা করবে তখন সেটা অভাবযোগ। আর যখন আত্মাকে আনন্দময় বলে, পবিত্র বলে, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে চিন্তা করবে তখন সেটা মহাযোগ।

এই দুই যোগেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপে অবলোকন করাই আত্মসাক্ষাৎকার।

আর তারই নাম রাজযোগ।

রাজযোগের আট অঙ্গ বা সোপান। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আর সমাধি।

যমে চিত্তশুদ্ধি। যমের আবার পঞ্চ প্রদীপ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য আর অপরিগ্রহ।

অহিংসা কী? শরীর মন ও বাক্য দিয়ে কোনো প্রাণীর হিংসা না করা বা ক্লেশোৎপাদন না করাই অহিংসা।

সত্য কী? যথার্থকথনই সত্য।

চৌর্য বা বলপূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়।

কায়মনোবাক্যে বীর্যধারণই ব্রহ্মচর্য।

অতি কষ্টের সময়েও কারু কাছ থেকে দান বা উপহার না নেওয়ার নাম অপরিগ্রহ।

তারপরে নিয়ম। নিয়মের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রতপালন।

নিয়মেরও পঞ্চ প্রদীপ—তপ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ আর ঈশ্বর-প্রণিধান।

উপবাসে বা অন্য উপায়ে শরীরকে সংযত করার নাম তপ।

বেদপাঠ বা অন্য কোনো মন্ত্র উচ্চারণই স্বাধ্যায়। মন্ত্র উচ্চারণের আবার তিন রীতি। বাচিক, উপাংশু ও মানস। যে উচ্চস্বর জপ সকলে শুনতে পায় তার নাম বাচিক। যে জপে কেবল ঠোঁট নড়ে কিন্তু কাছের মানুষও কোনো শব্দ শুনতে পায় না তার নাম উপাংশু। যে জপে কোনো শব্দ-উচ্চারণ হয় না, শুধু মনে-মনে যা স্ফুরিত হয়, স্ফুরণের সঙ্গে মন্ত্রের অর্থও স্মরণ করা হয় তার নাম মানস। বাচিকের চেয়ে উপাংশু শ্রেষ্ঠ, আর মানস শ্রেষ্ঠ উপাংশুর চেয়ে।

সন্তোষ মানে যদৃচ্ছালাভে ভরপুর সুখ।

শৌচ দুরকম। বাহ্য আর আভ্যন্তর।

যা দিয়ে শরীর শুদ্ধ করা হয়, যেমন স্নান, তাই বাহ্য। আর যা দিয়ে মন শুদ্ধ করা হয়, যেমন সত্য, তাই আভ্যন্তর। দুরকম শুচিতাই দরকার। আর যখন এমন হয় দুরকম শুচিতাই সম্পন্ন করা যাচ্ছে না একসঙ্গে, তখন বাহ্য ফেলে আভ্যন্তর নেবে।

আর ঈশ্বরপ্রণিধান? ঈশ্বরই স্মরণ-মনন স্তুতি-প্রীতি ভজন-পূজনই ঈশ্বরপ্রণিধান।

এবার তৃতীয়ে এস। তৃতীয় আসন।

শির, গ্রীবা ও বক্ষ সমান রেখে শরীরকে স্বচ্ছন্দে ও সুখে বসিয়ে রাখার নাম আসন।

তারপরে প্রাণায়াম।

প্রাণ হচ্ছে শরীরের ভিতরকার চঞ্চল জীবনশক্তি। আর, আয়াম মানে হচ্ছে সংযম।

প্রাণায়াম তিনরকম। অধম, মধ্যম আর উত্তম। প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত। পূরক কুম্ভক রেচক। পূরক মানে শ্বাসগ্রহণ, কুম্ভক মানে শ্বাসের স্থিতি, মানে, শ্বাসকে ভিতরে ধরে রাখা, আর রেচক মানে শ্বাস ত্যাগ। যে প্রাণায়ামে বারো সেকেণ্ড বায়ু পূরণ করা যায় তা অধম। চব্বিশ সেকেণ্ড বায়ু পূরণ করলে মধ্যম। আর যদি ছত্রিশ সেকেণ্ড বায়ু পূরণ সম্ভব হয়, তাহলে তা উত্তম। অধমে ঘর্ম, মধ্যমে

কম্পন আর উত্তমে আসন থেকে উত্থান ঘটে। আর প্রাণায়ামের সময় গায়ত্রী তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করা বিধেয়।

গায়ত্রী কী? গায়ত্রী বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। তার মানে কী? যিনি আমাদের এই জগতের প্রসবিতা, পরম দেবতার যিনি প্রিয় সেই তেজঃপুঞ্জকে আমরা ধ্যান করি। আমাদের বুদ্ধিতে তিনি জ্ঞান বিকশিত করুন।

এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। দুয়ে মিলে এক পরিপূর্ণতার গান।

আর প্রত্যাহার?

বহির্মুখী ইন্দ্রিয়দের অন্তর্মুখী করা অর্থাৎ নিজেদের অধীনে নিয়ে রাখার নাম প্রত্যাহার। নিজের দিকে আহরণ বা সংগ্রহের কৌশলই প্রত্যাহারের আরেক নাম।

মনকে এক জায়গায় সংলগ্ন করে রাখাই ধারণা।

সংলগ্ন করবার প্রশস্ত স্থান কোথায়? হৃদপদ্মে বা মাথার মধ্যদেশে। বেশ তো, নাই বা খোঁজ পেলে জায়গা দুটোর, দেহের যে কোনো জায়গায় খুশি মনকে অভিনিবিষ্ট করো। তারপর ভাবতরঙ্গ তোলো। বহুবিরুদ্ধ প্রবাহ উঠে ঐ তরঙ্গকে নষ্ট করতে না পারে তার চেষ্টা করতে থাকো। শুধু তাই নয়, প্রথম ভাবতরঙ্গকে এমন প্রবল করো যাতে বিরুদ্ধ প্রবাহ গুলি ক্রমে-ক্রমে নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে যায়। তখন শুধু এক তরঙ্গ, সমস্ত তরঙ্গ—আর তারই নাম ধ্যান।

আর যখন এই অবলম্বনেরও প্রয়োজন হয় না, সমস্ত মনই যখন একরূপ, তখন সেই একরূপতাই সমাধি।

অতি গোপন ও নির্জন স্থানে, যেখানে কোলাহল নেই, বিপদের আশঙ্কা নেই, যেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না তেমন জায়গায় গিয়ে সাধনা করো। নয় তো বা সুন্দর দৃশ্য পরিবেশে বা নিজ গৃহের সুন্দর একটি নিভৃতিতে। সাধনে প্রবৃত্ত হবার আগে প্রাচীন যোগীদের নমস্কার করো। নমস্কার করো তোমার গুরুদেবের ভগবানকে।

সরলভাবে বসে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করো। দেখবে এই নাসিকাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনই মনঃস্থৈর্যের সহায়ক।

এগিয়ে যাও। সতত সচেষ্ট থাকো।

যদি মনকে কোনো স্থানে বারো সেকেণ্ড ধরে রাখা যায়, তাতে একটি ধারণা হয়। এই ধারণ বারো গুণ হলে একটি ধ্যান হয়। আর ধ্যান বারো গুণ হলেই এক সমাধি।

ধ্যানের উপরই বেশি জোর দিচ্ছেন স্বামীজি। বিষয়বিশেষে অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযমই ধ্যান। মনের উপর বলপ্রয়োগের দরকার নেই। শুধু অভ্যাসেই মনকে তন্ময় করা যায় ধ্যেয়বস্তুতে। শুধু অভ্যাস, শুধু সংযম, শুধু একনিষ্ঠতা।

মধ্যযুগে ইউরোপেও অনেক সাধক জানতেন এই ধ্যান, এই সমাধি যা ধ্যানেরই পরিপক্ক অবস্থা। কিন্তু ভারতবর্ষেই এর পথ ও প্রণালী বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষেই যোগকে দিয়েছে বিজ্ঞানের যথার্থ রূপায়ণ। দেখ, শেখ, আয়ত্ত করো এই বিজ্ঞানের বিভূতি।

তারপরে আসনে বসে প্রাণায়াম করো। প্রাণায়ামেই মনের মল ক্ষয় হয়, আর সেই নির্মলীকৃত মনই স্থির হয় ব্রহ্মে।

ধ্যান শেখাতে গিয়ে নিজেই সমাধিস্থ হয়ে যান স্বামীজি। যখন বাহ্যচেতনা ফিরে আসে তখন নিজের উপরই বিরক্ত হন। এতক্ষণ সবাইকে তা হলে হাঁ করিয়ে বসিয়ে রেখেছি। এতক্ষণ ধ্যানে নিমজ্জিত থাকবার কী হয়েছিল! এদের কাছে, আমি তো এখন যোগী নই, আমি শিক্ষক। তাই আমার নিজের তলিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

কিন্তু সাধ্য কী, মনকে শান্ত করতে গেলে তুমি তলিয়ে না যাও!

সেই কত দিনের কথা, মনে পড়ল স্বামীজির। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করে এসেছে নরেন। ঠাকুর বললেন, 'যাও বটতলায় গিয়ে ধ্যান করোগে।'

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা, নরেন পঞ্চবটীতে বসেছে ধ্যান করতে। কী রকম হচ্ছে সরজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন ঠাকুর। বললেন, 'ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। ডুব দিতে হয়। উপর-উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়?' এই বলে গান ধরলেন ভরা গলায়:

ডুব দে মন কালী বলে, হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে,
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥

আবার বললেন, 'ডুব দিলে অবশ্যি কুমির ধরতে পারে কিন্তু গায়ে হলুদ মেখে নিলে কুমির ছোঁয় না। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ছয়টি কুমির আছে। কিন্তু বিবেকবৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমায় ছোঁবেনা। আগে ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ন তোলা, তারপরে অন্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নেই ভজন নেই, বিবেকবৈরাগ্য নেই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।'

বিবেক কি ? ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু এর নাম বিবেক। আর ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় ও একাগ্র অনুরাগই বৈরাগ্য।

পড়াতে-পড়াতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়া কাজের কথা নয়। তাই অন্তরঙ্গ শিষ্যদের স্বামীজি শিখিয়ে দিলেন ওরকম অবস্থায় কি করে তাঁর ধ্যান ভাঙবে। এই একটি নাম তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। যদি দেখ সমাহিত হয়ে গিয়েছি তখন আমার কানে এই নামটি অনুচ্চে উচ্চারণ করবে আর আমি অমনি স্বাভাবিক হয়ে যাব।

কখনো বা বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, কখনো বা আবৃত্তি করেন সংস্কৃত শ্লোক—চারিদিকের জল-স্থল-আকাশ শান্তিতে ও শক্তিতে ভরে ওঠে। বাতাসে আনন্দক্ষরণ হতে থাকে। আধ্যাত্মিক শ্রীতে সকলকে তখন আশ্চর্যসুন্দর দেখায়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ। বহু বিদ্যায় নয় মেধায় নয় শ্রবণেও নয় —পরমাত্মাকে সেই লাভ করতে পারে যার প্রতি তিনি অনুগ্রাহী। অর্থাৎ তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে পাওয়া যাবে না। অন্য অর্থও করতে পারো। সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি লভ্য। এই একই শ্লোক দুই উপনিষদে আছে—কঠে আর মুণ্ডকে। কঠোপনিষদের মন্ত্রে পরমাত্মার কৃপার প্রতি ইঙ্গিত আর মুণ্ডকোপনিষদে সাধনভূত বরণের প্রতি ইঙ্গিত। আবার শোনো। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বলহীন কে ? যার আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য

নেই, যে মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত, সেই বলহীন। সেই বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নন। সন্ন্যাস কাকে বলে? সর্বত্যাগের নাম সন্ন্যাস। যে বিবেকী বল ও অপ্রমাদ জ্ঞান ও সন্ন্যাস সাধন করতে তৎপর সেই সর্বাশ্রয় আত্মায় প্রবেশ করে।

মিসেস ব্যাগলি-র বাড়িতে বক্তৃতা দেয়ার দরুন তুশো ডলার পাওয়া গিয়েছে শ্রোতাদের থেকে। স্বামীজি জানেনও না, মিস্টার ফ্রিয়ার নামে এক ভদ্রলোক তা আদায় করেছেন। সে টাকা মিসেস ব্যাগলির বড় মেয়ে ফ্লোরেন্স পাঠিয়ে দিল স্বামীজিকে। লিখে পাঠাল, স্বামীজি, ফ্রিয়ারের মত লোককে যখন মুগ্ধ করতে পেরেছ আর সে যখন তোমার বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন আর চিন্তা নেই, তোমার কাজ সুসম্পূর্ণ হবেই হবে। তুমি এখুনি ভারতবর্ষে ফিরে যেওনা। তোমার ধর্মের বিত্তালয়ের ভিত্তিকে এখানে, এ দেশে, দৃঢ়ীভূত করো। মিস্টার ফ্রিয়ারের সাহায্যেরই বা প্রয়োজন কী? অসাধ্যসাধন করবে তোমার ব্যক্তিক আবেদন, তোমার চক্ষু তোমার কণ্ঠস্বর তোমার দিব্যদীপ্ত উপস্থিতি। স্বামীজি, তুমি থেকে যাও। আমাদের ফেলে চলে যেও না।

ধর্ম কি শুধু একটা খেয়াল, হুজুগ, একটা ফ্যাশান? ঢং? শুধু গির্জেয় গিয়ে বাজনা শোনা, লেকচার শোনা? বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। কা বোঝ তোমরা ধর্ম বলতে? হ্যাঁ, বলো, ধর্ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস আর তাকে ভালোবাসো। তোমরা ভালোবাসো ঈশ্বরকে? কী মতলব করে ভালোবাসো? যদি কিছু জুটে যায় ফুল-ফল, কেক-বিস্কুট? আমরা হিন্দুরা ঈশ্বরকে দেনেওয়ালা রাজা বলে মানিনা, ঈশ্বরকে পিতা বলতেও আমরা ভয় পাই, দূর-দূর মনে হয়, কেননা হিন্দু পিতারা ছেলেদের শাস্তি দেয়, প্রহার করে। ঈশ্বর আমাদের মা। তোমাদের যীশুর যেমন ম্যাডোনা। আমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাকি, মায়ের মত ভালোবাসি। সে আমাদের অহেতুক ভালোবাসা। মায়ের কাছে আমাদের কিছু চাইবার নেই। যে মা গরিব, কিছু দেবার-থোবার যার সাধ্য নেই সঙ্গতি নেই তাকেও তার ছেলে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। কিছু চায় না কিছু

পায় না তবুও ভালোবাসে। এ রকম ভালোবাসা বাসতে পারো ? ভাবতো পারো ? বলো ভালোবাসা যদি ফলাভিসন্ধিহীন না হয় তা হলে কি তাতে সুখ আছে ?

কাউকে এমন বলতে শুনিনি—যে শোনে সেই বলে। কঠিন কথা বললেও কাউকে ব্যথা দেননা, বিমুখ-বিরুদ্ধ করে তোলেন না, মুহূর্তে তাকে ঊর্ধ্বতর চেতনার স্তরে নিয়ে যান যেখানে জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বাইরে শুধু এক ভালোবাসার রাজ্য।

কে বলে তোমরা খৃস্টান ? জাতি হিসেবে তোমরা খৃস্টান নও। বলছেন স্বামীজি। যদি খৃস্টান হতে চাও, ফিরে যাও তাঁর কাছে, যীশুর কাছে, যাঁর কোথাও মাথা রাখবার ঠাঁই নেই। পাখিদের নীড় আছে, পশুদের গুহা আছে কিন্তু সেই ঈশ্বরপুত্রের আশ্রয় নেই। আর তোমরা কিনা প্রাসাদ বানিয়ে বিলাসের স্তূপ করে রেখেছ। এ সব, বলছ, প্রভু তোমাদের দিয়েছেন ? যা ক্ষণজীবী যা দু দিনে ধুলো হয়ে যাবে তা প্রভু দেন না। এ সব অর্থপিশাচের অট্টহাসি। সেই অর্থপিশাচকে প্রভুর চরণতলে স্থান দিও। সেই শক্তিকে ভক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করো। প্রাসাদকে প্রসাদের সঙ্গে। যদি তা না পারো, পিশাচকে ছেড়ে প্রভুর সঙ্গে চলে যাও। প্রাসাদে প্রভুহীন হয়ে থাকার চেয়ে প্রভুর সঙ্গে চীর পরে থাকাও ভালো।

মূলত, সব ধর্মের সারকথা এক। তার বদল নেই। কী সুন্দর বলছেন স্বামীজি। একটা বনচর অসভ্য লোক কতগুলি মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছিল। তার চাবুকের চামড়া ছিঁড়ে তা দিয়ে মুক্তোগুলি গেঁথে নিয়ে গলায় পরল। পরে যখন সে একটু সভ্য হল তখন চাবুকের চামড়া ফেলে দিয়ে একগাছি দড়ি কুড়িয়ে নিল। দড়িতেই গাঁথল মুক্তোগুলো। গলায় দোলালো। পরে আরও যখন সভ্য হল তখন দড়িগাছের বদলে সিল্কের সুতো নিল। পরে যখন সুসভ্য হয়ে উঠল তখন বললে সিল্কের সুতোর বদলে সোনা চাই। সোনার পাতেই বসাব মুক্তোগুলো। সোনার ভিত্তি ছাড়া মুক্তোর সৌধ তৈরি হয় কি করে ? দেখলে তো মুক্তোগুলোর বাহন কতবার বদলাল কিন্তু মুক্তোগুলো একই থাকল।

তার শাশ্বত মূল্য। তার অদলবদল নেই। তেমনি সমস্ত ধর্মের কথাই শাশ্বত। তার খোলস শুধু বদলায় কিন্তু তার রক্তমাংস অটুট থাকে।

নিউইয়র্ক ফ্রেনলজিক্যাল জার্নালে স্বামীজির বর্ণনা বেরিয়েছে। কবে ও কে তাঁর মাথা নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছে তা কে জানে।

ওজনে একশো সত্তর পাউণ্ড আর দৈর্ঘ্যে পাঁচফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত মাথার পরিধি পৌনে বাইশ ইঞ্চি। অর্থাৎ শরীরে আর মাথায় তাঁর সমীচীন অনুপাত। মনোবৃত্তি এত কোমল যে দাম্পত্যভাবের প্রশ্রয় লেশ নাই। আজ পর্যন্ত কোনো নারীকে প্রণয়ীর চোখে দেখেননি। তিনি যুদ্ধের বিরোধী ও বিশুদ্ধ অহিংসার প্রচারক। সে ক্ষেত্রে আশা করেছিলাম কানের কাছে তাঁর মাথাটা কিছু সংকীর্ণ হবে। লক্ষ্য করে দেখলাম ঠিক তাই। কিছু উপরের জায়গাটা অর্থোপার্জন ও সঞ্চয়ের স্থান। সেখানেও আশা করেছিলাম সংকীর্ণতা দেখব। ঠিক তাই দেখলাম। তিনি বিষয়-সম্পত্তির ধার দিয়েও হাঁটেন না। তাঁর সঞ্চিত ধন বলে কিছু নেই। টাকা পয়সার ঝামেলা থেকে দূরে থাকেন। আমেরিকানদের কাছে এ খুব অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাঁর মুখে যে শান্তি ও সন্তোষ দেখলাম তা আমাদের ক্রোরপতি রাসেল সেজ বা হেটি গ্রিনের মুখে নেই। টাকা দিয়ে কি ঐ আশ্চর্য শান্তি কেনা যায়? আরো দেখলাম তাঁর দৃঢ়তা ও বিবেকবুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। প[রো]পচিকীর্ষাও পরিস্ফুট। ললাটপ্রান্তের বিস্তৃতি তাঁর সঙ্গীতানুরাগ সূচিত করছে। বিশালোজ্জ্বল চক্ষু থেকে বোঝা যায় তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর বাগ্মিতা। কপালের উপর দিকে লেখা রয়েছে তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা, লোক চেনবার সহজ শক্তি আর মধুর সৌহার্দ্য। সর্বসাকুল্যে এই বোঝা যাচ্ছে তাঁর মাথা দেখে, যে, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দয়া, সহানুভূতি, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আর জয়ী হবার প্রতিজ্ঞা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট কিন্তু এমন নিখুঁত ইংরিজি বলেন যে শুনলে মনে হয় ইংলণ্ডেই তাঁর বসবাস। তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে বাধ্য।

'মনে করে দেখ দেশ থেকে পনেরো হাজার মাইল দূরে একলা

আছি।' স্বামীজি চিঠি লিখছেন : 'বিরুদ্ধবাদী খৃস্টানদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করে যেতে হচ্ছে। তারা কতগুলো আধা-সত্য কপচাচ্ছে। কিন্তু জানবে আমার স্বপক্ষবাদী খৃস্টানই আমেরিকায় বেশি।

একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ বার কর একখানি সাময়িক পত্র, তুমি তার সম্পাদক হও। সমস্ত জিনিসটার ভার নেব সর্দার হিসেবে নয়, সেবক হিসেবে। এতটুকু কর্তাত্তির ভাব রাখবে না। ওরকম ভাব রাখলেই ঈর্ষা আর ঈর্ষাতেই সমস্ত মাটি।

আমার হাতে এখন ন হাজার টাকা আছে। তার কতক তোমাকে পাঠাব ভারতে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে। তুমি তো জানো টাকা রাখা, এমন কি টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে কঠিন। টাকা মনকে ভীষণ নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের সঙ্গে-সঙ্গে টাকাকড়ির ব্যবস্থা করবার জন্যে তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছেন তাঁরাই আমার টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করছেন। টাকাকড়ির এই ভয়ানক হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে আমি বাঁচি।

আরো কথা। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও। "প্রবুদ্ধ ভারত" নামটা মন্দ নয়। ঐ নামে হিন্দুদের মনে আঘাত তো লাগবেই না, বৌদ্ধরাও আকৃষ্ট হবে। "প্রবুদ্ধ ভারত" বললেই বুদ্ধের সঙ্গে ভারত আছে বোঝা যাবে, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিলন হয়ে আছে।

আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি। এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশা-বিশাল-নেত্রে চেয়ে আছে। নির্বোধ মিশনরিরা সত্য, প্রেম ও অকাপট্যের শক্তিকে বাধা দিতে পারবেনা—কেউই পারবেনা। তোমার কি মন-মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পেরেছ? তোমার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে তো? ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা?

সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে, চেয়ে আছে ভারতবর্ষের দিকে ভারতবর্ষে যে জ্ঞানালোক আছে তা ইন্দ্রজাল নয়, ভেলকি বা বুজরুকি নয়, তা উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের সার কথা। জগৎকে সেই শিক্ষার

ভাগী করবার জন্যেই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন তা দেবার সময় হয়েছে। বিশ্বাস কর তোমরা বড় কাজ করবার জন্যে জন্ম নিয়েছ। কুকুর ঘেউ ঘেউ করুক, ভয় পেয়ো না। আকাশ থেকে বাজ পড়লেও নির্ভয় থেকো। জেনে রাখো প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁর শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে আসুক। তৃণখণ্ডগুলিকে গুচ্ছীকৃত করে রজ্জু করতে পারলে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যাবে। বেদমন্ত্র স্মরণ করো। নিবৃত্ত হয়োনা, যতদিন না লক্ষ্যে পৌছুচ্ছ, এগিয়ে চলো। জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাত-প্রায়। ধর্মের বন্যা এসেছে, সকলে হাত লাগিয়ে ওর পথের যতটুকু যেখানে বাধা আছে সরিয়ে দাও। সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়। সর্বাপেক্ষা মহত্তর পুণ্য—উৎসাহ, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। সর্বোপরি ভালোবাসা। চিত্তনির্মাল্য।

প্রভুর আজ্ঞা—বিশ্বাস করো—ভারতের উন্নতি হবেই হবে। সাধারণ লোক সুখী হবে। দারিদ্র্যমোচন হবে। আর আনন্দিত হও তোমরা তাঁর কাজ করবার জন্যে নির্বাচিত যন্ত্র।'

৫৯

নিউইয়র্কে ক্লাস করে স্বামীজি যা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা থেকেই তাঁর "রাজযোগ।"

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা, মনোনিবেশ। মানুষের মনের শক্তির কোনো সীমা নেই। একাগ্রতাই সেই শক্তির জনয়িতা। আর সেই শক্তির সাহায্যেই জানা যাবে কী রহস্য।

তুমি আস্তিক হও নাস্তিক হও, ইহুদী কি বৌদ্ধ, হিন্দু খৃস্টান, কিছু এসে যায় না। তুমি মননশীল মানুষ, তাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষের আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। যে বিষয়েই হোক না, তার কারণ কী, সত্য কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে যাবার আগে তার ছুটি নেই।

রাজযোগই সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার সহায়।

সংক্ষেপে শরীর ও মনঃসংযমই রাজযোগ। নিয়ত সংযম প্রশান্ত প্রবাহের মত দেহে-মনে স্থির হয়ে থাকে। আর অভ্যাসেই সেই প্রশান্তবাহিতা।

মাঝে মাঝে যা বলছেন স্বামীজি, তাঁর ছাত্রী মিস ওয়ালডো লিখে নিচ্ছে। সূত্র ব্যাখ্যা করতে-করতে, মাঝপথে, হঠাৎ তন্ময় হয়ে পড়ছেন, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা। ওয়ালডো তাকিয়ে দেখছে, অনন্তের চিন্তায় স্থির হয়ে গিয়েছেন স্বামীজি। কতক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে আসছেন সেই ধ্যান-সমুদ্র থেকে, নতুন ব্যাখ্যার উজ্জ্বলতর রত্ন নিয়ে। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বসে থাকছে ওয়ালডো, কেননা, কখন উঠে এসেই অনর্গল বলতে সুরু করবেন তার ঠিক নেই।

এই ধ্যান যেন স্বামীজির সঙ্গী হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে উচ্চকল-হাস্যের কোলাহল হচ্ছে, সবাই অবাক হয়ে দেখছে, স্বামীজি স্থির, তাঁর দুচোখ নিষ্পলক, আর ক্রমে-ক্রমে মৃদু হতে মৃদুতর হতে-হতে তাঁর নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার কতক্ষণ পরেই ফিরে আসছেন তার বাহ্য চেতনায়, পরিবেশের সমত্বে। কখনো ঘরে ঢুকছেন কারু সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতেই ভুলে গেছেন। কেউ বা ঘরে ঢুকেছে দেখা করতে, দেখছে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন, উঠে শিষ্টাচারটুকুও করছেন না। থেকে থেকেই চলে যাচ্ছেন অন্তচিন্তায়, পরাচিন্তায়।

ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে কেউ হাসে কেউ গায় কেউ নাচে কেউ অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা কয়, কেউ শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যে যাই করুক, সবই সেই ঈশ্বরকে নিয়ে। সব কিছুরই উৎস ভক্তি, ঈশ্বরে অমৃতপ্রেম। যা পেলে মানুষ সিদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, মৃত্যুত্তীর্ণ হয়। যা পেলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, আর কিছুর জন্যে শোক করে না, কারু প্রতি দ্বেষ করে না, অন্য কোন বিষয়ে সুখ পায় না, আর যাবতীয় সংসারব্যাপারেই নিরুৎসাহ থাকে। আর যাতে মানুষ মত্ত হয় স্তব্ধ হয় আত্মারাম হয়।

এ সবই বলছেন ছাত্রদের।

দু জন ছাত্র যথারীতি দীক্ষা পর্যন্ত নিয়েছে। একজন ফরাসী মহিলা, নাম মেরী লুই আর একজন রুষ ইহুদী, নাম লিওঁ ল্যাণ্ডসবার্গ। দীক্ষান্তে একজনের নাম হল স্বামী অভয়ানন্দ, আরেকজনের স্বামী কৃপানন্দ।

লুই ছিল জড়বাদী আর ল্যাণ্ডসবার্গ ছিল খবরের কাগজের লোক।

কাকে কখন কী ভাবে ঈশ্বর ডেকে নেন ঈশ্বরই জানেন। শুধু জবাবদিহিই দিতে জানেন না। বুড়ির ইচ্ছায় বুড়ি খেলে।

কী করে বুঝব ভক্তিলাভ হয়েছে?

যখন দেখবে অন্য সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে চিত্ত ঈশ্বরে আসক্ত হয়েছে—আর তাঁর বিরোধী যাবতীয় বিষয়ে এসেছে ঔদাসীন্য, তখনই বুঝবে ভক্তিমান হয়েছ। ওঁ তস্মিন অনন্যতা তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা।

আরো সব ভক্ত হয়েছে স্বামীজির। নরওয়ের বিখ্যাত বেহালা-বাজিয়ের স্ত্রী মিসেস ওলি বুল আর বরেণ্য ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড। ডক্টর এলান ডে, ডক্টর স্ট্রিট, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট—আরো অনেকে।

এই মিসেস ওলি বুলকেই স্বামীজি লিখছেন লণ্ডন থেকে :

'গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক। তাঁর বয়েস সত্তর হলেও দেখতে যুবকের মত। মুখে একটিও রেখা নেই বার্ধক্যের। ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যা ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি যোগে বিশ্বাসী। তবে বুজরুকদের একদম দেখতে পারেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর ভক্তি অগাধ। 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' কাগজে রামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছেন। আমাকে জিগগেস করলেন, 'তাঁকে জগতের সামনে প্রচারিত করবার জন্যে আপনি কী করছেন?'

অনেক বছর ধরে, বললেন, রামকৃষ্ণ তাঁকে মুগ্ধ করে আছেন। বলুন, এ কি একটা সুখবর নয়?'

'স্মৃতি-পুরাণ সামান্যবুদ্ধি মানুষের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ', লিখছেন স্বামীজি : 'তার যেটুকু উদার ও সহৃদয় সেইটুকুই গ্রাহ্য, বাকি সব ত্যাজ্য। গীতা ও উপনিষদ যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর যথার্থই অবতার। আকাশের মত অনন্ত এদের হৃদয়। কিন্তু সকলের উপর রামকৃষ্ণ। রামানুজ শঙ্কর সঙ্কীর্ণহৃদয় পণ্ডিতমাত্র। সে প্রীতি নেই, পরের দুঃখে কাঁদা নেই—শুধু পণ্ডিতাই—আর শুধু নিজের মুক্তি। তা কি হয় মশাই ? কখনো হয়েছে, না, হবে ? 'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হতে পারে ?'

নিউইয়র্কের উঁচুতলার বড়লোক ফ্রান্সিস লেগেট ও তার স্ত্রীও স্বামীজির অনুরক্ত হলেন। তা ছাড়া শিষ্যত্ব নিল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিকোল তেসলা। ব্যবসায়ী টমাস পামার আর তার স্ত্রী।

খবর রাষ্ট্র হল, "সাইক্লোনিক হিন্দু"—তুফানতোলা হিন্দু—স্বামী বিবেকানন্দ এসেছে আর অতিথি হয়েছে পামারের। আর তার সংস্পর্শে এসে পামারও হিন্দু হয়ে গিয়েছে—চলেছে ভারতবর্ষে। 'কিন্তু দুই সর্তে' পামার খুব রসিক, বলছে হাসতে-হাসতে, 'আমার ঘোড়া তোমাদের জগন্নাথের রথ টানবে আর আমার গুরু তোমাদের গো-দেবতাদের দলে গিয়ে ভিড়বে।' এক পাল ঘোড়া আর গরুর মালিক পামার।

ডেট্রয়টে আবার স্বামীজি এসেছেন, ক্লাস খুলেছেন পড়াবেন বলে। কিন্তু এত ছাত্র-ছাত্রী, ধরছে না ক্লাসে। আর, যখন তাঁর বলবার বিষয় 'ভারতীয় নারী'। 'পশ্চিমে নারী কী ? পশ্চিমে নারী স্ত্রী। আর ভারতবর্ষে ? ভারতবর্ষে নারী মা। যে সন্ন্যাসী তাকেও তার মায়ের সামনে এসে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হয়। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। তোমরা জাতিভেদের কথা তুলছ ? হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রণাম করবে না, কিন্তু সেই শূদ্র সন্ন্যাসী হোক, তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পায়ে পড়বে। দ্বিধা করবে না।'

মেরী ফ্রাঙ্ক, ছাত্রী, লিখছে : 'তাঁর বিশ্বস্ত স্টেনোগ্রাফার গুডউইনকে নিয়ে এসেছেন স্বামীজি, উঠেছেন হোটেলে। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ক্লাস

নিচ্ছেন। কিন্তু এত ভিড় হচ্ছে যে সিঁড়িতে-বারান্দায়ও জায়গা না পেয়ে লোক ফিরে যাচ্ছে। আর তখন তিনি বলছেন ভক্তির কথা, ঈশ্বরপ্রেম যেন এক তপ্ত ক্ষুধা এক তীব্র পিপাসা তাঁর কাছে—এক অবিচ্ছিন্ন আর্তনাদ। মাকে দেখবার জন্যে মাকে পাবার জন্যে এক দিব্য আহুপ্রতির মত তিনি জ্বলছেন। তখন তাঁকে দেখতে কী সুন্দর, কী সুন্দর!'

মা নামের মত মধুর আর কিছু নেই। ক্লাসে বলছেন স্বামীজি। ভারতে মাতাই স্ত্রী চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাই হিন্দুর দক্ষিণাচার। বামাচারীরা রুদ্রমূর্তির উপাসনা করে সাংসারিক উন্নতি খুঁজুক,—সাংসারিকতাই ধ্বংসের বীজ, কিন্তু আমরা দক্ষিণাচারীরা খুঁজি শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণ। জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, মা মা বলে ডেকে তাঁকে জাগাতে পারলেই আমরা ঈশ্বরশক্তিমান।

ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। কিন্তু যতক্ষণ ভয় ততক্ষণ ঈশ্বর নেই। মা-ই এ ভয় মোচন করতে পারেন। ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোনো ভাবনা থাকে তারই জন্যে হিন্দুরা কেউ-কেউ ঈশ্বরকে নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে। একমাত্র মা বলতে পারলেই ঈশ্বরের কাছে কিছু আর চাইতে হয় না। উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ। শুধু মূর্খই গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্যে কুয়ো খোঁড়ে। মায়ের কোলে যে বসতে পেরেছে তার আর অকূল কোথায়? অকুলান কোথায়?'

সেন্ট লরেন্স নদীর উপরে বৃহত্তম দ্বীপ, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক, সহস্র দ্বীপোদ্যান। তাতে স্বামীজির ছাত্রী মিস ডাচার-এর ছোট একখানি বাড়ি আছে। সে স্বামীজিকে বললে, আপনি সেখানে গিয়ে ক্লাস করুন। যত ছাত্র ধরে আর আপনি থাকুন সেই নির্জনে—বিশ্রান্তিতে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন স্বামীজি। হা ঈশ্বর, কত আর তোমার প্রচার করব, আর কত নামকোলাহল! আর কত আমায় বিদেশে ঘুরিয়ে মারবে? এ কী কর্মভার তুমি আমার উপরে চাপিয়ে দিয়েছ, এবার হালকা করে দাও। ফিরিয়ে দাও আমার সেই চীরবাস, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই গাছের তলায় ঘুম আর সেই বিশুদ্ধ ভিক্ষান্ন!

কিন্তু এই ভাব আবার কেটে যায়। অনুভব করেন অন্তরে বসে ভগবান তাঁকে আদেশ করছেন। তখুনি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, তারই জন্যে, ঈশ্বরনির্ধারিত কর্মসমাপনের জন্যে, একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দরকার। প্রতিষ্ঠানের দোষ আছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠান ছাড়া কাজ করাও অসম্ভব। যদি কাজের প্রেরণা অন্তর থেকে আসে আর কাজ যদি সত্য হয় শুদ্ধ হয় তা হলে একদিন না একদিন সমাজ সংসার তার দিকে আকৃষ্ট হবেই, তা সে কর্মীর জীবিতকালেই হোক বা তার মৃত্যুর একশো বছর পরেই হোক।

কী ছিল স্বামীজির! গোটা আমেরিকাকে এক নতুন ভাব দেওয়া আর সেই ভাবে বোধিত করে তোলা চারটিখানি মুখের কথা নয়। তাঁর মধ্যে ছিল ঐশী শক্তি এ কে অস্বীকার করবে? অনম্য প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ছিল অদম্য উৎসাহ। নিষ্ঠা আর দার্ঢ্য, দুঃখে সুখে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। সব চেয়ে বড় কথা, ঈশ্বরোপলব্ধি। আর সেই উপলব্ধিই সমস্ত আকর্ষণের রহস্য।

মৃত্যুর সময়েও সোঽহং বলে মরো। লোক ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা পাচ্ছে সে দুর্বল সে পাপী। পৃথিবীও তাই দিন দিন দুর্বল হচ্ছে নেমে যাচ্ছে কলুষে। শেখাও, সকলেই আমরা অমৃতের সন্তান, সেই সৎ চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দাও। কেন কাঁদছ? তোমারও জন্মমৃত্যু নেই আমারও নেই। রোগশোক শুধু দু দণ্ডের মেঘের খেলা। তুমি অনন্ত আকাশস্বরূপ। নানা রঙের মেঘ তার উপরে আসছে, এক মুহূর্ত খেলা করে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার নীলিমার ক্ষয় নেই। আমরা নিজেরাই অসৎ, তাই জগতে শুধু পাপ-তাপ দেখি। পথের ধারে একটা প্রস্তরপিণ্ড রয়েছে। চোর ভাবছে ও বুঝি পাহারা-ওয়ালা। নায়ক ভাবছে ঐ বুঝি নায়িকা। শিশু ভাবছে ও ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। পাপের জন্যে কেঁদো না। তোমাকে যে সর্বত্র পাপ দেখতে হচ্ছে তার জন্যে কাঁদো।

কেউ কেউ আবার স্বামীজিকে পরামর্শ দিচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য বক্তৃতার রীতিটা প্রচলিত স্কুল-কলেজে গিয়ে শিখে নিন, তা হলে আরো বেশি

কাজ হবে, আপনার বক্তৃতা পর্যাপ্ত ফলপ্রসূ হবে। আবার কেউ-কেউ বললে, দামী জায়গায় বিলাসী পরিবেশে আপনার থাকা উচিত, তা হলেই সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের কাছে আপনি পৌঁছুতে পারবেন।

'তার মানে?' খেপে উঠলেন স্বামীজি: 'আমি ওসব রীতিনীতির বন্ধনের মধ্যে যাব? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত বন্ধনদৈন্য সঙ্কোচকার্পণ্য থেকে আমি মুক্ত। পার্থিব সঞ্চয় যে কী পরিমাণ অসার তা আমার জানা আছে। আমি আমার বাক্যে পালিশ লাগাতে প্রস্তুত নই। বাক্য যে ভাবে আসে সে ভাবেই বলব, লোকে নিক বা না নিক, সে ভাবেই তাদের শুনতে হবে। আমি কারু হুকুমবরদার নই। আমার জবাবদিহি শুধু ঈশ্বরের কাছে, যিনি আমার হৃদয়ে আমার মস্তিষ্কে আমার কণ্ঠে সমাসীন। তোমরা যাকে সাফল্য বলো তাতে আমার স্পৃহা নেই। নাই বা হল আমার সেই ফরমাস-করা সাফল্য। তোমাদের ফরমায়েসী জীবনের সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে বিদেশে আসিনি। লোকে কী বলে না বলে আমার বয়ে গেল।'

'নরেন তুই কী বলিস?' একবার জিগগেস করেছিলেন ঠাকুর। 'যারা ঈশ্বর-ঈশ্বর করে সংসারী লোকেরা তার নিন্দে করে, কত কী বলে! কিন্তু দ্যাখ হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায়না। তোকে যদি নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

'মনে করব, কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।' নরেন পিঠ-পিঠ জবাব দিয়েছিল।

'ওরা চায় আমি ঠিক-ঠিক লোকের সঙ্গে পরিচিত হই।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'ঠিক-ঠিক লোক কী বুঝতে পাচ্ছ তো? সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকই নাকি ঠিক-ঠিক লোক। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। যারা আমার কাছে আসছে, যাদের ঈশ্বর পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমার কাছে, তারাই আমার কাছে যথার্থ লোক। তারাই আমার যথার্থ সহায়ক। আর সব যারা অনির্বাচিত তাদের থেকে আমাকে ত্রাণ করুন ঈশ্বর।'

তারপর স্বামীজি মহাদেব শিবকে আহ্বান করলেন নিজের মধ্যে।

'হে প্রভু, শিশুকাল থেকেই আমি তোমার শরণাগত। তুমি সব সময়েই আমার সঙ্গে আছ, অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে প্রান্তরে—শক্রনিলয়ে। তুমিই আমার সূর্যে দীপ্তি, চন্দ্রে তনু, শৈলে স্থৈর্য, বাতাসে বল, অগ্নিতে দাহ, সলিলে শৈত্য, অম্বরে শব্দ, তুমিই আমার সর্ববেদের ওঙ্কার, আমার মরণশোকজরা-অটবীর দাবানল, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।'

নিজেই শিবস্তোত্র রচনা করলেন স্বামীজি।

'সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থেম বা স্থিতি, ভঙ্গ বা নাশ যাঁর বিভূতি, যিনি সুবিমল গগনাভ, যিনি অনীশ, যার কোনো নিয়ন্তা নেই, সেই শিবশম্ভুর সঙ্গে আমার উজ্জ্বল ভাববন্ধ, প্রেমবন্ধ হোক। যিনি সমস্ত নিখিলমোহ বিনাশ করেছেন, যাঁতে ঈশ্বরত্ব রূঢ়, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত, যিনি হলাহল পান করে সমস্ত জীবজগতের কৃতজ্ঞতার পাত্র, যাঁর পরিরম্ভ অর্থাৎ আলিঙ্গন অশিথিল, তিনিই আমার প্রাণবন্ধু মহাদেব। আমার মন চঞ্চল বিকল, পূর্ব-পূর্ব সংস্কারের প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত, আমার মধ্যে এখনো যুষ্মদ-অস্মদ, অর্থাৎ তুমি আমির দ্বন্দ্ব চলছে, সেই মন আমি তোমাতে স্থাপন করে শান্ত হতে চাই। বিকারবায়ু স্তব্ধ হলে যেমন অন্তর-বাহির থাকেনা সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি প্রণাম করি। যিনি গলিততিমিরমাল, অর্থাৎ যিনি সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেছেন, যিনি শুভ্রতেজঃপ্রকাশ ধবলকমলশোভ, জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাস যিনি সংযমীর হৃদয়প্রাপ্য যিনি অখণ্ড নিরংশ অর্থাৎ যাঁর খণ্ড নেই অংশ নেই, সেই মানসরাজহংস শিবকে প্রণাম করি। যিনি দুরিতদলনদক্ষ অর্থাৎ যিনি পাপনাশনে সমর্থ, যিনি কলিতকলিকলঙ্ক, যিনি কলিকালের দোষ হরণ করেছেন, যিনি পরকল্যাণে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, প্রণতজনের প্রীতির জন্যে যাঁর নয়ন নতনিযুক্ত, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবই আমার নমস্য।'

আরো লিখছেন : 'আমার ভয় কী? প্রভু রামকৃষ্ণের কৃপায় আমি মানুষের মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে বুঝতে পারি কে কেমনতরো লোক। ঠিক না বেঠিক।'

'দেখলাম অখণ্ড লোকে নরেন্দ্র সমাধিস্থ।' ঠাকুর বলছেন। 'ধ্যানস্থ

দেখে বললুম, নরেন, একটু চোখ চা। নরেন একটু চোখ চাইল। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

এক ভক্ত স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছে বলছে।

ঠাকুর বলছেন, 'আহা, আহা।'

ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে ও স্বপনে।'

ঠাকুরের চোখে জল, কণ্ঠস্বর গদগদ। বলছেন, 'স্বপন কি কম? আমার নরেন কিন্তু জেগেই ঈশ্বররূপ দেখছে।'

এক পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছে। ঠাকুর বললেন, 'ওকে আমি টানিনা।'

'কেন?'

'ওর কেবল জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ। আমার নরেন শুধু জ্ঞানী নয়, ও আমার ভক্ত।'

স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন :

'ভগবান ছাড়া আর যে কোনো জিনিসই চাও, ভক্তি নয়। একমাত্র ভগবানকে চাওয়াই ভক্তি। আমি এ বলছি না যে, যা প্রার্থনা করা যায় তা পাওয়া যায় না। যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। কিন্তু সে অতি হীনবুদ্ধির, ক্ষুদ্রাত্মা ভিক্ষুকের ধর্ম। এ দেহ একদিন নষ্ট হবেই, তবে আর বার বার এর স্বাস্থ্যের জন্যে, ঐশ্বর্যের জন্যে প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে আছে কী? যে মহৎ ধনী সে শুধু তার সঞ্চিত বিত্তের অত্যল্প অংশমাত্র ভোগ করতে পারে। দিনে চার-পাঁচবার করে ভোজ খেতে পারে না, কখানা কাপড় সে পরবে একসঙ্গে? যা তার ফুসফুসে ধরে, নিশ্বাসে তার বেশি সে বাতাস নেবে কোনখানে? শোবার জন্যে যেটুকু তার পরিমিত জায়গা সেটুকুতেই তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে। সব জিনিসই কি সবাই পায়? যদি কিছু আসে আসুক, যদি কিছু চলে যায় যাক। এলেও ভালো, না এলেও ভালো। কিন্তু গায়ে পড়ে চাইতে যাব কেন? কেন ভিক্ষুকের চীর পরব? রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কি ছেঁড়া নোংরা কাপড়ে যাওয়া যাবে?

ওভাবে গেলে গেট থেকেই দারোয়ান তাড়িয়ে দেবে আমাদের। রাজার রাজা ভগবানের রাজ্যে দোকানদারের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনারা বাইবেলে পড়েছেন যে যীশু ভগবানের মন্দির থেকে ক্রেতা-বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সকামীদের ভাব কী? ভাব এই, তোমাকে এতক্ষণ ডাকলাম, তুমি এবার আমাকে একটা পোশাক দাও। ভগবান, আমার বড্ড মাথা ধরেছে, আমার মাথাধরাটা সারিয়ে দাও, আমি কাল আরো দু ঘন্টা তোমাকে বেশি ডাকব।'

ঠাকুর বলছেন, 'একটুও কামনা থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে যাবে না ছুঁচের মধ্যে।'

পরে থেমে আবার বলছেন, 'একজন বাবু এসেছিলেন—ট্যারা। বলে আপনি পরমহংস, একটু স্বস্ত্যয়ন করে দিতে হবে। দেখ, কী পাটোয়ারী! কী হীনবুদ্ধি! পরমহংস! স্বস্ত্যয়ন! স্বস্ত্যয়ন করে ভালো করা—এ সিদ্ধাই, এ অহঙ্কার। অহঙ্কারে ঈশ্বর লাভ হয়না। অহঙ্কার কেমন জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমেনা, গড়িয়ে যায়। নিচু জমিতে জল জমে, তবে অঙ্কুর হয়, তারপর গাছ হয়, তারপর ফল হয়।

শ্যামাপদ ভটচাজ মস্ত লোক। তার বুকে পা রেখেছেন ঠাকুর, কিন্তু তার বড় আপসোস নরেনের যেমন ভাবাবেশ হয়েছিল তার তেমন হল না। বলছে, 'নরেনের বুকে পা দিতে যেমন ভাবাবেশ হয়েছিল, কই আমার তো তা হল না।'

ঠাকুর বললেন, 'মন ছড়ানো থাকলে মন কুড়োনো দায়। তোমার মন অনেক দিকে ছড়ানো। নরেনের মন ছড়ানো নয়, একত্র করে এক জায়গায় আঁট করা। আমার নরেনের যেমন বিদ্যা তেমন বুদ্ধি।'

যেখান থেকে যা পাচ্ছেন উপহার, স্বামীজি তার আমেরিকার ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী বা মহীশূরের মহারানা হয়তো কোনো দামী জিনিস পাঠিয়েছেন, কাশ্মীরী শাল কি কার্পেট, নয়তো রেশম বা মসলিন, বাসন বা বাক্স, স্বামীজি তাই ফের উপহার দিচ্ছেন শিষ্যদের। ভারতবর্ষের বন্ধুদের লিখে পাঠাচ্ছেন, এ সব কী দিচ্ছেন আমাকে। আমাকে রুদ্রাক্ষ আর কুশাসন পাঠান। তাই আমার

দীক্ষিত ভক্তদের বিতরণ করি। ওরা রুদ্রাক্ষশোভিত হয়ে কুশাসনে বসে ধ্যান করুক।

দেশেও অনেক জায়গায় টাকা পাঠাচ্ছেন স্বামীজি, অনেক প্রতিষ্ঠানে। এমন কি বরানগরে হিন্দু বিধবা বিদ্যালয়ে পর্যন্ত। 'হিন্দু নারীর আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার থেকে যত টাকা উঠেছে সব গিয়েছে সেই বিদ্যালয়ে। সেই বিদ্যালয় যে ব্রাহ্মরা চালাচ্ছেন, যাঁরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন, সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়। হিন্দু নারীর যদি কিছু উপকার হয় তা হলেই যথেষ্ট।

ঠাকুর বলছেন, 'সন্ন্যাসী যদি কাউকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছে। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাইরেও ত্যাগ করে। সে গুড়ের পাটালি নিজের কাছে রাখেও না, খায়ও না। কিন্তু সংসারী লোকের টাকার দরকার, তাই তাদের সঞ্চয় করাও দরকার। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ—পাখি আর সন্ন্যাসী।'

খাবার টেবিলে এক ভদ্রলোক স্বামীজিকে বিব্রত করার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বামীজি, কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে কি কি বই পড়ব একটু বলতে পারেন?'

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! আর বিষয় নেই, কেমিস্ট্রি! আর এ বিষয়ে পণ্ডিত ঠাউরেছে স্বামীজিকে।

তা হলে কী হবে! স্বামীজি গড়গড় করে এক গাদা ইংরিজি কেমেস্ট্রির বইয়ের নাম করে যেতে লাগলেন। কী টুকে নিচ্ছেন না নামগুলো? আরো চান তো আরো বলছি।

সকলে বিমূঢ়।

আরেকজন বললে, 'আমাকে কিছু য়্যাস্ট্রোনমির বইয়ের নাম দিতে পারেন? অবিশ্যি ইংরিজি ভাষায় লেখা?'

'পারি।' বললেন স্বামীজি, 'কাগজ কলম নিয়ে বসুন। মনে রাখতে পারবেন না। ওকে জিগগেস করুন না কেমেস্ট্রির বইয়ের যে লিস্ট দিলুম সব মনে আছে? কাগজে কলমে লিখে নিতেও

হাত ব্যথা হয়ে যাবে।' বলে অনর্গল স্রোতে নাম বলে যেতে লাগলেন।

সবাই হতবাক।

আরেকজন জিগগেস করল, 'স্বামীজি সংসারে দুঃখ কেন?'

'দুঃখ?' হাসলেন স্বামীজি: 'দুঃখ আছে আগে তাই প্রমাণ করুন, আমি পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।'

বাইশ বাজারে হরিদাসকে বেত মারা হচ্ছে, তবু আনন্দে সে হরিনাম করে যাচ্ছে। শ্রীবাসের বাড়ির উঠানে তার শিশু পুত্রের মৃতদেহ নাবানো, তারই পাশে শ্রীদাস কীর্তনানন্দে বিভোর। রাজরাণী মীরা ভোগবিলাস তৃণাদপি তুচ্ছ করে পায়ে হেঁটে চলেছে সুদূর বৃন্দাবনে আর আনন্দে গান গাইছে, 'হরিসে লাগি রহরে ভাই, বনত বনত বনি যাই।'

কোথায় দুঃখ?

৬০

'নিজের জন্যে নয়, দেশে কিছু কাজ করবার জন্যে টাকা তোলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।' লিখছেন স্বামীজি: 'ডেট্রয়টে এক বক্তৃতায় একঘণ্টায় সাড়ে সাত হাজার টাকা উপার্জ্জন করেছিলাম, কিন্তু সত্যি-সত্যি আমার হাতে এলো মোট ছশো টাকা। লেকচার বুরো যার আওতায় বক্তৃতা হচ্ছিল বাকি টাকা বেমালুম মেরে দিয়েছে। গড়ে বক্তৃতায় পঁচাত্তর ডলারের মত আয় হচ্ছে, তা থেকে থাকা-খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে কিছুই থাকে না। এ বছর আমেরিকার দুঃসময়, হাজার-হাজার গরিব লোক বেকার হয়ে বসে আছে। তাছাড়া খ্রীস্টান মিশনারি আর ব্রাহ্মসমাজ সমানে আমার বিরুদ্ধতা করে চলেছে। এক বছর চলে গেল, অথচ আমার দেশ আমেরিকানদের কাছে এ কথাটা পৌঁছে দিতে পারল না যে আমি খাঁটি সন্ন্যাসী, আমিই প্রতিনিধি হিন্দুধর্মের—আর আমি ভণ্ড নই, প্রতারক নই।'

কে এক প্রাচ্য পৌত্তলিক পশ্চিমে এসে ধর্মের কথা কইবে আর তাকেই প্রতীচ্যবাসীরা শুনবে, মানবে, অনুসরণ করবে—এ পাদ্রীর দল

সহ্য করবে কী করে? আগে-আগে হিন্দুধর্মের, ভারতবর্ষের নিন্দে করেছে, এখন ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজির নিন্দে করতে লাগল। এবং তাদের চাঁই হল রবার্ট হিউম। যেহেতু হিউম ভারতবর্ষে জন্মেছে সে সব জানে স্বামীজির হাঁড়ির কথা। স্বামীজি লোকটা নিতান্ত বাজে, দেশের লোক কেউ ওকে পোঁছে না, ও কপট ও অসৎ—দেশে-বিদেশে এমনি বলে বেড়াতে লাগল হিউম।

আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি : 'কেউ বলুক আমি সন্ন্যাসীর দুই প্রধান ব্রত পবিত্রতা ও অকিঞ্চনতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। কেউ বলুক আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিনি। মিশনারি হিউমকে স্পষ্ট জিগগেস করবে আমার কী অসদাচরণ তিনি দেখেছেন? নিজে দেখেন নি তো, কার কাছ থেকে শুনেছেন তাদের নাম যেন লিখে পাঠান। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, প্রশ্নের প্রত্যক্ষ সমাধান করে নেবে। মিথ্যেকে হাওয়ায়ও ভেসে থাকতে দেবেনা।'

'জানি,' আরো লিখছেন : 'আমার দেশবাসীরা, হিন্দুরাও, আমাকে ছেড়ে কথা কইছে না। আমি কি হিন্দুদের ধার ধারি? না কি তাদের স্তুতি-নিন্দার তোয়াক্কা রাখি? আমি অসাধারণ, সাধ্য নেই তোমরা আমাকে বোঝ। আমার পিছনে আমি এমন এক শক্তি দেখছি যা মানুষ, দেবতা ও শয়তানের একত্রীকৃত শক্তির চেয়ে বড়। শোনো, কারো সাহায্যের আমি প্রত্যাশী নই। আমিই বরং সারাজীবন সাহায্য করেছি অপরকে। আমাকে সাহায্য করেছে এমন লোক তো কই দেখতে পাইনি এখনো।'

'আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারো কথায় আমি চলব না। আমি জানি আমার জীবনের ব্রত কী। আমি কোনো জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নই। আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের। তোমরা কি মনে করো তোমরা যাদের হিন্দু বলে থাকো, জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্যে আমি এসেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক

আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাইনি। কোনো রকম রাজনীতিতেই আমি বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর আর সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব অসার।'

অনাগরিক ধর্মপাল কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি ও সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শিকাগোর ধর্মসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি।

তাঁকেও লিখছেন স্বামীজি, পাদ্রী হিউমের সম্পর্কে।

'উনি গোপনে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন, চেষ্টা করেছেন যাতে তারা আমার উপর বিরূপ হয়, আমাকে কোনো সাহায্য না করে। কিন্তু এমনি মজা, সবাই পাদ্রীসাহেবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখ পাদ্রীয়ানির নমুনা। কাপট্যের আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়। ধর্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে এখানকার এপিস্কোপ্যাল ও প্রেসবিটেরিয়ান দুরকম চার্চের আচার্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, অথচ তাঁদের নিজের ধর্মে অকপট বিশ্বাস। যে সত্যিকার ধার্মিক সে সর্বত্রই উদার। তার ভিতরে যে প্রেম আছে তাইতেই তাকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। যাদের কাছে ধর্ম শুধু একটা ব্যবসা মাত্র তারাই ধর্মের মধ্যে সংসারের কলহ কলুষ নিয়ে আসে, ব্যবসার খাতিরেই তারা সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে।'

ভারতবর্ষ কী করল স্বামীজির জন্যে? আর ভারতবর্ষে হিন্দুরা?

এক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখছেন স্বামীজি: 'তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি দেশের সবাই আমার প্রশংসা করছে, সে তুমি জানছ আর আমি জানছি—আমেরিকা জানবে কী করে? ভারতীয় কোনো খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে জমকালো কিছু বেরিয়েছে তা দেখিনি। ওদিকে ভারতে খৃস্টানেরা যা কিছু বলছে বিরুদ্ধ কথা, মিশনারিরা সযত্নে ছাপাচ্ছে আর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমার বন্ধুদের তাই পড়াচ্ছে আর তাদের বলছে আমাকে ত্যাগ করতে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়ে আর যায় না। দেশের একটা প্রশংসার কথাও আমেরিকায় এসে পৌঁছুচ্ছে না। সুতরাং এদেশের অনেকেই মনে করছে আমি একটা জুয়াচোর।

আমি কোনো নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি। তাই আমি যে জুয়াচোর

নই, মিশনারি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে কী করে প্রমাণ করব। ভেবেছিলাম গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না। কিন্তু কই এক বছরের মধ্যে ভারত থেকে কেউ আমার জন্যে একটা টু শব্দ পর্যন্ত করলে না। আমিই আহম্মক, কোনো নিদর্শনপত্র ছাড়াই চলে এসেছিলাম। আশা করেছিলাম, অনেক কিছু আসবে। কিন্তু আশা শূন্যাকৃতি। যাই হোক, আমাকে একাই কাজ করতে হবে। আর কর্ম করেই ক্ষয় করতে হবে প্রারব্ধ। আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভালো আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনের দেশের চেয়ে এখানে অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারছি।

তাই এবার বিদায়, অনেক দেখলাম হিন্দুদের। এখন প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যা আসুক, নেব নতমস্তকে। আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মাদ্রাজীরা আমার জন্যে যা করেছে তা আমার পাওনার চেয়ে বেশি—প্রভু তাদের নিরন্তর আশীর্বাদ করবেন। কোনো ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই শিগগির আমেরিকা ছেড়ে দেশে যাবার কথা কল্পনাও করছি না। কী করতে যাব? এখানে খেতে-পরতে পাচ্ছি, অনেকেই সহৃদয় ব্যবহার করছেন, আর এটুকু পাচ্ছি দুটো ভালো কথার বিনিময়ে। এমন উদার উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অসভ্যযুগের কুসংস্কারে আবদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগ্যদের দেশে আর কে যায়! অতএব, আবার বলি, বিদায়।

শোনো, ভালো কথা, তুমি প্রতাপ মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বইখানার খানকয়েক কপি আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দিয়ো।'

জুনাগড়ের দেওয়ান, হরিদাস বিহারীদাসকে লিখছেন: 'আমার নিন্দুকের দল এখানে আমার যথেষ্ট ক্ষতি করছে যেহেতু আমার দেশের হিন্দুরা ঘুণাক্ষরেও জানাচ্ছেনা আমেরিকাকে যে আমি তাদের প্রতিনিধি। আর এদিকে প্রতাপ মজুমদার, বম্বের নাগারকার আর সোরাবজি নামে এক ভদ্রমহিলা অনবরত বলছে আমেরিকানদের, যে

আমি আমেরিকায় আসবার পর প্রথম গেরুয়া ধরেছি, আমি একজন জলজ্যান্ত প্রতারক।'

'এই ভদ্রলোককে, প্রতাপ মজুমদারকে, আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। বিদেশে প্রথম যখন তাঁকে দেখি, আনন্দে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম।' বলছেন স্বামীজি, 'কিন্তু যেদিন ধর্মমহাসভায় হাততালি পেলাম, ঘরে-বাইরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, সেই দিন থেকে মজুমদারের সুর বদলাল আর আমার ক্ষতি করবার চেষ্টায় মেতে উঠল।'

কলকাতার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রধানস্থল প্রতাপ মজুমদার "ইউনিটি য়্যাণ্ড দি মিনিস্টার"-এর সম্পাদক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি, আর একজন উদ্দীপ্ত বক্তা। শিকাগোর ধর্মমহাসভার বছর দশেক আগে এসেছিলেন একবার আমেরিকায়, বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর নাম কিনেছিলেন। বর্তমান ধর্মমহাসভাতেও তাঁর বক্তৃতা পেয়েছে বিপুল সম্বর্ধনা। তাঁর ভাষণ এত চমৎকার হয়েছিল যে প্রকাণ্ড জনতা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল আর একসুরে গেয়ে উঠেছিল স্তোত্র—'নিয়ারার মাই গড টু দি'—হে প্রভু, তোমার আরো কাছে, তোমার আরো কাছে। সুতরাং প্রতাপ মজুমদার আমেরিকার জানা লোক, তাঁর মতামত মানবার মত। তা ছাড়া 'ওরিয়েণ্টেল ক্রাইস্ট' নামে যে বই লিখছেন তাও তাঁকে দিয়েছে জয়মাল্য। এ হেন প্রতাপ মজুমদার স্বামীজির অপযশ গাইছেন।

কারণ কী? কারণ স্পষ্ট। ধর্মমহাসভার সমস্ত পাদপ্রদীপের আলো একা স্বামীজি নিয়ে নিয়েছেন। ধর্মমহাসভার পর ম্লান হয়ে গিয়েছেন প্রতাপ মজুমদার। তাঁর সব জেল্লাজমক খসে গিয়েছে। প্রকৃত হিন্দু বলতে কাকে বোঝায় আমেরিকা তার প্রতিভাস পেয়েছে স্বামীজিতে। আর, শুধু হিন্দু? প্রিন্স ওল্‌স্কনস্কির ভাষায়, প্রকৃত "মানুষের" প্রতিভাস।

শশী মহারাজকে লিখছেন স্বামীজি: 'এখানে এসে প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হল মজুমদারের সঙ্গে। প্রথম প্রথম মজুমদার আমার উপর খুব সদয় ছিলেন, কিন্তু ধর্মমহাসভার পর যখন শিকাগোতে দলে দলে লোক

আমার কাছে আসতে লাগল তখন তাঁর আর সহ্য হল না, বিদ্বেষের আগুনে পুড়তে লাগলেন। দেখেশুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। মিশনারিদের কাছে তিনি এই বলে প্রচার করতে লাগলেন যে আমি ঠক, আমি প্রবঞ্চক ; ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার মত আমি কেউ নই, আমি আমেরিকায় এসে সাধু সেজেছি। আমার বিরুদ্ধে অনেক আমেরিকান মন তিনি বিষিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পূর্ব প্রভাবের দরুন পেরেছেন বিষিয়ে দিতে। সভাপতি ব্যারোজ পর্যন্ত আমার উপরে বিমুখ হয়েছেন। ওঁদের প্রচার-পুস্তিকায় আমাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, ভাই, প্রভু যার সহায় তাকে মজুমদার কী করবে ?'

ধর্মমহাসভার পর দেশে ফিরে গিয়েও মজুমদার অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত হল না। বিবেকানন্দ শুধু ভণ্ডই নয়, সে চরিত্রহীন—এমনি ধরনের কুকথা। মিস্টার হেল-এর কাছে বেনামী চিঠি এল, স্বামীজিকে যেন তার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়, কেননা ভদ্রপরিবারের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার সে উপযুক্ত নয়। চিঠি পেয়ে করল কী মিস্টার হেল ? অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।

আমি কী—বলছেন স্বামীজি—তা আমার ললাটেই উদ্ভাসিত। তাকিয়ে দেখ আমার মুখের দিকে, আমার দুই চোখের দিকে—দেখি কতক্ষণ চোখে চোখ রেখে পারো তাকিয়ে থাকতে—তারপরে বলো আমি শঠ কিনা প্রতারক কিনা।

নমঃ শিবায়। তুমি নগ্ন, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ত্রিগুণবিরহিত, অজ্ঞানান্ধকারপরিশূন্য। উন্মত্তাবস্থায় থেকেও কলিকলুষহীন। তোমার মস্তক চন্দ্রকলায় উদ্ভাসিত, তুমি কামদেবকে ভস্ম করেছ, তোমার জটায় পতিতপাবনী গঙ্গা, নয়নে প্রলয়ঙ্করী বহ্নি, সদামঙ্গলকারী, তুমি ত্রিলোকের সারভূত, তোমাকে সর্বচিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেছি—আমার অন্য কর্মে কী প্রয়োজন ? আমার ভয় নেই, বন্ধন নেই, জুগুপ্সা নেই। আমি শক্তিশ্বর। আমি বীতশোক। সর্বকামনামুক্ত।

'আমার সম্বন্ধে কে কী বলছে তাতে আমি ঘাবড়াচ্ছি না, কিন্তু আমি শুধু একজনের কথা ভেবে বেদনা পাচ্ছি।' ইসাবেল ম্যাক-

কিগুলকে লিখছেন স্বামীজি: 'তিনি আমার বৃদ্ধ মা। সারাজীবন তিনি অশেষ কষ্ট সয়েছেন—তাঁর শুধু এক গৌরব ছিল তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় সমর্পণ করেছেন—এমন গৌরব কজনই বা করতে পারে। কিন্তু সেই মা যদি এখন শোনেন—কোলকাতায় এখন মজুমদার যা বলে বেড়াচ্ছে—যে, তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্র বিদেশে পশুবৎ জীবন যাপন করছে—তাহলে, ইসাবেল, আমার মা আর বাঁচবেন না।'

শুধু স্বামীজি নয়, স্বামীজির গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধেও অকথা বলতে পেছপা ছিলেন না মজুমদার। ধর্মমহাসভার পর এক সান্ধ্য-মজলিশে এমনি নিন্দে করছিলেন রামকৃষ্ণকে, শ্রোতাদের থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনি আপনার বইয়ে কী লিখেছেন?'

'বই? আমার বই? সে আবার কী!' ইতস্তত করতে লাগলেন মজুমদার।

'এই যে দেখুন। ছাপানো বই। আপনার লেখা। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে।'

গুরুভাইকে লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়েছেন স্বামীজি। উদার হাতে বিলিয়েছেন সর্বত্র।

এই যে সব লিখেছেন আপনি: 'এমনটি আর হয় না। যখন যেখানেই যান রামকৃষ্ণ, সেই এক আশ্চর্য পুরুষ, জ্যোতির সমুদ্র উথলিয়ে দেন। আজও আমার মন সেই সমুদ্রে ভাসছে। হিন্দুধর্মের সমস্ত গাম্ভীর্য আর মাধুর্য এক একটি সৎশুদ্ধ লোকের জীবনে সাক্ষীভূত হয়ে রয়েছে। সমস্ত জৈব আকাঙ্ক্ষাকে তিনি জয় করেছেন। আনন্দে পূর্ণ, পবিত্রতায় পূর্ণ, ধর্মের সারভূত বিগ্রহ, দেহ নেই যেন শুধু আত্মার প্রতিমূর্তি। তাঁর চিত্তের অকলঙ্ক শুভ্রতা, তাঁর গভীর আনন্দ, অপঠিত অপার জ্ঞান, শিশুসুলভ শান্তি, সকলের প্রতি ইয়ত্তাহীন স্নেহ আর ঈশ্বরে সর্বপ্লাবী তীব্র প্রেম—এই সবই সেই মহাপুরুষের বৈশিষ্ট। ধর্মীয় জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের অন্যরূপ ধারণা, কিন্তু যতদিন রামকৃষ্ণ বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর পদচ্ছায়ায় আমরা নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় নেব

আর শিখব পবিত্রতা, অপার্থিবতা, অতীন্দ্রিয়তা আর ঈশ্বর-নিমজ্জন।'

'কী, লেখেন নি আপনি ?'

ম্লান মূক মুখে তাকিয়ে রইলেন মজুমদার।

ডক্টর রাইটকে লিখছেন স্বামীজি: 'সন্ন্যাসীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে হয় না, বলবার তার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী আমাকে কী ভাবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে আমি প্রমাণে সন্তুষ্ট করব। মিশনারিরা শত্রুতা করছে এ তবু সহ্য হয়, কিন্তু মজুমদার, সমস্ত জীবন যে সৎ কাজ করতেই সচেষ্ট, সে আমাকে হিংসে করছে এ ভাবতেই মর্মাহত হচ্ছি; স্নানের পর হাতী যদি ফের ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় তার স্নান নিরর্থক হয়। আমার প্রভু ঠিকই বলেছেন, কাজলের ঘরে থাকলে যত সেয়ানাই হও না কেন, কালো দাগ লাগবেই লাগবে।

যে দিকে ঈশ্বরের পথ, পৃথিবীর পথ তার উল্টো দিকে। পার্থিব প্রতিষ্ঠা আর ঈশ্বর এক সঙ্গে করায়ত্ত এমন লোক আর ক জন।

আমি ধর্মপ্রচারক নই। আমার সত্যিকার স্থান হিমালয়। কিন্তু আমি সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। আর এ সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হয় তার পথ খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, পেয়েছিও সে পথ, কিন্তু হায়, আমার দেশবাসীরাই এ পথে কন্টক আরোপ করছে। কিন্তু তবু, আমার সেই দেশবাসীদেরই আমি ভালবাসি। আমাকে কেউ স্বপ্নবিলাসী বলতে পারে, কিন্তু আমার ঐকান্তিকতা অকপট। আমার চরিত্রের যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে সে আমার দেশপ্রীতি—গভীর দেশপ্রীতি।'

মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে কী বলছে ?

বলছে, আমি রুগ্ন, আমি বদ্ধ, আমি দুঃখী, আমি হস্তপদাদিমান জীব—এরকম ভাবনা করলেই মোহের উদ্রেক, মানুষ বাঁধা পড়ে। আমার দেহই নেই, দুঃখই নেই এ ভাবনা যার, তার কোথায় বন্ধন ? আমি মাংস নই অস্থি নই, আমি দেহ থেকে ভিন্ন, আমি আত্মা, এই নিশ্চয়বোধ যার হয়েছে সেই মুক্ত। হে রাঘব, অনাত্মবস্তুতে আত্মভাবনা

দ্বারা অজ্ঞান ব্যক্তি অবিদ্যার কল্পনা করে, কিন্তু যে জ্ঞানী যে প্রবুদ্ধ সে করে না।

বাসনার ক্ষয় হলে চিত্তবিকার দূরে যায়, উড়ে যায় সংসারমোহের মিহিকা। তখন শরতের আকাশের মত হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আর তাতে চিৎস্বরূপ, আদ্য, অনন্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিভাত হন। কিন্তু এ নয়, যেহেতু মোহ চলে গিয়েছে সংসারের কাজে ইস্তফা দি। যে মোহমুক্ত তাকেই বেশি করে লোকসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্যে কাজ করতে হবে। লোকশিক্ষার জন্যে।

হে রাম, বলছে বশিষ্ঠ, সংত্যক্তসর্বাশ হও, হও বীতরাগ বিবাসন। অন্তরের সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা বিসর্জন দিয়ে বাইরে সংসারের যাবতীয় কাজ করো। বাইরে কর্তা ভিতরে অকর্তা, বাইরে আবেগ অন্তরে অনাসক্তি—এই ভাবে উদ্দীপ্ত হও। অগৃহীতকলঙ্কাঙ্ক আকাশের মত নির্মল থাকো। পৃথিবীর ধোঁয়া মানুষের বাড়ির ছাদদেয়ালই কালো করতে পারে, সাধ্য কী সে আকাশকে স্পর্শ করে।

এ আমার বন্ধু এ আমার বন্ধু নয় এ হিসেব ক্ষুদ্রাত্মার। যে উদারচরিত তার সমস্ত বসুন্ধরাই কুটুম্ব।

সুতরাং কেশবচন্দ্র সেন বা শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন আমার বন্ধু তেমনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও আমার পরমাত্মীয়।

খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ চিঠি লিখেছে স্বামীজিকে :

'দেশে বা বিদেশে আপনার নিন্দে করছে যে অভাজনেরা তাদের আমি কী বলব? কিন্তু যে যাই বলুক, কেনা-বেচার সময়েই ঠিক বোঝা যায় কাচ কাচ, মণি মণি। বেগুনওয়ালা হীরের দাম ছ আনা দিতে চাইলে হীরের দাম কমেনা। এ সময়ে আমি, ক্ষুদ্রব্যক্তি, আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেব? যদিও, গুরুদেব, আমার প্রাণ সব সময়ে আপনার সঙ্গলাভের জন্য কাতর, তবুও আমি অনুরোধ করি আপনি আরো কিছুকাল ঐ দেশে থাকুন আর আমাদের দেশের দারিদ্র্যমোচনের ব্রতে ঐ দেশের বলিষ্ঠ সাহচর্য সংগ্রহ করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এই মহৎ ব্রত উদযাপন করতে পারে। আপনার মত কে আছে

আর ঈশ্বরমাতোয়ারা ? আর, ঈশ্বর ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কার কথায় মানুষে কান পাতে ?

জগমোহনকে মনে আছে ? সে এখন জয়পুরে। তাকে না জানিয়েই তার অশেষ দণ্ডবৎ প্রণাম আপনাকে পাঠাচ্ছি। এ কথা যখন সে জানতে পাবে তখন তার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকবেনা।

খেতড়ি পাহাড়ের এক তুর্দান্ত বাঘ কদিন ধরে খুব উৎপাত করছিল। কম-সে-কম পঞ্চাশটা মোষ সে খেয়েছে। আপনি শুনে আনন্দিত হবেন সেই তুর্দান্তকে আমরা ধরেছি। যদি বাঘ বাঁধা পড়ে থাকে নিন্দুকও বাঁধা পড়বে।'

ডক্টর রাইট, আমার দেশের সকলেই আমার নিন্দে করেনা।

বাইরে যদিও অনেক বিক্ষোভ আর বিপর্যয়, স্বামীজির অন্তরের গভীরে শন্তলান্ত শান্তি। এক দিব্য আনন্দের আভা। হেল-ভগ্নীরা, মেরি হেল আর হ্যারিয়েট হেল ছুটিতে গ্রামে গিয়েছে, তাদেরকে লিখছেন স্বামীজি। এই চিঠিতেই বোঝা যায় তাঁর মন কেমন ঈশ্বর-সৌরভে ভরপুর।

লিখছেন :

'প্রিয় বোনেরা,

আমাদের হিন্দি কবি তুলসীদাসের নাম শুনেছ ? তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন আমারও সেই কথা। তিনি বলেছেন, সাধু আর অসাধু তুজনকেই আমি প্রণাম করি, কিন্তু আমার তুর্ভাগ্য, তুজনেই আমার উৎপীড়ক। যে অসাধু সে আমার সংস্পর্শে আসামাত্রই আমার যন্ত্রণা সুরু হয় ; আর যে সাধু সে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। আমি বলি, তাই হোক। যারা সাধু, ভগবানের প্রিয়, তাদেরকে ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কোনো আনন্দ নেই, কোনো আসক্তি নেই। তাই তাদের থেকে বিচ্ছেদ আমার মরণসমান।

কিন্তু এ সব অনিবার্য। ওগো আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি, যে দিকে আমাকে ডাকো, আমি সেই দিকেই চলেছি। তোমরা মহৎ আর মধুর,

সহৃদয় আর পবিত্র—তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তা কী করে বোঝাই! আমি যদি 'স্টোয়িক' হয়ে যেতে পারতাম, সেই সুখে-দুঃখে নির্বিচল, সঙ্গে-অসঙ্গে নির্বিকার। পারলাম কই হতে?

গ্রাম কেমন লাগছে তোমাদের? নিশ্চয়ই তার নয়নজুড়ানো দৃশ্য তোমাদের মনে প্রশান্তি এনে দিচ্ছে।

একটু গীতা শোনাই তোমাদের। "পৃথিবী যেখানে জেগে সেখানে সংযমী নিদ্রিত, আর যেখানে পৃথিবী নিদ্রিত সেখানে সংযমীর প্রখর জাগরণ।" যতই কবিরা বলুক জগৎ হচ্ছে ফুলের মালায় ঢাকা পঙ্কিল আবর্জনা, তবু এর এক কণা ধুলোও যেন তোমাদের না ছোঁয়। যদি পারো ওর ধার দিয়েও যেও না। তোমরা স্বর্গবিহঙ্গের শাবক, তোমাদের পা এই পঙ্ককুণ্ডে ঠেকবার আগেই তোমরা আবার আকাশের দিকে উড়ে যেয়ো।

আহা, যারা জেগে আছ তারা যেন আর ঘুমিয়ে পোড়ো না।

সংসারের অনেক আছে, সে তার অনেককে ভালোবাসুক। আমাদের শুধু একজন আছেন, আমাদের প্রভু, আমরা শুধু তাঁকেই ভালোবাসব। যে যাই বলুক, আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনব না, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। একমাত্র প্রিয়তম।

তাঁর কত শক্তি আছে, কত গুণ তিনি ধরেন, কত কী আমাদের কল্যাণ তিনি করতে পারেন, কে তা জানতে চায়, কে তার হিসেব রাখে? আমরা অবিনশ্বর কাল ধরে বলব, বলে আসছি, আমরা কিছু পাবার জন্যে ভালোবাসিনা। আমরা প্রেম নিয়ে ব্যবসা করতে বসিনি। আমরা শুধু দিই, নিই, চাইও না।

যারা দার্শনিক তারা প্রভুর স্বরূপের কথা বলতে আসে আমাদের কাছে, তাঁর গুণের কথা, ঐশ্বর্যের কথা। মূর্খেরা জানেনা আমরা তাঁর একটি চুম্বনের জন্যে পিপাসিত।

মূর্খ, তুমি কার সামনে কম্পিত জানু নত করে ভয়ে-ভয়ে প্রার্থনা করছ? তিনি কি ভয়ের, না, সম্ভ্রমের? আমার গলার হার দিয়ে তাঁর

গলায় ফাঁস পরিয়েছি আর তাতে এক গাছ সুতো বেঁধে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছি সঙ্গে করে। যাতে ক্ষণকালের জন্যেও আমাকে ফেলে না পালিয়ে যান একা-একা। ঐ হার প্রেমের হার আর ঐ সুতো আনন্দের সুতো। মূর্খ, তুমি তো গোপন তত্ত্ব জানো না, প্রেমের টানে ঐ অনন্ত আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের রাজা তিনি প্রেমের ক্রীতদাস। সমস্ত গতির যিনি গতি, চালকের যিনি চালক, তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের কঙ্কনধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচছেন তালে-তালে।

আমার এ সব উন্মত্ত প্রলাপ মার্জনা কোরো।

অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার এই দুশ্চেষ্টাকেও।

এ কি বর্ণনার জিনিস? এ শুধু অনুভবের। আমার নিরন্তর আশীর্বাদ নাও ইতি—

তোমাদের ভাই
বিবেকানন্দ'

মাদ্রাজে বিরাট সভা হল, তারপর কলকাতায়। উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হল, বিবেকানন্দ ভাঁওতা নয়, বিবেকানন্দ খাঁটি সন্ন্যাসী, হিন্দুধর্মের যোগ্যতম প্রতিনিধি। তার মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের সেই পুরাণী বাণী পুরাণী প্রজ্ঞা পুনর্বার বিঘোষিত হচ্ছে—পার্থিবতার দেশ আমেরিকাকে দিচ্ছে আধ্যাত্মিকতার খাদ্য যা ছাড়া তার পুষ্টি-তুষ্টি নেই, যথার্থ ক্ষুন্নিবৃত্তিও হবার নয়। জয় হোক বিবেকানন্দের। জয় হোক হিন্দুর।

হেল-ভগ্নীদ্বয়কে আবার চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'আমার বোনেরা,

জগদম্বার জয় হোক। আশাতীতরূপে আমি সিদ্ধিকাম। এত সম্মান পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। প্রভুর কৃপার কথা ভেবে কাঁদছি, শিশুর মত কাঁদছি। প্রভু কখনো তাঁর সেবককে ত্যাগ করেন না। এই সঙ্গে যে চিঠি তোমাদের পাঠাচ্ছি, সে সমস্ত কাগজপত্র, তা পড়েই সব বুঝতে পারবে। যে সমস্ত নাম দেখছ তারা আমাদের দেশের বরেণ্য মনীষী। যিনি সভাপতি হয়েছিলেন তিনি কলকাতার অভিজাতদের মধ্যে

প্রধানতম, আরেকজন যাঁকে দেখছ তিনি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, স্বয়ং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত, সমাদৃত। সঙ্গের কাগজপত্র দেখলেই সব বুঝতে পারবে। আমি একেবারে কেউকেটা নই।

কিন্তু, সত্যি আমি কী পাষণ্ড, যে এত করুণা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস টলে—যদিও দেখতে পাচ্ছি সর্বসময়েই আমি তাঁর হাতের মধ্যে।

তবু মাঝে মাঝে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, সুর ধরে হতাশায়। একজন ঈশ্বর আছেন, একজন পিতা—কিংবা বলো মা, যে কখনো তার সন্তানদের ফেলেনা, কখনো না কখনো না। যত সব অদ্ভুত বা অলৌকিক তত্ত্বকথা আছে দূর করে দাও। সন্তান হয়ে তাঁতে আশ্রয় নাও। আর লিখতে পাচ্ছিনা। মেয়ের মত আমি কাঁদছি।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ'

যখন আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, তখন আমরা নিজেকে যেন দু ভাগ করে ফেলি। বলছেন বিবেকানন্দ। তার মানে আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালোবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। ঈশ্বর আমাকে দাস করেননি, আমিই তাঁকে প্রভু করে সৃষ্টি করেছি, তাঁর দাস হবার জন্যে। যখন জানতে পারব আমি তাঁর সঙ্গে এক, তিনি আমার বন্ধু, আমার অন্তরতম, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা, তখনই আমার মুক্তি। সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি নিজেকে একচুলও তফাৎ করবে, ভয় যাবে না। জীবনের সমগ্র রহস্যই হচ্ছে নির্ভীক হওয়া।

ভগবানকে ভালবেসে জগতের কী কল্যাণ হবে আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখনো কোরো না। একবার ভালবেসে দেখনা কী হয়। ঈশ্বর মানেই তো ভালোবাসা। জীবন মানেই তো অনন্ত আনন্দাবকাশ। প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দাও, দেখ, শেষ করতে পার কিনা। দেখ

পাগল না হয়ে পারো কিনা। একটা বেড়াল তার বাচ্চাদের আদর করছে, ঐখানে দাঁড়াও, ভগবানকে দেখ, তাঁর উপাসনা করো। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই ভগবান। সেই ভালোবাসার চোখ হলে সর্বত্রই দেখতে পাব ভগবানকে, তাঁকে যত্র-তত্র খুঁজে বেড়াতে হবে না। বিশ্বাত্মা জগজ্জ্যোতি প্রভু প্রত্যক্ষ রয়েছেন সামনে, শুধু তাঁকে দেখবারই চোখ নেই, ভালোবাসার চোখ।

৬১

শিকাগোতে যেমন হেল-রা, ডেট্রয়টে ব্যাগলি-রা, তেমনি ফিসকিল ল্যাণ্ডিং-এ গার্নসিরা—ডক্টর গার্নসি আর তার স্ত্রী—স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল, নিয়েছিল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে। এবার ডাক এসেছে সোয়াম্পস্কট থেকে। সোয়াম্পস্কট থেকে গ্রীনএকার। গ্রীনএকার থেকে আনিসকোয়াম।

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে গ্রীনএকার-এ। অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাতে পারে বলে দাবি করে, এমনকি অন্ধকেও দিতে পারে চক্ষু। এক মিস্টার কর্লভিল আছেন, তিনি নাকি ভূতাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা দেন। আর একজন আছেন মিস্টার উড, তিনি নাকি মনের শক্তিতে ব্যাধি সারান। আমেরিকার মত জায়গাতেও কত কী অদ্ভুত দেখতে পাব।

কিন্তু যাই বলো, নদীর কোলে এই জায়গাটি ভারি মনোরম। স্নান করার ভারি সুবিধে। মেরি ও হ্যারিয়েট হেলকে লিখছেন স্বামীজি :

'কোরা স্টকহাম আমাকে একটি স্নানের পোশাক তৈরি করে দিয়েছে। হাঁসের মত জলে নেমে আমি বিভোর হয়ে স্নান করছি। কী আনন্দ এই অবগাহনে। কী আনন্দ।

গ্রীনএকার রিলিজিয়স কনফারেন্সেস বলে একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়েছে। সেটা মিস সারা ফার্মারের কীর্তি। সেইখানে বক্তৃতা দেবার জন্যেই স্বামীজিকে ডেকেছে ফার্মার। প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখে স্বামীজি

খুব খুশি, মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন, 'তুমি আমার ভারতীয় ফণ্ডে-টাকা দিতে চাও? দরকার নেই ওখানে দিয়ে। তুমি মিস ফার্মারের প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করো। মিস ফার্মারের বৈশিষ্ট্য কী জানো? সে আমার বিশ্বাসের উপর কাজ করছে। কী আমার বিশ্বাস? মানুষ মন্দ থেকে ভালো হচ্ছে নয়, মানুষ ভালো থেকে ক্রমশ আরো ভালো হচ্ছে।'

'ধর্ম আমাদের কী শেখাচ্ছে? আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি না, আমরা ঊর্ধ্বে উঠছি, আরো ঊর্ধ্বে।' সারা ফার্মারকে নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'ভালো আর মন্দ, পৃথিবীর দুটো চেহারা, এ ঠিক নয়। পৃথিবীর শুধু এক চেহারা। ভালো, হয়তো বা আরো ভালো। ভালোর চেয়েও ভালো। কোনো অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই এখানে। যদি কোনো চেষ্টা থাকে, তা হচ্ছে ভালোর থেকেও আরো ভালো করার, ভালো হবার চেষ্টা। যদি আমাদের পাবার ইচ্ছে থাকে, দেখব, স্বর্গরাজ্য আগের থেকেই বর্তমান। যদি নিজেকে দেখবার সাধ থাকে তবে মানুষ দেখবে সে আগের থেকেই পূর্ণ। এই ভাবকে জীবনায়িত করবার জন্যে তুমি ঈশ্বরেরই সেবা করবে। আমাদের গীতাতে বলেছে যারা ঈশ্বরের ভক্তদের ভক্ত তারাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা। যেখানেই থাকিনা কেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস, তোমার মহৎ ব্রতোদযাপনে সহায়তা করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। আর, তোমাকে সাহায্য করা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা হবে।'

ঈশ্বর শুধু শক্তির উচ্ছ্বাস নন, নন শুধু জ্ঞানের উৎস, তিনি আবার সমস্ত আনন্দেরও প্রস্রবণ। তাঁর অনুভব শুধু আনন্দের অনুভব। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। শুধু আমাতে চিত্ত রাখো, আমাকে ভালোবাসো, নানা মত-পথ বিধি-নিষেধ ত্যাগ করে একমাত্র আমাতে শরণ নাও, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, আমিই তোমাকে পাপতাপ শোক দুঃখ থেকে মুক্ত করব। আমাতে মন রাখলেই মনের সমস্ত অবসাদ সমস্ত অশুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে যেমন আত্যন্তিক

চিত্তশুদ্ধি হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। না উপাসনায়, না তপে-জপে, না দানে-ব্রতে না. বা মৈত্রীতে, তীর্থস্নানে। ভগবানকে হৃদয়ে রাখলেই অনন্ত আনন্দ, আর আনন্দই সমস্ত ব্যাধির নিরাকরণ।

প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততাই হৃদয়ে-ধরা ভগবানের মূর্তি। তুমি প্রসন্ন, তুমি উজ্জ্বল, তার অর্থই ভগবান তোমাকে ছুঁয়ে আছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়,' মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন স্বামীজি: 'মানুষের মুখ দেখামাত্রই আমার মন সহজেই বলে দিতে পারে মানুষটা কী রকম! তার ফলে, আর কারু মুখের দিকে নয়, সৎপরামর্শের জন্যে আমি মিস ফার্মারের দিকেই চেয়ে আছি। আমার বিষয় নিয়ে আর যে যাই বলুক, যতক্ষণ মিস ফার্মার আছে আমাকে পরামর্শ দিতে, যতই সে ভূত-প্রেত মানুক, আমি বিন্দুবিসর্গ চিন্তা করি না। সমস্ত ভূত-প্রেতের আড়ালে আমি অসীম ভালোবাসা-ভরা একটি মানবহৃদয় দেখতে পাচ্ছি, সেই আমার মহত্তম সম্পদ। তবে সত্য কথা বলতে কি, মিস ফার্মারের মনে একটি উচ্চাশা আছে—সেটি অবশ্যি প্রশংসনীয়, যদিও, আমি নিশ্চিত জানি, কয়েক বছরের মধ্যেই তার এই অভিলাষটা কেটে যাবে।'

গ্রীনএকার-এ নামজাদা হোটেল আছে, আর তার চারপাশে অনেক কটেজ। একটার নাম নাইটিঙ্গেল-নিবাস, যেহেতু সেখানে প্রসিদ্ধ গায়িকা মিস এমা থার্সবি থাকে। এই থার্সবির সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হয়েছিল নিউইয়র্কে, সেই থেকেই সে স্বামীজির শিষ্যা কিন্তু সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে নদী থেকে মাইলখানেক দূরে বিস্তীর্ণ পাইন-বন, আর এই পাইন-বনে নির্জনে, প্রত্যহ ধর্মালোচনার ক্লাস বসে। বক্তা কে? বক্তা স্বামীজি।

ঈশ্বর নিয়ে কথা কইবার এমন জায়গা আর হতে নেই। সমস্ত কোলাহলের বাইরে অতলান্ত শান্তির মধ্যে ঈশ্বরসন্নিধান। শব্দের মধ্যে পাখির ডাক, পাতার মর্মর আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে বক্তার মেদুরমধুর কণ্ঠস্বর।

সবুজ ঘাসে বা ঝরা পাতার বিছানায় কেউ বসে কেউ বা শুয়ে কেউ বা আধখানা গা এলিয়ে দিয়ে শুনছে। যারা বুড়ো তাদের জন্যেই চেয়ার

আনা হয়েছে। কোথাও কোনো দেশাচারের বন্ধন নেই। যার যেমন খুশি প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাও, আত্মীয়তা করো ঈশ্বরের সঙ্গে।

যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্বামীজি বক্তৃতা দেন তার নাম "স্বামীজি পাইন," স্বামীজির পাইন গাছ। এই গাছের নিচেই স্বামীজির প্রথম বেদান্ত-ভাষণ, অদ্বৈতবাদের প্রথম ঝঙ্কার।

আমি মনোবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত নই, না বা শ্রোত্রজিহ্বা, না বা ঘ্রাণচক্ষু ; ব্যোম নই ভূমি নই তেজ নই মরুৎ নই, আমিই চিদানন্দরূপ শিব। আমাতে দ্বেষরাগ নেই, লোভ মোহ নেই, মদও নেই, মাৎসর্যও নেই, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নেই, আমিই চিদানন্দরূপ শিব। পাপপুণ্যহীন সুখদুঃখহীন, মন্ত্রহীন, দেবযজ্ঞবিরহিত আমি—আমি ভোজ্যও নই ভোক্তাও নই আমি শুধু ভোজন—আমিই শিব চিদানন্দনরূপ। আমার মৃত্যু নেই, ভয় নেই, পিতা নেই, মাতা নেই, জন্ম নেই, জাতিভেদ নেই, আমি নিরাকার, অবিকল্প, সর্বত্র আমার বিভূতি, আমার না আছে মুক্তি, না বা পরিমাপ—আমিই চিনানন্দরূপ শিব।

শ্রোতারা সকলে সমস্বরে বলে, শিবোঽহং, শিবোঽহং।

'হে মাধব, অনেকেই তোমাকে অনেক জিনিস দেয়, আমি গরিব, নিঃস্ব, আমি তোমাকে কী দিতে পারি?' মেরী আর হ্যরিয়েটকে আরো লিখছেন স্বামীজি : 'এই শরীর মন আর আত্মা ছাড়া আমার আর কী আছে? তাই আমি সমর্পণ করলাম তোমার পাদপদ্মে। হে জগদীশ্বর, তোমাকে দীনহীনের এ পূজাঞ্জলি গ্রহণ করতেই হবে, ফিরিয়ে দিলে শুনব না কিছুতেই। ফিরিয়ে দেননি তিনি, আমার সর্বস্ব তিনি নিয়ে নিয়েছেন চিরকালের জন্যে।

আমরা যারা শ্রোতা, বেশির ভাগই শুষ্কচিত্ত। মাধব, ভগবান যে রস-স্বরূপ, তা একেবারেই কেউ বোঝে না, চায় না বুঝতে। তারা ডাল-চচ্চড়ির ভক্ত। তাদের কাছে ঈশ্বর ভয়ের ব্যাপার, বড় জোর রোগ সারানো শক্তি, বা কোনো স্পন্দনকম্পন। তাই তারা ঈশ্বরের নামে ঝাড়ফুঁক করে, টেবিলে ভূত নামায়, ডাইনির সঙ্গে মোলাকাত করে।

অথচ তোতাপাখির শেখানো বুলির মত প্রেম-প্রেম করতেও ছাড়ে না।

শোনো, তোমরা সৎভাবা, উন্নতচিন্তা। তোমাদের শুভ-চিন্তা ও সৎকল্পনার খোরাক কিছু দিই। চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে জড়কে চৈতন্যে পরিণত করো। প্রত্যহ অন্তত একবার করে সেই অনন্ত সৌন্দর্য শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্য ঘুরে এস, দেখে এস সেই ভাবভূমি। অস্বাভাবাবিক অলৌকিক কিছু খুঁজো না। হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রিয়তমের পাদপদ্মে মন সংলগ্ন করে রাখো, দেহ আর যা কিছু দেহের তাদের যা হবার হোক গে।'

নির্দিষ্ট পাইন-গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আবার বলছেন স্বামীজি :

আমি যোগী নই ভোগী নই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নই, আমি না শৈব না শাক্ত না বৈষ্ণব, বনে ও গৃহে আমার সমান-অনুরাগ, আমিই অবধূত দ্বিতীয় মহেশ। আমি নিরস্তপ্রপঞ্চ, পরিচ্ছেদশূন্য, অবস্থাত্রয়াতীত পূর্ণ্যব্রহ্ম। আমি বিশুদ্ধ বিমুক্ত একগম্য সর্ববেদান্তসিদ্ধ শাশ্বত। আমি অংশ নই, আমিই সমগ্র। শুধু আমি নয়, তুমিও সমগ্র। যা কিছু দেখছি খণ্ড করে, সব কিছুই একত্রীকৃত।

প্রত্যক্ষ অনুভব করো। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম।

মাসাচুসেটস, প্লিমাউথ থেকে কর্নেল হিগিনসন নেমন্তন্ন করে পাঠাল স্বামীজিকে। গোঁড়া খৃষ্টান, অন্য সব ধর্মকে বিশেষ পাত্তা দিতে রাজি নন, বরং বলেন, বিদেশ থেকে যারা ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করতে এসেছিল আমাদের সানডে স্কুলে নিয়মিত পড়তে পেলেই মানুষ হতে পারত—তিনিও ঠেকাতে পারলেন না স্বামীজিকে। সরে দাঁড়ালেন।

স্বামীজি যেন শুধু মানুষ নন, মানুষের চেয়ে বেশি। তাঁর সাধনা যেন শুধু মানুষ হওয়া নয়, যে বৃহত্তম সত্তায় সে প্রেরিত সেই ঈশ্বর হয়ে ওঠা।

মানুষের মধ্যে একটা রক্ষণশীল প্রবৃত্তি আছে, বলছেন স্বামীজি, আমরা তাই এক পাও অগ্রসর হতে চাই না। যে মানুষ বরফে জমে যাচ্ছে সে শুধু ঘুমোতে চায়। যদি কেউ তাকে টেনে তুলতেও চায়, সে

ওঠে না, বলে আমাকে ঘুমুতে দাও, বরফে ঘুমুতে বড় আরাম। সে নিদ্রাই তার মহানিদ্রা।

আমাদের সেই দশা। পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত বরফে জমে যাচ্ছে, তবুও আমরা ঘুমুতে চাইছি। একমাত্র ধর্মই পারে আমাদের টেনে তুলতে। কালনিদ্রায় যেন আমাদের পেয়ে না বসে। মানুষ যেখানে পড়ে আছে সেখানে পড়ে থাকলে চলবে না, তাকে ঈশ্বর হতে হবে।

প্লিমাউথ ছেড়ে স্বামীজি গেলেন গার্নসিদের কাছে, ফিসকিল ল্যাণ্ডিং-এ। সেখান থেকে আনিসকোয়াম।

আনিসকোয়ামে স্বামীজি ব্যাগলিদের অতিথি হলেন। 'সেই এক মহান বলিষ্ঠ পুরুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটে।' স্বামীজি সম্বন্ধে মিসেস ব্যাগলির অভিমত: 'সরল আর শিশুর মত বিশ্বাসী। পবিত্রতার প্রতীক। বিষদিগ্ধ নিন্দা বা সুধাস্নিগ্ধ প্রশংসা কিছুতেই বিচলিত বা অভিভূত হবার নন, শীতে উষ্ণে সুখে দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন ও নিন্দাস্তুতিতেও অনাসক্ত। শুধু ঈশ্বরে স্থিরচিত্ত।'

ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি:

প্রিয় বোন,

আবার ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি, ওরা কী ভীষণ সহৃদয়! প্রফেসর রাইট এসেছেন, এসেছেন এভানস্টোন-এর ব্র্যাডলি। কি আনন্দে কাটছে ওদের সঙ্গে। এক ভদ্রমহিলা আমার ছবি আঁকছেন। কদিন খুব নৌকা করে বেড়ালাম। একদিন তো ভরাডুবি, জামাকাপড় ভিজে একাকার।

গ্রীনএকার-এ কী সুন্দর কাটল! গাছের তলায় বসলাম, গাছের তলায় ঘুম, গাছের তলায় ঈশ্বরের কথা, যেন ঈশ্বরকে পাশে বসিয়ে গল্প করা। কটা দিন মনে হয়েছিল যেন স্বর্গের কাছাকাছি আছি।

এর পরে আবার নিউইয়র্কে যাবার ইচ্ছে। কিংবা জানিনা বোস্টনে মিসেস ওল বুলের কাছে যেতে পারি। ওল বুলের নাম শুনেছ? সে আমেরিকার এক নম্বর বেহালা-বাজিয়ে। মিসেস তারই বিধবা স্ত্রী—কিন্তু অসাধারণ ধর্মপ্রাণ। ভারতবর্ষ থেকে আনা কাজ-করা কাঠে

তৈরি তার বৈঠকখানা, আর আমাকে বারে বারে বলছে ঐ বৈঠকখানায় বক্তৃতা করতে। বলো আর কত বক্তৃতা করব। টাকা করবার সমস্ত মতলব আমি বিসর্জন দিয়েছি। শুধু মাথা গোঁজার একটু আচ্ছাদন, একখানি রুটির আর আমার কাজ—এই পেলেই আমি পরিতৃপ্ত। আমার স্বাস্থ্য ? আমার স্বাস্থ্য একরকম ভালোই আছে, আর ভগবান করুন, ভালোই হয়তো থাকবে।

এদেশে কতদিন থাকব কিছুই জানি না, কেউই পারে না বলতে। একমাত্র ভগবান জানেন। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন এই নিরন্তর প্রার্থনা।

ভাই বিবেকানন্দ

'মাকে বোলো আমার আর কোট লাগবে না।' মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি : 'আমার পোশাক অনেক জমে গিয়েছে। যা ভদ্রভাবে বইতে পারা যায় তার চেয়েও বেশি। জানো যখন আমি জলে পড়ে গিয়েছিলাম আমার গায়ে সেই কালো স্যুটটা ছিল, যে স্যুটটা আমাকে খুব মানাত বলে তোমরা পছন্দ করতে। কতদিন ওটা পরে ধ্যানের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছি, জলের সমুদ্র এর কী ক্ষতি করবে ?'

মিসেস হেলকে মা আর তার মেয়েদের বোন বলেন স্বামীজি। মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখছেন, 'মিসেস জি. ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু, তাঁকে আমি মা বলি আর তাঁর মেয়েরা আমার বোনের মত। আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কত আর বক্তৃতা দেব ? আমাকে এবার কলম ধরতে হবে। কিন্তু স্থির হয়ে দু দণ্ড যে বসব একজায়গায় তার সুবিধে কই ?'

বোস্টনে এসে মিসেস বুলকেও লিখছেন সেই কথা : 'বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখতে চাই। কত আমার উত্তাল ভাব, আমি চাই তা লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু আমার জন্যে নির্জনতা কোথায় ?'

মিসেস বুল স্বামীজির কাছ থেকে কটা ডলার নিয়েছিলেন, এখন চাইছেন তা ফিরিয়ে দিতে।

লিখছেন স্বামীজি : 'মা, আমি হিন্দু। হিন্দু সন্তান কখনো মাকে টাকা ধার দেয় না। সন্তানের উপর মার সর্ববিধ অধিকার, তেমনি মার উপর সন্তানের। সেই তুচ্ছ কটা ডলার ফিরিয়ে দেবার কথা বলছ শুনে তোমার উপর আমার খুব রাগ হয়েছে। যেন তোমার ধারই আমি শুধতে পারব ইহজন্মে!'

সত্যি-সত্যি দোকানে ঢুকে লেখবার সব সাজসরঞ্জাম কিনে নিলেন একদিন। সুন্দর দেখে একটা পোর্টফোলিও পর্যন্ত। কিন্তু লেখা হচ্ছে কই? মাদ্রাজ স্বামীজিকে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছে, তারই একটা উত্তর শুধু লিখে উঠতে পেরেছেন স্বামীজি। কিন্তু আরো কত কথা কত চিন্তা কত অভিজ্ঞতা স্থায়ী অক্ষরে বন্দী করবার বাসনা। কিন্তু কই অবকাশ, কই শান্তি, কই পবিত্রনির্জন পরিবেশ?

'আমি যে বই লেখবার সঙ্কল্প করেছিলাম তার এক পঙক্তিও লিখতে পারিনি। কেবল বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাস করছি, বেদান্ত শেখাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-ওখানে।' আলাসিঙ্গাকে আবার লিখছেন : 'আর কী হবে এ দেশে থেকে? অনবরত ঘোরাঘুরি করে বকে-বকে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং বুঝতে পারছ, আমি শিগ্গিরই ফিরছি। এখানে আমার বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে আর তাদের ইচ্ছে, আমি বরাবরই এখানে থেকে যাই। কিন্তু শুধু খবরের কাগজে নাম বেরুনো ও জনসাধারণের কাছে ভুয়ো লোকমান্য—এ নিয়ে আমার হবে কী? আমি কি নাম-যশের ভিখারী?'

মিসেস বুল লিখে পাঠালেন : 'আমার কাছে এস। আমার বাড়িতেই তোমার জন্যে শান্তি অপেক্ষা করে আছে। আমি ছাড়া আর কে আছে তোমার পথ চেয়ে? ভুলে যেও না, আমি তোমার মা।'

পাতানো মা নয়, সত্যিকার মা। মিসেস হেলকে বরং বলা যায় পাতানো মা, কিন্তু মিসেস বুলকে সমস্ত নিগূঢ় সত্তা থেকে স্বামীজির মা ডাকা। 'শুধু তুমি আমাকে নানাভাবে রক্ষা করেছ বলে নয়, সাহায্য করেছ বলে নয়, অন্তরস্থ দৈবী প্রেরণায় তোমাকে আমি আমার মা বলে চিনেছি। বলতে পারো, হয়তো বা আমার প্রভুর নির্দেশে।'

সর্বদা ঈশ্বরের কাছে আছে এমন একজন উজ্জ্বল পুরুষের সান্নিধ্য পাওয়া, মিসেস ব্যাগলি স্বামীজি সম্বন্ধে লিখছেন, এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে আসা। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য দেখে অভিভূত হবে না এমন মানুষ দেখলাম না কোথাও। শ্রীতে ও ধী-তে অখণ্ডমণ্ডিত অথচ কত নম্র, কত আলাপকুশল। যেন সহজ-সুচির বন্ধু। বোস্টন থেকে এলেন আমার বাড়ি আনিসকোয়ামে, আমারই নিমন্ত্রণে। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারের নয়, আমার সমস্ত প্রতিবেশীদের সে কী এক মহোৎসব, যতদিন ছিলেন তিনি আমার অতিথি হয়ে। তিনি চলে গেলেন আমাদের সমস্ত বিলাসরসেরও শেষ হল। দিন অন্ধকার হয়ে গেল।

'কুছ পরোয়া নেই। ওয়া গুরুকা ফতে।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি: 'আরে দাদা, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মিশনরি-ফিসনরির কী কর্ম এ ধাক্কা সামলায়? মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম ফার্সি পড়া? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা কোরো না। সব কাজেই একদল বাহবা দেবে, আরেক দল দুষমনি করবে। নীরবে নিজের কাজ করে যাও, কারুর কথায় জবাব দেবার কী দরকার?

ঐ যে জি. ডবলিউ হেলের ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র থাকে, মেয়েরা এখনো ঘরে। চারজনেই যুবতী, বে-থা করেনি। রূপসী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে ওস্তাদ। ওদের জন্যে অনেক ছেলে ফ্যা-ফ্যা করছে, কিন্তু ওদের ওদিকে বিশেষ মন নেই। ওরা বোধহয় বিয়ে করবে না। তার উপর আমার সংস্রবে এসে ওদের ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত। ওরা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেয়ে দুটি, ব্লণ্ড, অর্থাৎ ওদের চুল সোনালী, আর ভাইঝি দুটি ব্রুনেট, অর্থাৎ তাদের চুল কালো। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—ওরা সব জানে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি ওদের মা বলি। আমি

যেখানেই কেন যাইনা, থাকিনা, আমার জিনিসপত্র সব ওদের বাড়িতে। তারাই সব ঠিকানা করে। খোঁজখবর নেয়।

কী মেয়েরা বাবা, এদেশে। এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে শিশুটির মত হাত ধরে পথ দেখিয়ে মাঠে ঘাটে দোকানে নিয়ে যায়। সব কাজ করে, আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনা। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরাই সাক্ষাৎ জগন্মাতা, এদের পূজা করলেই সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত। আরে, রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে ? এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরি করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব। আমাদের পুরুষগুলোই এদের, মেয়েদের কাছে ঘেঁষবার যুগ্যি নয়, মেয়েদের কথা কী বলব! হরে হরে, কী মহাপাপী, দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়। হে প্রভু—'

আরো লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে :

'এ দেশে ভুতুড়ে অনেক। যে ভূত আনে তাকে বলে মিডিয়ম। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পরদার ওপার থেকে ভূত বেরোতে আরম্ভ করে, বড় ছোট হররকমের ভূত। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে কিন্তু ঠগবাজি বলেই মনে হল। আরো গোটাকতক দেখে তবে সিদ্ধান্ত করব। যাই বলো ভুতুড়েরা আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

আরেক দল হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স—এরাই হচ্ছে আজকালকার বড় দল। গোঁড়াদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী, গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত জোগাড় করে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর সোঽহং সোঽহং বলে মনের জোরে রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। এরা ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বল্ রোগ নেই, ব্যস্, ভালো হয়ে গেল, আর বল্ সোঽহং, ব্যস্, ছুটি, চরে খা গে। এরা ঘোর জড়বাদী, রোগ ভালো করে, আজগুবি করে, তবে ধর্ম মানে। এরা কিন্তু আমাকে খুব খাতির করে। কেন করবে না ? ব্রহ্মচর্যের মত আর কী বল আছে! আর কী আছে কৌশল!

গোঁড়াদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে। আর ভূত-উপাসক বলে হিন্দুকে পারছে না ঘৃণা করতে। আমিই তাদের যম। বলে, কোথা থেকে এ

ব্যাটা এস ! রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ এর পিছু-পিছু ফিরছে, গোঁড়ামির জড় মারবার জোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা। গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে তা নেববার নয়। কিছুতে নয়।

এদেশের লোক ভালোমানুষ, দয়ালু সত্যবাদী। সব ভালো, কিন্তু ঐ যে ভোগ, ঐ ওদের ভগবান। টাকার-নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের পাহাড়, বিলাসের হরিহরছত্র। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মনাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষ লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ কর্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেই ইহলোকে দেবতা যজন করে কারণ মনুষ্যলোকে কর্মজনিত সিদ্ধিই শীঘ্র লাভ করা যায়।

অদ্ভুত তেজ আর বলের সমুচ্ছ্বাস। কী শক্তি, কী কুশলতা, কী ওজস্বিতা ! হাতির মত ঘোড়া বড় বাড়ির মত গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহাশক্তির সন্তান, এরা বামাচারী। তারই জয়জয়কার এখানে।'

'আমাদের দেশে একজনকে আমি চিনতাম', স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন, 'সে চিরকেলে অজ্ঞ আর অলস, পশুর মত জীবনযাপন করত। আমার সঙ্গে দেখা হলে সে জিগ্‌গেস করল, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য আমাকে কী করতে হবে ?'

আমি তাকে বললাম, 'তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো ?'

সে বললে, 'না।'

তখন আমি বললাম, 'তবে তোমাকে মিথ্যে বলা শিখতে হবে। একটা পশুর মত বা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবনযাপন অপেক্ষা মিথ্যে বলা ভালো। তুমি অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবলম্বন করে ও যা সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, তা তোমার লাভ হয়নি। তুমি এতদূর জড় যে তোমার একটা অন্যায় কাজ করবারও ক্ষমতা নেই। উপহাসের মত বলছিলাম বটে কথাটা, কিন্তু আমার ভাব ছিল এই, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করতে হলে কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।'

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ যে ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম স্থাপন করে ফলাসক্তি ও

কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত হয়ে কাজ করে সে পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলস্পৃষ্ট হয়েও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।

৬২

সপ্তাহখানেক মিসেস বুলের সঙ্গে কাটিয়ে স্বামীজি গেলেন বালটিমোর।

খবরের কাগজের লোক তড়িঘড়ি এসে দেখা করে গেছে। লিখেছে :

একটা দেখবার মতন চেহারা। মাথাভরা কালো চুল, ঢেউখেলানো, মাঝে মাঝে উড়ে এসে পড়ছে কপালে, প্রায় ভুরু ঘেঁষে। তেমনি কালো দুই চোখ। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। আর যখনই হাসে মুক্তোর মতন সার-বাঁধা সুগঠিত দাঁত ঝিলকিয়ে ওঠে। সমস্ত অস্তিত্ব থেকে আনন্দ যেন উথলে পড়ছে। এমন লোককে দেখে কে না একটু থমকে দাঁড়াবে? কত বয়স হবে? বত্রিশ-তেত্রিশ। দৈর্ঘ্য? সাড়ে পাঁচ ফিট। ওজন? প্রায় দুশো পঁচিশ পাউণ্ড। দীর্ঘায়ত দেহে অতি প্রিয়দর্শন। এই অল্প বয়সেই বহু বিদ্যা করায়ত্ত করেছে। সাত-সাতটা ভাষায় নিরর্গল বক্তৃতা দিতে পারে। আর ইংরিজি যা বলে একেবারে নিখুঁত। আর আলাপ করে দেখ, কী যে নখাগ্রে নেই বুঝে ওঠা যায় না। মিল, ডারউইন, স্পেন্সার, আরো কত কত দার্শনিকের লেখা এক নিশ্বাসে বলতে পারে মুখস্থ। ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস্যরূপে উদার। একই সত্য প্রত্যেক ধর্মের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য। একই গন্তব্যে যাবার বিচিত্র রাস্তা। কিন্তু যাই বলি, ভারতবর্ষে যেমন ধর্মের জন্য টান তেমনি আমেরিকায় কোথায়? আমেরিকায় টান বিষয়ের দিকে। ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত ধর্ম আমেরিকায় কিছু পাঠিয়ে আমেরিকার উদ্বৃত্ত বিষয় যদি কিছু পাঠানো যেত ভারতবর্ষে! স্বামীজি বলেছেন, তা হলেই সমন্বয় হত পুরোপুরি। কাল বক্তৃতা দেবেন এখানে। শুনবে সে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আর তিনি দাঁড়াবেন তাঁর ভারতীয় সন্ন্যাসীর পোশাকে। সে এক আশ্চর্য পোশাক।

সভার উদ্যোক্তোরা স্বামীজিকে নিয়ে গেল এক সস্তা হোটেলে। হোটেলওয়ালা স্থান দিলেনা। গায়ের রঙ যার কালো তার অধিকার নেই ঢোকবার।

এ হোটেল নয় তো আরেক হোটেল।

সেখানেও সেই দৌর্জন্য। না, মিলবেনা জায়গা। কালা আদমি ঘেঁষতে পাবেনা এখানে।

আরেক হোটেলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, স্বামীজি গর্জে উঠলেন 'কী কেবল সস্তা হোটেলের দিকে যাচ্ছ, এখানে কোনো সম্ভ্রান্ত হোটেল নেই?'

'তা আছে বৈকি।'

'সেখানে নিয়ে চলো।'

'সেখানে তো ব্যবহার আরো রূঢ় হবে। ঢুকতে দিলেও পরে তাড়িয়ে দেবে।'

'দিক, তবু সেখানে নিয়ে চলো।'

'উদ্যোক্তারা তবু দ্বিধা করতে লাগল।

'কী নাম সেই বৃহত্তম হোটেলের?'

'হোটেল রেনার্ট।'

'সেখানে গিয়েই উঠব। চলো সেই দিকে। স্বামীজি অস্থির হয়ে উঠলেন।

'সেখানে আপনার দায়িত্ব কে নেবে?' উদ্যোক্তারা পাশ কাটাতে চাইল।

'আমার দায়িত্ব আমি নেব। ঈশ্বর নেবেন।' আবার তাড়া দিলেন স্বামীজি: 'তোমরা আগে একবার আমাকে নিয়ে চলো তো সেখানে।'

হোটেল রেনার্টের একটা গোটা ঘর ভাড়া নেওয়া হল। কে স্বামী বিবেকানন্দ, হোটেলের কেরানি খেয়াল করল না। খালি ঘরে দিব্যি ঢুকে পড়ল স্বামীজি।

উদ্যোক্তারা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কতক্ষণে টের পেয়ে ম্যানেজার এসে তাড়িয়ে দেন বিদেশীকে।

কিন্তু কই, কিছুই তো হচ্ছে না। স্বামীজি তো আসছেন না বেরিয়ে। কোথাও তো বিরোধ-বচসা নেই। দিব্যি টিকে আছেন স্বামীজি।

'চলে এস।' উদ্যোক্তারা বলাবলি করতে লাগল: 'ও হিন্দু সাধু, কত কী কৌশলে জানে হয়তো। চোখে কি ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে লুকিয়ে!'

উদ্যোক্তারা চলে গেল।

কিন্তু আমার আবার কৌশল কী! স্বামীজি ভাবছেন মনে-মনে। স্পষ্টতা, নির্ভীকতা, প্রশান্তচিত্ততাই আমার কৌশল। আমার কৌশল ব্রাহ্মী স্থিতি।

না, লুকিয়ে থাকব কেন? কেন ছদ্মরূপ ধরে থাকব অন্তরালে? আমি যা তাই লোকে দেখুক আমাকে।

পর দিন লবিতে চেয়ার টেনে প্রকাশ্যে বসেছেন স্বামীজি। গায়ে মেরিন রঙের ড্রেসিং গাউন, কোমরে চওড়া লাল ফিতে। যে দেখতে চাও দেখ আমাকে। যে আলাপ করতে চাও মুখোমুখি বোসো আরেকটা চেয়ারে। আলাপ করো।

কে এই বিরাট প্রাণপুরুষ! পরিপূর্ণতার পুরোহিত! যে দেখে সেই চেয়ে থাকে মুগ্ধ হয়ে। যে শোনে সে আর উঠতে চায় না।

এমন জোরদার উপস্থিতি যেন সকল কুণ্ঠা ও দ্বিধার পারে নিয়ে যাবে সহসা। হিসেবে এতটুকু গরমিল রাখবে না।

লিশিয়াম থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন:

'নীতিকথা অনেক হয়েছে এখন রুটির দরকার, রুটি চাই। পেটে যার ভাত নেই বাহুতে যার বল নেই বুকে যার সাহস নেই, তার আবার নীতি কী? আমরা আর মিশনারি চাইনা, আমরা টাকা চাই, চাই শিল্পে অগ্রগতি। মন্দির অনেক হয়েছে এখন হোক কলকারখানা। নীতি-অনুসারে জীবন গঠন করবার পার্থিব উপায় ও অনুকরণ আমাদের হাতে আসুক। ঠোঁটের প্রার্থনার চাইতে হাতের প্রার্থনা বেশি

কার্যকর। কর্মেই আসল ধর্ম। পরোপকারই কর্মের লক্ষ্য। ধর্ম মানেই তো বিস্তার। আর পরপোকার ছাড়া কিসে জীবনের বিস্তার ঘটবে? সুতরাং কাজ করবার হাতিয়ার দাও ভারতবর্ষকে, অনর্থক ধর্মকথা শোনাতে এস না।'

বালটিমোর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি :

'লোহা গরম থাকতে-থাকতেই ঘা মারো। মহাশক্তিতে কাজে নামো। কুড়েমির কর্ম নয়। ঈর্ষা অহমিকা জন্মের মত বিসর্জন দাও গঙ্গাজলে। তুমি শুধু বলভরে কাজে লাগো, বাকি সব প্রভু দেখিয়ে দেবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাবে। ওয়ার্ক, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক— এই মূল মন্ত্র। আমি তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এদেশে কাজের বিরাম নেই। সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে প্রভুর তেজের বীজ পড়বে সেখানেই ফল ফলবে, অদ্য বাব্দশতান্তে বা। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, নিজেদের নাম বাজানো নয়। নিরঞ্জন সিলোনে পালি ভাষা কেন শেখেনা, কেন পড়ে না বৌদ্ধগ্রন্থ? অনর্থক ভ্রমণে কী ফল? প্রভুর যারা শরণাগত, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমস্ত তাদের পদতলে। হামবড়া ও দলাদলি ছাড়ো, পৃথিবীর মত সর্বংসহ হও। তা হলে দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসবে। মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করে মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করো।'

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়, আবার বলছেন স্বামীজি, আমাদের হাতে সমূহ যে কর্তব্য আছে তারই অনুষ্ঠানে শক্তিসঞ্চয় করে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া, যতদিন না সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে পারি। কোনো কর্তব্যকেই ঘৃণা করলে চলবে না। যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন কাজ করে, সে নিম্নদরের লোক হয়ে যায় না। কর্তব্যের প্রকার দেখে মানুষের বিচার নয়, কর্তব্য-সম্পাদনের প্রকার দেখে মানুষের বিচার। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে এমন একজন অধ্যাপকের চেয়ে একজন মুচি শ্রেষ্ঠ, যে অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত সুন্দর জুতো তৈরি করে। বচনের থেকে রচন শ্রেষ্ঠ।

পরোপকারই আত্মোপকার। এ কথা মনে রাখতে হবে, আমরাই জগতের কাছে ঋণী, জগৎ আমাদের কাছে ঋণী নয়। আরো মনে রাখতে হবে জগতের একজন অধীশ্বর আছেন। তিনি অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছেন। তুমি-আমি ঘুমুই কিন্তু তাঁর ঘুম নেই। তিনি সব সময়ে জাগরিত, সব সময়ে অবহিত। জগতে যা কিছু বিবর্তন ঘটছে সব তাঁর কাজ। তা হলে প্রশ্ন করতে পারো, আমরা কাজ করব কেন? ঈশ্বর কাজ করছেন বলে, তাঁকে দেখেই তাঁর থেকে শিখেই আমাদের কাজ করতে হব। আমাদের কাজ করতে হবে আধ্যাত্মিক বললাভের জন্যে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর হবার জন্যে। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে জগতের জন্যে কিছু কাজ করবার আমরা সুযোগ পেয়েছি। জগতের সাহায্য? না, না, নিজেদের কল্যাণ। নিজেদের অভ্যুদয়।

লিশিয়াম থিয়েটারে আবার আরেক দিন বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। এবারকার বিষয় বুদ্ধ। সে কী ভিড় আর বক্তৃতান্তে সে কী হর্ষধ্বনি।

'চক্রের ভিতরে চক্র—এ এক ভয়ানক যন্ত্র।' বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি: 'প্রত্যেকেই আমরা ভাবি যে হাতের কাছের এ কর্তব্যটা সমাধা হয়ে গেলেই বিশ্রাম লাভ করব, কিন্তু কর্তব্যটা শেষ হবার আগেই আর এক কর্তব্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাই। এ যন্ত্রের থেকে উদ্ধার হবে কিসে? দুটি উপায় আছে। এক, এই যন্ত্রের সঙ্গে সংস্রব একেবারে ছেড়ে দেওয়া—যন্ত্র চলুক, তুমি এক পাশে সরে দাঁড়াও। সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ করো। এ কোটিকে গুটিক পারে কিনা সন্দেহ। নয়তো যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, পালিয়ে যেও না, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যন্ত্রের কর্মের রহস্য আয়ত্ত করো। কর্মের দ্বারাই আমরা যাব কর্মের বাইরে। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়েই যন্ত্রের বাইরে যাবার পথ।

সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করো, অনাসক্ত হও। কর্ম করবার জন্যে অভিসন্ধির দরকার কী! ভালো কাজ করো যেহেতু ভালো কাজ করাই ভালো, ভালো কাজ করতেই আমার ভালো লাগে। গীতার বিরুদ্ধে আমি অনেক তর্ক পড়েছি—অভিসন্ধি ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্তু ভেবে দেখ অভিসন্ধিই তো বন্ধন। আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি,

চরণে শৃঙ্খল জড়ানো নয়। যদি আমরা মনে করি এই কর্মের ফলে আমরা স্বর্গ পাব তা হলে আবার স্বর্গ নামক একটা স্থানে আমাদের আবদ্ধ হতে হবে। ও তো আরেক ক্লেশ, আরেক যন্ত্রণা।

আমি অল্প কথায় তোমাদের কাছে এমন একজনের কথা বলব যিনি এই শিক্ষাকে জীবনায়িত করেছিলেন। তিনিই বুদ্ধ, কর্মযোগিশ্রেষ্ঠ। অন্য মহাপুরুষদের কর্মের প্রেরণার মূলে ছিল বাইরের অভিসন্ধি। কেউ-কেউ বলেছেন, আমরা ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ হয়েছি; কেউ-কেউ বা বলেছেন ঈশ্বরপ্রেরিত—কিন্তু দু'দলেরই কার্যের প্রেরণাশক্তি বহির্বাসী। যাই আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না, তাঁরা বহির্জগৎ থেকেই পুরস্কার আশা করেন। কিন্তু বুদ্ধ কী বললেন? বললেন, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নই--ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতে আমার প্রয়োজন কী? আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানে আমার সময় কোথায়? আমি শুধু এই বুঝি, সৎ হও আর সৎ কাজ করো। তোমার সত্য যাই হোক না, এই সততাই তোমাকে পৌঁছে দেবে সেখানে।

বুদ্ধই সম্পূর্ণরূপে অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, অথচ তাঁর মত কে অত কাজ করেছে? সব কাজ অন্যের জন্যে, নিজের জন্যে কিছু নয়। ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও যিনি তাঁর মত উঠেছেন, গিয়েছেন, পৌঁচেছেন। এত উন্নত দর্শন ও সেই সঙ্গে এত নির্মল করুণা কার! তথাচ উচ্চ-নীচ কারু কাছে কোনো দাবিদাওয়া নেই। বুদ্ধের সঙ্গে আর কারু তুলনা হয় না—বুদ্ধই আত্মশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমীকরণের জ্বলন্ত উদাহরণ। বুদ্ধই সর্বপ্রথম সাহস করে পেরেছিলেন বলতে, কোনো প্রাচীন পুঁথিতে কোনো বিষয় লেখা আছে বলে বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলে অথবা শিশুকাল থেকে কোনো বিশেষ বিশ্বাসে গঠিত হয়েছ বলেই কোনো বিষয় বিশ্বাস কোরো না। বিচার করো, তারপর বিশ্লেষণ করে দেখ সকলের পক্ষে কী উপকারী। যদি তা বুদ্ধিতে পাও তবেই তাকে বিশ্বাস করো, সেই মত জীবনযাপন করো ও অন্যকে বলো সেই মত জীবনযাপন করতে।'

বালটিমোর থেকে ওয়াশিংটনে এলেন স্বামীজি। সেখান থেকে চিঠি লিখছেন মিসেস বুলকে :

'বালটিমোরে এক ছোটলোক হোটেলওয়ালার কাছে যে দুর্ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেমন সর্বত্র হয়েছে, এখানেও আমেরিকার মেয়েরাই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। এখানে মিসেস ই. টটেনের বাড়িতে আছি। ইনি আমার শিকাগোর বন্ধুদের আত্মীয়।'

শিকাগোর বন্ধুদের মানে হেলদের।

'হাজার হাজার লোক সাগ্রহে আমার কথা শুনছে।' রাজপুতানার বিহিমিয়া চাঁদকে লিখছেন স্বামীজি : 'এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য কিন্তু প্রভু সর্বত্রই আমার সংস্থান করে চলেছেন।'

'আমার জন্যে মার কাছে কত বলেছেন—'মাস্টারমশাইকে বলছে নরেন, 'যখন খেতে পাচ্ছি না, নিদেন কাল হয়েছে, বাড়িতে খুব কষ্ট, তখন আমার জন্যে মার কাছে টাকা চেয়েছিলেন ঠাকুর। টাকা হল না। বললেন, মা বলেছেন মোটা ভাত মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত-ডাল হতে পারে। এত আমাকে ভালোবাসা—কিন্তু যখনই কোনো অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন। অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ সঙ্গে গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠলনা—'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি ধন্য। রাত দিন তাঁকে চিন্তা করছ।'

কাতরস্বরে নরেন বললে, 'কই তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে কই ?'

বুদ্ধ গয়া থেকে ফিরেছে নরেন, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাস্টার জিগগেস করলে, 'বুদ্ধদেবের কী মত ?'

নরেন বললে, 'তপস্যার পর বুদ্ধ কী পেলেন মুখে বলতে পারেন নি। তাই সকলে তাঁকে নাস্তিক বলে।'

'নাস্তিক কেন ?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'শুধু মুখে বলতে পারেনি এই যা। বুদ্ধ কী জানো ? বোধস্বরূপকে চিন্তা করে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ

হওয়া। যেখানে স্বরূপের বোধ সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।'

'সে অবস্থায় কণ্ট্রাডিকশনস মিট করে।' মাস্টারকে লক্ষ্য করল নরেন : 'সে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভব।'

'অর্থাৎ সে অবস্থায়ই নিষ্কাম কর্ম।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে : 'বুদ্ধদেবের কী মত ?'

'ঈশ্বর আছে কি নেই এ নিয়ে মাথা ঘামাননি বুদ্ধ। তিনি শুধু দয়া নিয়ে ছিলেন। একটা বাজ পাখি শিকার ধরে খেতে যাচ্ছিল, তাকে বাঁচাবার জন্যে বুদ্ধ বাজ পাখিকে তাঁর গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন।' নরেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'কী বৈরাগ্য ! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলেন। যাদের কিছু নেই, ঐশ্বর্য নেই, তারা কী ত্যাগ করবে ?'

'আর কী করলেন ?' করুণোদ্বেল চোখে তাকালেন রামকৃষ্ণ।

'তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ তাঁর বাড়িতে এলেন।' সমান উৎসাহে বলতে লাগল নরেন 'ছেলেকে, স্ত্রীকে, রাজবংশের অনেককে, বললেন বৈরাগ্য নিতে। দেখুন কী মহৎ বিত্তের রাজভাণ্ডার এনেছেন বুদ্ধ। আর এদিকে ব্যাসদেবের কাণ্ড দেখুন। শুকদেবকে বারণ করলে বৈরাগ্য নিতে। বললে, পুত্র, সংসারে থেকে ধর্ম করো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'শক্তি-ফক্তি কিছু মানতেন না বুদ্ধ। তাঁর শুধু নির্বাণ। গাছতলায় তপস্যায় বসলেন, বসলেন একাসনে, আর বললেন, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাণ লাভ করি ততক্ষণ, শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাক, উঠব না আসন ছেড়ে। আসলে, নরেন তাকাল শশীর দিকে : 'শরীরই বদমায়েস। ওকে জব্দ না করলে কিছু হবার নয়।'

'তবে তুমি যে বলো মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়।' শশী হাসল : 'খেতে বলো মাংস।'

'মাংস যেমন খেতে পারি তেমনি ছাড়তেও পারি।' বললে নরেন, 'নুন না দিয়েও খেতে পারি শুধু ভাত।'

ওয়াশিংটন থেকে স্বামীজি চিঠি লিখলেন আলাসিঙ্গাকে। আঠারোশ চুরানব্বুইয়ের সাতাশে অক্টোবর।

'গঠনমূলক কাজে আমি দক্ষ নই। ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়, এসবই আমার স্বভাবের উপযোগী। আমার মনে হয় যথেষ্ট কাজ করেছি, এখন একটু বিশ্রাম চাই। আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যা পেয়েছি, ইচ্ছে করে, তাই সবাইকে শেখাই। যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, বাপ-মা হারা অনাথের মুখে একটুকরো রুটি দিতে পারেনা, আমি সে ধর্ম সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা। তত্ত্ব যত গভীর হোক, মতবাদ যত সুন্দর, যতক্ষণ তা পুঁথিতে আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি ধর্ম বলতে রাজি নই। আমাদের চোখ পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে। অতএব সামনে চলেও, যে উপদেশগুলো ধর্ম বলে মনে করো, তাদের জীবনে মূর্তিমন্ত করে তোলো।

আমার উপর নির্ভর কোরো না। নিজের নিজের উপর নির্ভর করতে শেখ। আমি যে সর্বাসাধারণের মধ্যে উৎসাহসঞ্চারের উপলক্ষ্যস্বরূপ হয়েছি তার জন্যে আমার মত আর সুখী কে? তুমিও এই উৎসাহস্রোতে গা ঢালো, কোথাও ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না।

হে বৎস, যথার্থ ভালোবাসা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। আজ হোক, কাল হোক পরে হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। কোথায় চলেছ ঈশ্বরকে খুঁজতে? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—এরা কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো, পরে আর সব। গঙ্গাতীরে বাস করে কেন অকারণ কুয়ো খুঁড়ছ? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কী হবে? খবরের কাগজ কী বলে না বলে আমি তার দিকে চোখ মেলে থাকি না। তোমার হৃদয়ে আছে তো ভালোবাসা? তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো? তবে কারু সাধ্য নেই তোমার শক্তিকে রোধ করতে পারে। মানুষের জয় কিসে? মানুষের জয় চরিত্রবলে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করে থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চান—তোমরা বীর হও। ঈশ্বরের সন্তান হও।

আমি ভগবানের দাস। এখানে একজন যদি আমার বিরুদ্ধে লাগে শত শত লোক আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এখানে মানুষ মানুষের জন্যে ভাবে, কাঁদে আর এখানকার মেয়েরা দেবীস্বরূপা। যদি প্রশংসা করা যায় মূর্খরাও কাজে অগ্রসর হয়। যদি সব দিক থেকে সুবিধে হয় অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কাজ করে, কিছুতে আকৃষ্ট বা বিচলিত হয় না। শত শত বুদ্ধ নীরবে কাজ করে গিয়েছে বলেই জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের প্রকাশ। প্রিয় বৎস আলাসিঙ্গা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি। দীন-দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্যে নরকে যেতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি। পশ্চিমের লোকেদের কথা আর কী বলব, এরা আমাকে খেতে-পরতে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে নিবিড় বন্ধুতা। খুব গোঁড়া খ্রীষ্টানকেও পেয়েছি সুহৃদরূপে। কিন্তু একজন পাদ্রী যদি ভারতে যায়, আমাদের লোকেরা তার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে? তোমরা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করো না সে ম্লেচ্ছ! বৎস, কোনো ব্যক্তি, কোনো জাতি অপরের প্রাত ঘৃণা পোষণ করলে বেঁচে থাকতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ কথাটা আবিষ্কার করল ও অপর জাতির সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করল তখন থেকেই ভারতের ঘোর দুর্দিনের সূত্রপাত।'

আমেরিকাতে হাজার-হাজার মন্ত্রশিষ্য করেছেন স্বামীজি, আর সকলকেই প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছেন।

'লোকে বলে প্রণবে শূদ্রের অধিকার নেই।' কে একজন বলে উঠল: 'ওরা তো ম্লেচ্ছ, ওদের প্রণব কেমন করে দিলেন? ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারু অধিকার নেই প্রণবে।'

'যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয় তা তুই কেমন করে জানলি?' রুখে উঠলেন স্বামীজি।

'বা, ভারত ছাড়া আর ব্রাহ্মণ কোথায়? ভারত ছাড়া আর সবই তো যবন আর ম্লেচ্ছের দেশ।'

'আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি সকলেই ব্রাহ্মণ।' গম্ভীর হলেন

স্বামীজি : 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই। বাগবাজারে অঘোর চক্কোত্তির ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে ময়লার হাঁড়ি নিয়ে যায়। সেও তো বামুনের ছেলে।'

'কিন্তু আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কই ?'

'ব্রাহ্মণ জাতি আর ব্রহ্মণ্যগুণ দুটো আলাদা বস্তু। এদেশে সব জাতিতে ব্রাহ্মণ, ওদেশে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজ, তম তিনটে গুণ আছে তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবারও গুণ আছে।'

'তাহলে সাত্বিক ভাবের লোকদের আপনি ব্রাহ্মণ বলছেন ?'

'হ্যাঁ, তাই। যখন কেউ ভগবৎচিন্তায় বা ভগবৎপ্রসঙ্গে অবস্থান করে তখনই সে সাত্ত্বিক, তখনই সে ব্রাহ্মণ।'

'কিন্তু আমাদের কুলগুরুরা সেরকম দীক্ষাশিক্ষা দেন না কেন ?'

হাসলেন স্বামীজি। বললেন, 'আমাদের গুরুঠাকুর যে মন্ত্র দেন সেটা তো তার একটা ব্যবসা। আর গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা কি রকম ? ঠাকুর মশায়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, ওগো একবার শিষ্য-বাড়িটাড়ি যাও, পাশা খেললে কী আর পেট ভরবে ? গুরু বললেন, হ্যাঁগো, কাল মনে করিয়ে দিও, অমুকের বেশ ভাল সময় হয়েছে শুনছি।'

ওয়াশিংটন থেকে মেরি হেলকে স্বামীজি লিখছেন : 'ক'দিনের মধ্যেই ফিলাডেলফিয়াতে যাচ্ছি প্রফেসর রাইটের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে নিউইয়র্ক। তারপর কবার বোস্টনে যাওয়া-আসা। তারপর আবার ডেট্রয়েট হয়ে শিকাগো। তারপর ? তারপর ইংলণ্ডে।'

নিউইয়র্ক থেকে এলেন কেমব্রিজে, মিসেস বুলের বাড়িতে থেকে গেলেন কদিন। সেখানে মিসেস বুলের বৈঠকখানায় প্রথম ছাত্র পড়াতে শুরু করলেন। কত ছাত্রের কত দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা হতে লাগল। কোথাও ধূম্রজাল নেই, সর্বত্র স্বচ্ছ, নির্মুক্ত নীলাকাশ।

'রোজ সকালে বেদান্ত পড়াই ছাত্রদের। বেদান্ত থেকে অন্য সব বিষয়ও এসে পড়ে।' মেরি-হেলকে লিখছেন স্বামীজি : 'সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে, প্রায় বারোটা-একটা হয়ে যায়। একদিন স্প্যালডিংসদের

ওখানে খেতে বলেছিল। গিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে ওরা কী বিপদে ফেলেছিল, জানো? বললে, আমেরিকানদের সমালোচনা করে বক্তৃতা দাও, তাদের বিরুদ্ধে কী বলবার আছে বলো। আমি প্রথমটা রাজি হইনি, কিন্তু আমার কোনো প্রতিবাদেই ওরা কর্ণপাত করল না। বললে, তোমার চোখে যা দোষের বলে ঠেকেছে তা তুমি কেন দেখাবে না, কেন সুযোগ দেবে না সংশোধনের? ওদের অনুরোধের আতিশয্যে বললাম তারপর। নিশ্চয়ই আমার কথা ওদের ভালো লাগেনি, লাগতে পারে না। কেউ কি নিজের নিন্দা শুনে আনন্দিত হয়, নাকি নিজের দোষকে অবিমিশ্র দোষ বলে স্বীকার করে? তবু বললাম, ভয় পেলামনা আমার অনুভবে যা সত্য তা স্পষ্ট ব্যক্ত করতে পিছু হটি না কোনোদিন।'

ভারতীয় নারীর আদর্শ—এর উপর আরেক দিন বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। মেয়েদের অনুরোধে মেয়েদের সামনে বক্তৃতা। হিন্দু মেয়েদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব, তিতিক্ষা ও পবিত্রতার কথা জেনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সব হীন কথাই না এতদিন প্রচার করেছে মিশনারিরা। 'আর আমার যেটুকু উজ্জ্বলতা যেটুকু উন্নতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন', বললেন স্বামীজি, 'সব আমার মার জন্যে।'

বলে ভাষণের শেষে তাঁর মার উদ্দেশে প্রণাম করলেন স্বামীজি। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, অথচ নিজের মার প্রতি এত ভক্তি এত কাতর্য—বিদেশিনীর দল অভিভূত হল। স্বামীজির অগোচরে তারা স্বামীজির মাকে একখানা মাতা মেরী ও একখানা যীশুর ছবি পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে দিল একখানি পত্র। সে পত্র তাদের প্রণাম আর শ্রদ্ধার বাহন।

তুমিই বিশ্বজননী মেরী আর বিবেকানন্দ তোমারই নিষ্কিঞ্চন শিশু।

৬৩

নিউইয়র্ক ব্রুকলিনে পৌঁছলেন স্বামীজি। এথিক্যাল কালচার সোসাইটির নিমন্ত্রণে, যার সভাপতি হলেন ডক্টর লুইস জেনস, আলাপ হবার পর থেকে যিনি স্বামীজির আজীবন বন্ধু।

পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। মিস্টার হিগিনস যাকে স্বামীজি 'কাজের লোক' বলে আখ্যাত করেছেন, বক্তৃতার আগে স্বামীজি সম্বন্ধে এক পুস্তিকা বিলিয়েছেন শ্রোতাদের মধ্যে—দেখ, দেশে-বিদেশে বক্তার সম্পর্কে কী মহৎ ধারণা, বোঝো কে দাঁড়িয়েছে তোমাদের সামনে।

'ভারতের ধর্ম' এই বিষয় নিয়ে বলছেন স্বামীজি। লাল আলখাল্লা গায়ে, মাথায় হলদে পাগড়ি, পাগড়ির বাঁধন পেরিয়ে একগুচ্ছ কালো চুল বেরিয়ে এসেছে কপালে, ভরাট মুখমণ্ডল ভাবমহিমায় প্রদীপ্ত, দুই ভাষাভরা চোখে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার উৎসাহ, বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজিকে দেখাচ্ছিল দৈবপ্রেরিতের মত, যেন কোন পুরাণ-পুরুষ—আর কী গম্ভীরঝঙ্কৃত তাঁর কণ্ঠস্বর! কে বলবে ইংরিজি ভাষা তাঁর বিদেশী, যেমন নিখুঁত টান তেমনি নির্ভুল উচ্চারণ। অনর্গলতায় নির্ঝরপ্রপাতের মত। আর কথা শুধু কথা নয়, প্রেম আর প্রেম—শুধু প্রেমের নিরন্তর প্রস্রবণ। সম্ভ্রান্ত অথচ সরল, উত্তুঙ্গ অথচ কোমলতায় ভরা। কে না বুঝবে, কে না মানবে, কে না আমূল শিহরিত হবে!

বিষয়টা কী?

বিষয়টা জলের মতো সোজা। এক ধর্ম যদি সত্য হয় সব ধর্ম সত্য। এক পথ যদি পরমগন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে সব পথই পারবে।

দেশকাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে দেখলে সবই এক বলে মনে হয়। বলছেন স্বামীজি। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা, সেই অখণ্ডস্বরূপই বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছে বলে প্রতীত হয় তখন সে ঈশ্বর। আবার যখন ধারণা হয় এই দেহ বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে তার অবস্থান তখন সে আত্মা। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ, সে পুরুষ স্বয়ং সমস্ত সৃষ্টি, সমগ্র ও অবিভক্ত। সকল হাতে সে কাজ করছে, সকল মুখে খাচ্ছে, সকল নাকে শ্বাস নিচ্ছে, সকল মনে চিন্তা করছে। এই ব্রহ্মাণ্ডই তার শরীর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত জগৎই সে। সেই দেবতা, সেই মানুষ, সেই পশু, সেই উদ্ভিদ। যে অনন্ত পুরুষ তাকে কেন খণ্ড-খণ্ড দেখাচ্ছে এ

যদি প্রশ্ন করো তো বলি এ সব বিভাগ আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। অনন্তের বিভাগ হয় কী করে! অতএব আমি তুমি অংশ মাত্র এ ভাবনা সত্য নয়। আমি মনও নই দেহও নই, আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমিই সেই আমিই সেই। এ জ্ঞানই জ্ঞান, আর বাকি সব অজ্ঞান, অজ্ঞানের ফল। আমি আবার কী জ্ঞান লাভ করব! আমিই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার কী জীবন লাভ করব? আমিই স্বয়ং প্রাণ-স্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ প্রকাশ মাত্র। আমি জীবিত, কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ। এমন কোনো বস্তু নেই যা আমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নয়। কে মুক্তি চায়? কেউ-ই মুক্তি চায় না। আমি স্বয়ং মুক্তিস্বরূপ।

ধর্মের ক্লাশ প্রথম খোলা হল নিউইয়র্কে, একটা বাড়ির যে তেতলার ঘরে স্বামীজি থাকতেন সেই ঘরে। ব্রুকলিনে তাঁর বক্তৃতা শোনা মেয়ে-পুরুষেরাই তাঁর প্রথম ছাত্র। আর তাদের মধ্যে মিস ওয়ালডো, যার হিন্দু নাম হল হরিদাসী, সকলের অগ্রণী। মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন স্বামীজি, ছাত্র-ছাত্রীরাও তথৈবচ। ঘরের দরজা অবারিত খোলা, যে কেউ চলে আসতে পারে নির্ভয়ে। দলে-দলে আসতে লাগল জিজ্ঞাসু-পিপাসুরা, কিন্তু ঘরে যে আর তিল ধারণের স্থান নেই। না থাক, আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনব।

'ধর্ম কি আর ভারতে আছে?' পত্রে লিখছেন স্বামীজি: 'জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎ-মার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান। এখন ব্রহ্ম হৃদয়ে নেই গোলোকে নেই সর্বভূতেও নেই, এখন তিনি ভাতের হাঁড়িতে। আগে মহতের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভুবনমুপকার-শ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ', এখন হচ্ছে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া ধরো হামারা পায়েরকা নিচে।

'ঘরে ফিরে এস।' কোথায় ঘর? আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব। বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ, বসন্তের মত লোকের কল্যাণ আচরণই আমার ধর্ম। অলস নিষ্ঠুর নির্দয় স্বার্থপর

ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। না, কিছুতে না। টাকায় কিছু হয় না, নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায়ও তথৈবচ, একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নর বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।'

স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখছেন :

'প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করে মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম। সেই স্রোতকে প্রবল করা হোক, তবেই পার্শ্ববর্তী শাখাস্রোতগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বহমান হবে।

এই দেশে আমার অনেক কাজ আছে। কেবল এদেশেই সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার ভাববিস্তার ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি এখানে। এখন আমার ইচ্ছে ভারতেও একটা চেষ্টা হোক। যা দেখছি একমাত্র মাদ্রাজেই কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা। অনেক উৎসাহী যুবক আছে সেখানে, সকলকে আপনার কাছে সমর্পণ করছি। যদি আপনি এদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চিত ধারণা, ওরা সফলকাম হবে। আমি জানিনা কবে আমি ভারতে ফিরব। প্রভু যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলছি। আমি তাঁর হাতে।

এ জগতে ধন খুঁজতে গিয়ে, হে প্রভু, তোমাকেই একমাত্র ধন পেলুম। হে প্রভু, তোমার কাছে আমি নিজেকে বলি দিচ্ছি। ভালোবাসার পাত্র খুঁজতে গিয়ে তোমাকেই পেয়েছি একমাত্র ভালোবাসার পাত্র। আমি নিজেকে বলি দিলুম তোমার কাছে।'

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি :

বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদি ছিলেন আর সিদ্ধার্থ ছিলেন হিন্দু। ইহুদিরা যীশুকে পরিত্যাগ করেছিল, শুধু তাই নয়, ক্রুশবিদ্ধও করেছিল। আর হিন্দুরা? সিদ্ধার্থকে গ্রহণ করল, শুধু তাই নয়, তাকে পুজো করল অবতাররূপে।

বুদ্ধ পূর্ণ করতে এসেছিলেন ধ্বংস করতে আসেননি। তিনি ছিলেন মহাবৈদান্তিক, কারণ, আসলে, বৌদ্ধ ধর্ম বেদান্তের শাখা বা প্রশাখা মাত্র। তাই শঙ্করকে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করলেন আর শঙ্কর করলেন সমন্বয়।

বেদ, বর্ণ, পুরোহিত বা প্রথা কোনো কিছুর কাছেই মাথা নোয়ায়নি বুদ্ধ। যতদূর যুক্তি নিয়ে যেতে পারে ততদূর তিনি গিয়েছেন নির্ভয়ে। এরূপ নির্ভীক যুক্তিনিষ্ঠ সত্যসন্ধানী, এরূপ জীবপ্রেমিক আর কোথায় পৃথিবীতে!'

বুদ্ধের হৃদয়ের দিকে তাকাও। একটা ছাগশিশুর প্রাণ বাঁচাতে তিনি অকাতরে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেখ কী তাঁর বিশালপ্রাণতা, তাঁর অমেয় করুণা!

কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন বুদ্ধ। 'আপনারা কেউ কি ব্রহ্মকে দেখেছেন?'

ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, না।

আপনাদের পিতারা দেখেছেন?

তারাও না।

কিংবা আপনাদের পিতামহেরা?'

না, সম্ভবত, তারাও না।

যাকে আপনারা বা আপনাদের পিতারা বা পিতামহরা দেখেননি তার স্বরূপনির্ধারণে আপনারা এত ব্যস্ত কেন? প্রশ্ন করলেন বুদ্ধ।

সকলে চুপ করে রইল।

এত বড় নীতিমান মানুষ আর আসেনি। সাকার ঈশ্বরে বা জীবাত্মায় বিশ্বাসী নন, সে বিষয়ে প্রশ্নও করেননি, সম্পূর্ণ সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সারা জীবন অপরের কল্যাণচিন্তায় অভিভূত। বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় তাঁর জন্ম। নিজের মুক্তির জন্যে ধ্যান করতে বসেননি, নিজের জন্যে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না,—জগতে এত দুঃখ কেন তারই আবিষ্কারে, তারই প্রতিকারে তাঁর সাধনা। কী অপূর্ব তাঁর বাণী। সমস্ত স্বার্থপরতা পরিহার করো। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও। তা'হলেই আত্মজয়ে সমর্থ হবে। জগজ্জয়ের চেয়ে আত্মজয় বড়।

ভালো হও আর ভালো করো এই হল বুদ্ধের মর্মকথা। মৃত্যুকালে বললেন, মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারক। আর অন্য কেউ উদ্ধারক

নেই। কী অভয়সংবাদ! মহত্তম কর্মযোগী বুদ্ধ। যেন একই কৃষ্ণ নিজেই নিজের শিষ্যরূপ দেখাতে এলেন, কী ভাবে তাঁর বাণী জীবনে *কর্মায়িত করতে হয়। একমাত্র সেই ধার্মিক হতে পারে, যে সাহস* করে বলতে পারে, যা শক্তিশালী বুদ্ধ একদা বোধিবৃক্ষতলে বলেছিলেন,-ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—

সামাজিক সাম্যই বুদ্ধের অসামান্য অবদান। সংস্কৃতে নয় জনগণের ভাষায় কথা বলেছেন; চতুর্দিকে শুধু মৈত্রী প্রচার করলেন। দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ শুধু মৈত্রীতে ধর্মান্তরিত করলেন। বুদ্ধ-বাণীতে আছে কী ভাবে উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে ঊর্ধ্বে নিম্নে মৈত্রীধারা প্রেরণ করলেন বুদ্ধ, যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব এই মৈত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। শুধু মৈত্রীতেই ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ।

'কোনো ধর্মগ্রন্থে আস্থা রেখো না।' বললেন বুদ্ধ, 'বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অমূলক। যজ্ঞ ও প্রার্থনা নিরর্থক। প্রপঞ্চাতীত নিত্য সত্তা বলে কিছু নেই। শুধু পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চই আমরা দেখতে ও জানতে পারি। তদতিরিক্ত সত্তাস্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন।' যে কোনো ধর্মগুরুর চেয়ে বুদ্ধ সাহসী ও একনিষ্ঠ। বুদ্ধই প্রথম মানুষ যিনি জগৎকে সম্পূর্ণ নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। বুদ্ধ ভালোর জন্যেই ভালো ছিলেন, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসতেন সকলকে, সমস্ত প্রাণিলোককে।'

আরো-আরো বলছেন স্বামীজি :

'গৌতম বুদ্ধের শিষ্যেরা বেদের সনাতন ভিত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, কিন্তু পারলেন না ভাঙতে। অন্য দিকে তাঁরা ধর্ম থেকে শাশ্বত ঈশ্বর তুলে ফেলে দিলেন। সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক হিন্দু নরনারী প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। তার ফল হল এই যে বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুবরণ করলে।

বেদান্তের নেতিবাদকেই অবলম্বন করল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু তার শেষ সীমা পর্যন্ত গেল না। মহাযানী বৌদ্ধদের অধিকাংশই মুক্তিবাদী এবং বস্তুত বেদান্তী। হীনযানীরা শূন্যবাদের ভক্ত। যদি বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাস না করে তা'হলে কি করে তাদের ধর্ম ইন্দ্রিয়াতীত

নির্বাণাবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়? তারাও তাই এক সনাতন নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম মানতে বাধ্য হয়েছে। সেই নৈতিক নিয়ম যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধ সেই নিয়ম প্রত্যক্ষ করলেন, আবিষ্কার করলেন। তুরীয় ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই নির্বাণ। বোধিবৃক্ষ-তলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সাধারণত চিত্রিত হন। ইন্দ্রিয়মনাতীত অবস্থায় পৌঁছে তিনি সদ্ধর্ম প্রত্যক্ষ করলেন, শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি বিচার দিয়ে নয়।

বুদ্ধই বেদান্তকে অরণ্য থেকে সমাজে নিয়ে এলেন আর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন। বেদান্তের নীতি-অংশের উপরই তিনি জোর দিলেন আর শঙ্কর দার্শনিক অংশ সমৃদ্ধ করলেন। ধর্ম ব্যতীত ঐহিক বিদ্যা বিপজ্জনক। বৃহৎ বৌদ্ধ আন্দোলনও অংশত এই জন্যে নিষ্ফল হল। ধর্মজীবনে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ তা স্বীকার করল না, প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে করল না সমন্বয়। কিন্তু ভারতে উপনিষদকে অমান্য করে কোনো ধর্ম টিকতে পারে না। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় ভারতভূমি থেকে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বহিষ্কৃত হল।

সাকার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যে নিরন্তর প্রতিবাদ করলেন তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে সৃষ্টি হল মূর্তিপূজা। বেদে মূর্তিপূজা নেই। কারণ ঋষিরা সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধ কর্তৃক অস্বীকৃত হওয়ায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া সুরু হল আর তার ফলে দেখা দিল অসংখ্য মূর্তি। যে বুদ্ধ ও যীশু ঈশ্বরের মূর্তি মানলেন না তাঁদেরই মূর্তি পূজিত হতে লাগল। মূর্তিপূজার সীমা কাষ্ঠ ও প্রস্তর থেকে যীশু ও বুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। ধর্মজগতে মূর্তিপূজা থাকবেই থাকবে।'

মিস জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড এসেছে স্বামীজির ক্লাসে। এক-আধদিন নয়, নিয়মিত।

'কোত্থেকে আস তুমি?' একদিন জিগগেস করলেন স্বামীজি।

'হাডসন থেকে।'

'সে তো অনেক দূর। তাই নয়?'

'হ্যাঁ, প্রায় মাইল তিরিশ।'

'এত দূর থেকে আস?'

হাসল ম্যাকলিয়ড। বললে, 'আপনাকে দেখতে আপনাকে শুনতে আরো অনেক দূর থেকে আসতে পারি।'

মিসেস রোয়েথলিস বার্জার অধ্যাত্মবাদী মানুষ, মিস ম্যাকলিয়ডের সঙ্গী। একদিন দু'জনে স্বামীজির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল: 'একটা জিনিস শেখাবেন আমাদের?'

'কী—'

'কী করে ধ্যান করতে হয়? কী প্রতীক অবলম্বন করব?'

'ওঁ চিন্তা করো।' বললেন স্বামীজি, 'সাত দিন পরে আবার এস।'

সাত দিন পরে হাজির দুজনে।

'কী, কেমন দেখছ?' জিগগেস করলেন স্বামীজি।

'একটা জ্যোতি দেখছি।' বললে মিসেস বার্জার।

স্বামীজি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: 'খুব ভালো কথা। কোথায় দেখছ সেই জ্যোতি।'

'বুকের মধ্যে। হৃদয়ের মধ্যে।'

'খুব ভালো। লেগে থাকো, লেগে থাকো।' অভয় আশ্বাস স্বামীজির কণ্ঠে।

ম্লান-মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকলিয়ড। মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কী হবে? আমি অত্যন্ত পার্থিব, অধ্যাত্মভাব নেই বোধহয় আমাতে।'

'বাজে কথা। পৃথিবীতে সব কিছুই আধ্যাত্মিক।' সাহসে উদ্ভাসিত হলেন স্বামীজি: 'সব সময়ে ভাববে তুমি দৈবাৎ আমেরিকান, তুমি দৈবাৎ স্ত্রীলোক, আসলে, অপরিবর্তনীয়রূপে তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি ঈশ্বর। দিনরাত নিজেকে তাই বলো, নিজেকে তাই বোঝাও। কখনো, একমুহূর্তের জন্যেও তোমার স্বরূপ ভুলে যেও না, ভুলে যেও না তুমি কে, তোমার পরিচয় কী!'

স্বামীজির সমস্ত উপস্থিতিই এক মহান উদ্দীপনা—ম্যাকলিয়ডের মধ্যে জ। ল সেই স্বরূপবোধের শক্তি। লিখছেন ম্যাকলিয়ড: 'একমাত্র শক্তিমানই সঞ্চার করতে পারেন সেই চেতনা, যেমন একমাত্র ধনীই

দিতে পারে টাকা। নইলে দান তুমি শুধু কল্পনা করতে পারো, কাজে দেখাতে পারো না।'

'আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ।' বলছেন স্বামীজি, 'প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেটা সত্য কিনা। যদি কোনো ধর্মাচার্য বলে, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোনোকালে পারবে না, তার কথা বিশ্বাস কোরো না। কিন্তু যে বলে, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারবে, কেবল তার কথা বিশ্বাস করবে।'

'যেমন ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটা নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কার উত্তর-অরণি আর ধ্যান মন্থনস্বরূপ। তা হলেই আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি আছে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্যা দ্বারা এইটে করতে হয়। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে মনে ঢুকিয়ে দাও। তারপর ধারণার সাহায্যে মনকে ধ্যানে স্থির করো। যেমন দুধের মধ্যে সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে।'

নারসিংহাচারিয়ারকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে সে দিকে আর কান দিও না। সিংহবিক্রমে কাজ করে যাও. প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমার যত দিন না দেহত্যাগ হচ্ছে নিরন্তর কাজ করে যাব—আর মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্যে কাজ করতে থাকব। অসত্যের চেয়ে সত্য অনন্তগুণে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি অসাধুতার চেয়ে সাধুতা।

খবরের কাগজে হুজুগ করে ওরা আমাকে কতটা বাড়াবে? এদের উপর আমার প্রভাব এমনিতেই বেড়ে চলেছে দিন-দিন। গোঁড়ারা অবশ্য চেষ্টা করেছে আমার প্রভাব কমাতে, কিন্তু, প্রভু বলছেন, তারা পেরে উঠবে না।

কী করে পারবে? এ যে চরিত্রের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, সত্যের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব। যতদিন ওগুলো আমার থাকবে ততদিন কোনো চিন্তা নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে, কেউ আমার মাথার একটি চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কী হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়—সেই ভাষার ভিতর দিয়েই সেই ব্যক্তি ভাববিদ্যুৎপ্রবাহ অপরের প্রাণে সহজেই সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা তো এখনো ছেলেমানুষ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ করো, কাজ করো, কাজ করো। বাজে বকুনি ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রভুর কথা কও।

শত-শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই, তাদের দেখতে চাই। তোমরা তো ওরকম কাউকে আমার কাছে এনে দিতে পারোনি—শুধু আমাকে নাম-যশ এনে দিয়েছ। নাম-যশ আমার কী হবে? নাম-যশ চুলোয় যাক, শুধু কাজে লাগো। সাহসী যুবকের দল, শুধু কাজে লাগো। আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলছে তার সংস্পর্শে তোমাদের হৃদয় এখনো অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি? এখনো আলস্য ও ভোগের পুরোনো পথেই চলেছ? দূর করে দাও আলস্য, দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো আর যত পারো মানুষকে নিয়ে এস ভগবানের দিকে।

যে আগুনে আমি জ্বলছি সে আগুনে তোমরাও জ্বলো, তোমাদের মন-মুখ এক হোক, ভাবের ঘরে ভুলেও যেন চুরি না করো, আর জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে মরো বীরের মত—অহর্নিশ এই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।'

পরে আবার লিখছেন আলাসিঙ্গাকে :

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে কলকাতায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল, ভালো কথা; কিন্তু তাদের প্রত্যেককে একটা করে পয়সা সাহায্য করতে বলো তো, বেমালুম সরে পড়বে। বালকের মত পরের উপর নির্ভর করে থাকাই আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রের

লক্ষণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয় তারা খুব খেতে প্রস্তুত, আবার কাউকে সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরো ভালো হয়। আমেরিকা তোমাদের কোনো টাকা পাঠাতে পারবে না, কেনই বা পাঠাবে? যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে না পারো তবে তো তোমরা বাঁচবারই যোগ্য নও। তুমি যে লিখেছ, আমেরিকার কাছ থেকে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিন্ত ভরসা করা যেতে পারে কিনা তাই পড়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়েছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকা তোমাদের নিজেদেরই যোগাড় করতে হবে।

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি। এ আস্তে আস্তে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শেখাবার জন্যে মাদ্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। কলেজের মুখপত্রস্বরূপ ইংরিজি ও দিশি ভাষায় কাগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানা। এর মধ্যে একটা কিছু করো—তা'হলে জানব তোমরা কিছু করেছ—শুধু আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

আমি দেখতে চাই আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশের সঙ্গে গুরুটিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে—শেষকালে গুরুটিকে রেখে তার ভাবগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা এ রকম কাজ না করে সর্বক্ষণ থাকতে হবে সতর্ক।'

৬৪

মিসেস বুলের বাবার খুব অসুখ।

মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি :

'সবাই ভেবেছিল ব্রুকলিনের অধিবাসীরা প্রাচ্য দর্শন কিছু বুঝতে

পারবেনা। তোমায় কী-বলব, ব্রুকলিনের প্রায় আটশো লোক, সবাই সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ, আমার গত রবিবারের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল, আর যারা ফল সম্বন্ধে আগে সন্ধিহান ছিল, এখন তারাই আমাকে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার কথা ভাবছে। যা সম্বর্ধনা পেলাম ব্রুকলিনে তা আশাতীত। এ আমার প্রভুর আশীর্বাদ ছাড়া আর কী! কিন্তু মিস থার্সবির নিউইয়র্কে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানে আমার যাওয়ার তারিখ ঠিক হতে পাচ্ছেনা। যিনি এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী তিনি মিস ফিলিপস, আর তাঁর সমস্ত কাজে মিস থার্সবিই দক্ষিণহস্ত।

সবচেয়ে বড় কথা, ডক্টর জেনস যোগ দিয়েছেন সম্বর্ধনায়।

আমি এখানে একটা নতুন গাউন কেনবার চেষ্টায় আছি। বারে বারে ধোয়ানোতে পুরোনো গাউনটা কুঁচকে গেছে, ওটা পরে আর বেরুনো যায়না।

আশা করি আপনার বাবা ভালো হয়ে উঠছেন।

মিস্টার ও মিসেস গিবনসকে, মিস ফার্মার আর মিস কুরিংকে আমার ভালোবাসা দেবেন। ব্রুকলিনে দেখা হয়েছিল মিস কুরিং-এর সঙ্গে। ইতি। স্নেহের বিবেকানন্দ।'

মিসেস বুলের বাবা মারা গেলেন।

খবর পেয়ে স্বামীজি লিখছেন মিসেস বুলকে :

'আসা যাওয়া ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনো আসেও না, যায়ও না। যখন সমস্ত দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন আর জায়গা কোথায় যে আত্মা সেখানে যাবে? যখন সমস্ত কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন ওর মধ্যে ঢোকবার বা ওকে ছাড়বার সময়ই বা কোথায়।

পৃথিবী ঘুরছে আর তার ঘোরাতেই এই ভুল হচ্ছে যে সূর্য ঘুরছে। কিন্তু আসলে সূর্য ঘুরছে না। তেমনি প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর উন্মোচন করছে আবরণ, মহান গ্রন্থের পাতা উলটে যাচ্ছে ক্রমাগত, কিন্তু সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী হয়ে বিরাজ করছেন, বিভোর হয়ে আছেন আত্মজ্ঞানের অমৃত পান করে।'

আরো লিখছেন :

ঈশ্বর প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, যথার্থস্বরূপ. প্রত্যেকের প্রকৃতব্যক্তিত্ব। কতকগুলো জীবাত্মারূপ তারা আমাদের দৃষ্টির অতীত দেশে চলে গিয়েছে, তাঁদের খুঁজতে গিয়েই আমাদের ধর্মের আরম্ভ হয়েছে। আর এই খোঁজ তখুনি শেষ হল যখন তাঁদের সকলকে ভগবানের মধ্যেই পেলাম। শুধু তাঁদের নয় আমাদেরকেও পেলাম। সুতরাং আসল কথা হচ্ছে যে, আপনার বাবা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন তা ত্যাগ করেছেন আর অনন্ত কাল যেখানেই ছিলেন সেখানেই রয়ে গেছেন।'

ক্যাটসকিল অঞ্চলে একশো এক একর জমি পাওয়া যায়, মাত্র দুশো ডলারে। স্বামীজির ইচ্ছে সে জমিটা কিনে নেন। নিজের নামে তো কিনতে পারেন না, তাই মিসেস বুল যদি রাজি হন, কেনা যায় তাঁর বেনামিতে। মিসেস বুলের মত আর কে আছেন বন্ধু ?

লিখছেন নিউইয়র্ক থেকে :

'প্রাণ ঢেলে খেটেছি। যদি আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ কিছু থেকে থাকে তবে কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি সর্বভাবেই নিশ্চিন্ত। বক্তৃতা আর অধ্যাপনাতেও আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ডে যাব ভাবছি। সেখানে কয়েক মাস কাজ করবার পর ভারতে ফিরে গিয়ে কয়েক বছর—কে জানে, হয়তো বা চিরতরে—গা ঢাকা দেব। আমি যে নিষ্কর্মা সাধু হয়ে থাকিনি এই আমার তৃপ্তি। আমার একটি খাতা আছে, আমার সঙ্গেই সে ঘুরছে, কখনো-কখনো ও আমার মনের কথা ধরে রাখে। দেখতে পাচ্ছি, সাত বছর আগে সে-খাতায় লেখা রয়েছে—'এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকব।' তা আর হল কই, এ সব কর্মভোগ যে বাকি ছিল! আমার বিশ্বাস এবার কর্মক্ষয় হয়েছে, ভগবান আমাকে প্রচারকার্য তথা শুভকর্মের বন্ধনবৃদ্ধি থেকে অব্যাহতি দেবেন।

আত্মাই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ, আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে আর কি কোনো যুক্তি বা বাসনা মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হতে

পারে ? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার করা ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোনো সার্থকতা নেই এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস এখন দৃঢ়ীভূত।'

একাকী বিচরণ করো, একাকী বিচরণ করো। স্বামীজির এখন আবার সেই আকৃতি। 'নিরবচ্ছিন্ন চিরপ্রশান্তি আর বিশ্রামের জন্যে আমার হৃদয় তৃষিত।' সেই তো ভগবানের প্রিয় যে কাউকে উদ্বিগ্ন করেনা, যাকে কেউ বা পারেনা উদ্বিগ্ন করতে। যে একাকী থাকে তার সঙ্গে কারু বিরোধ নেই। 'হায় যদি পেতাম আবার সেই কৌপীন আর কমণ্ডলু, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই তরুতলে শয়ন আর ভিক্ষান্নে জীবিকা।' লিখছেন ওলি বুলকে : 'আসলে ও সবই এখন আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু। শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতবর্ষই একমাত্র স্থান যেখানে মানুষ মুক্তির সন্ধান ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের আড়ম্বর অন্তঃসারশূন্য ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ। জীবনে আর কখনো এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন, সকলেই মায়ামুক্ত হোন, এই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা।'

নিউইয়র্কে ল্যাণ্ডসবার্গের বাড়িতে আছেন স্বামীজি, ৩৩ নং রাস্তা, পশ্চিমে ৫৪ নং বাড়ি। কখনো বা গার্নিদের বাড়িতে শুতে যান। কখনো বা নিজের হাতেই রান্না করে খান। যদি কেউ দেখা করতে আসে তবেই কিছু বলেন ঈশ্বরকথা। 'এইরকম ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর ভাবে দিন কাটাচ্ছি, আমেরিকায় এসে পর্যন্ত এমনটি আর অনুভব করিনি।'

লিওন ল্যাণ্ডসবার্গ, রাশিয়ান ইহুদী, নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ দৈনিক-পত্রের সহকারী সম্পাদক, স্বামীজির শিষ্যত্ব নিয়ে নাম নিল কৃপানন্দ স্বামী আর ফরাসিনী মারি লুইস নাম নিল স্বামী অভয়ানন্দ। তা ছাড়া ঠিক সন্ন্যাস না নিলেও স্বামীজির ভক্ত হয়ে দাঁড়াল অগণন গুণী-জ্ঞানী, ডক্টর আলান ডে, ডক্টর স্ট্রিট, প্রফেসর ওয়াইম্যান আর রাইট আর জেমস, মিঃ আর মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট, মিস ম্যাকলিয়ড, বৈজ্ঞানিক

নিকোলাস টেসলা, গায়িকা মাদাম কালভে আর অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড—'ডিভাইন সারা।' আরো কত ভক্ত মুগ্ধ অনুরক্ত।

বিরুদ্ধকারীরাও নির্মূল হচ্ছে না। সেদিন মিস থার্সবির বাড়িতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমুল তর্ক হল স্বামীজির। শেষকালে ভদ্রলোক গালাগাল দিতে শুরু করল। স্বামীজিও ক্রুদ্ধ-কর্কশ হয়ে উঠলেন। দীনহীনের মত হার স্বীকার করলেন না।

মিসেস বুল ভর্ৎসনা করলেন স্বামীজিকে। তর্ক করা কি তোমার কাজ? না কি উদ্ধতকে শাসন করা? এ সব বিবাদ-বিরোধ তোমার পক্ষে তোমার কাজের পক্ষে হানিকর। যখন হাতি বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যায় পিছু-পিছু কুকুর চেঁচায় কিন্তু হাতি ফিরেও তাকায় না।

'সেই তর্ক ও ভর্ৎসনার ফলে আমি স্পষ্ট বুঝেছি প্রভু কেন সন্ন্যাসীদের একা থাকতে একা চলতে বলে গেছেন।' মিস মেরি হিলকে লিখছেন স্বামীজি : 'বন্ধুত্ব, বা ভালোবাসা মাত্রই বন্ধন—বন্ধুত্বে, বিশেষত স্ত্রীলোকদের বন্ধুত্বে চিরকালই দেহি-দেহি ভাব। যাকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির দিকে বারে বারে ফিরে-ফিরে তাকাতে হয়, সে কি করে সত্যরূপ ঈশ্বরের সেবা করবে? হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তা হলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। জীবন কিছুই নয়, মৃত্যুও ভ্রমমাত্র। এই সব যা কিছু দেখছ কারুই কোনো অস্তিত্ব নেই, আছেন বলতে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পেয়ো না, নিঃসঙ্গ হও। বিবিক্তসেবী হও।

বোন, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, আবার সন্ধেও আসছে ঘনিয়ে। আমাকে শিগগিরই ঘরে ফিরতে হবে। আমার আর আদবকায়দা পরিপাটি করবার সময় নেই। আমি যা বলতে এসেছি তাই যেন বলে যেতে পারি।'

আরো লিখছেন :

'ধর্মের নামে দোকানদারিকে আমি ঘৃণা করি। সংসারের ক্রীতদাসেরা কী বলছে তা দিয়ে আমি বিচার করব? বোন, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ সে মন্দির,

ধর্মমত, ঋষি বা শাস্ত্র কারুরই ধার ধারে না। তাই মিশনারিরা যথাসাধ্য চেঁচাক, যথাসাধ্য কাদা ছুঁড়ুক, আমি তাদের গ্রাহ্য করি না। আমাদের ভর্তৃহরি বৈরাগ্যশতকে কী বলছেন? বলছেন, এ কি চণ্ডাল, না ব্রাহ্মণ, না শূদ্র, না তপস্বী, না বা তত্ত্বজ্ঞানী কোনো যোগীশ্বর? নানা জনে নানা কল্পনা-জল্পনা করছে, কিন্তু যে যাই বলুক আর ভাবুক, যোগীরা আপনমনে চলে যায়, তারা রুষ্টও হয় না। তুষ্টও হয় না।'

চিঠি শেষ করছেন এই বলে :

'ঈশ্বর তোমাদের কৃপা করুন। এই জগৎ নামক বৃহৎ ভুয়োবাজির থেকে রক্ষা করুন তোমাদের। তোমরা যেন এই জগৎরূপ জীর্ণ ডাইনির কুহকে না পড়ো। শঙ্কর তোমাদের সহায় হোন। উমা তোমাদের সামনে সত্যের দুয়ার খুলে দিন। তোমাদের সকল মোহ অপনোদন করুন।'

হে শিব, হে জগদ্দীপাকার, হে নৃকরোটিপরিকর, তোমার আট নাম। ভব, শর্ব, রুদ্র, উগ্র, পশুপতি, মহাদেব, ভীম আর ঈশান। প্রত্যেকটির নামের তাৎপর্য বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন বেদের প্রয়োজন। হে সকলগুণবরিষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নেদিষ্ঠ, নিকটস্থ, তোমাকে নমস্কার। তুমি দবিষ্ঠ, দূরস্থ, তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর, তুমি ক্ষোদিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম; তুমি মহিষ্ঠ, তুমি মহত্তম, তোমাকে নমস্কার। হে প্রচণ্ডতাণ্ডব, তুমি বর্হিষ্ঠ, বৃদ্ধতম, তুমি যবিষ্ঠ, যুবতম, তোমাকে নমস্কার। হে শবভস্মবিলোপন, দারিদ্র্যদুঃখদহন, তোমাকে নমস্কার।

হে মা উমা, আমি মন্ত্র জানিনা, যন্ত্র জানিনা, স্তব জানিনা, আহ্বান জানিনা, স্তুতিকথা জানিনা, মুদ্রাবিধি জানিনা, বিলাপ করতেও জানিনা, শুধু এইটুকু জানি তোমার অনুসরণই আমার ক্লেশহরণ।

হে সকলোদ্ধারিণি শিবে, আমি অর্চনা জানিনা। শুধু তাই নয়, আমি নিরর্থক আলস্যহেতু কর্তব্যানুষ্ঠানেও অশক্ত, মা, আমাকে ক্ষমা করো। কুপুত্র হতে পারে কুমাতা হয় না। হে শশিমুখি, আমার মোক্ষকামনা নেই বিভববাঞ্ছা নেই, নেই সুখেচ্ছা বা বিজ্ঞানাপেক্ষা। হে জননী, মৃড়ানী রুদ্রানী শিবানী ভবানী—তোমার এই সব নাম করেই যেন এ জন্ম চলে যায়। হে করুণার্ণবেশ্বরী, আমি বিপদ সাগরে

মগ্ন হয়ে তোমাকে স্মরণ করছি। ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত সন্তানই মাকে স্মরণ করে।

মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধি প্রশস্তাং।

হে বিশ্বমূর্তে, আত্মন, তুমি কাঁদছ কেন? কিন্নাম রোদিষি ত্বন্নি বিশ্বমূর্তে। তোমাতেই সর্বশক্তি বর্তমান। তোমাকে কোন সীমা আবদ্ধ করবে? আমন্ত্রয়স্ব ভগবন অখিল তোমার পাদমূলে। নির্গচ্ছতু জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব। কেশরী। সমস্ত অখিল তোমার পাদমূলে। নির্গচ্ছতু জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। সংসারজাল ছিঁড়ে পিঞ্জরমুক্ত কেশরীর মত বেরিয়ে এস।

বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালকে লিখছেন স্বামীজি নিউইয়র্ক থেকে:

পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁকে যাই ভাবি, ত্বনিয়া তা ভাববে কেন? এবং সেটা চাপাচাপি করলে সব ফেঁসে যাবে। গুরুপূজার ভাব বাঙলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর নেই, অন্য লোকে সে ভাব নেবার জন্যে প্রস্তুত নয়।

সে সব দিনের কথা মনে পড়ে।

গিরিশ ঘোষকে বললে ডাক্তার সরকার, 'আর সব করো কিন্তু দয়া করে ঈশ্বর বলে পূজা কোরোনা। এমন ভালো লোকটার মাথা খাচ্ছ তোমরা।'

'কিন্তু কি করি?' গিরিশ বললে তন্ময়স্বরে, 'যিনি সংসারসমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার করলেন তাঁকে আর কি করব বলুন।'

'বা, আমি কি আর এঁর পায়ের ধুলো নিতে পারিনা? খুব পারি। এই দেখ নিচ্ছি।' বল নত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিল ডাক্তার।

'দেবতারা এই মুহূর্তে স্বর্গ থেকে ধন্য ধন্য করছেন।' গিরিশ বললে উদ্বেল হয়ে।

'তা পায়ের ধুলো নেওয়া, এ আর বেশি কি কথা। আমি সকলেরই পায়ের ধুলো নিতে পারি। এই দাও। এই দাও' সকলের পায়ের কাছে প্রণত হতে লাগল ডাক্তার।

নরেন বললে, 'এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। নরলোক

ও দেবলোক এ দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন ইনি মানুষ না ঈশ্বর।'

'ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।'

'আমি ঈশ্বর বলছি না, ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি বলছি।' নরেন বললে দৃঢ়স্বরে।

'ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়।' বললে ডাক্তার, 'প্রকাশ করা ভালো নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। সবাই আমাকে কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমাকে জুতো মেরে তাড়াবে।'

'সে কি?' শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন : 'তোমাকে এরা কত ভালোবাসে। তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে।'

'সকলেই প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে আপনাকে।' বললে গিরিশ।

'কিন্তু আমার ছেলে, আমার স্ত্রী পর্যন্ত, আমাকে মনে করে, হার্ড-হার্টেড, দয়ামায়াশূন্য।' বললে ডাক্তার, 'কেননা আমার দোষ এই যে আমি কারু কাছে ভাব প্রকাশ করি না।

'তবেই বুঝুন একটু-আধটু প্রকাশ করা ভালো, নইলে দেখছেন তো, লোকে ভুল বোঝে।' গিরিশ টিপ্পনী ঝাড়ল।

'বলবো কি।' ডাক্তার প্রায় বিহ্বল হলেন : 'তোমাদের চেয়েও বেশী আমার ভাব হয়।' নরেনকে লক্ষ্য করল ডাক্তার : 'একলা একলা বসে কাঁদি। আই শেড টিয়ার্স ইন সলিটিউড।'

কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সবাই।

ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণকে বললে, 'ভাব হলে তুমি লোকের গায়ে পা দাও এটা ভালো নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আমি কি জানতে পারি গা কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা।'

'না, ওটা যে ভালো নয় এটা তো অন্তত বোঝ।'

'ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, 'কি হয় তোমাকে কি বলব। সে অবস্থার পর মনে হয়, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্যে।'

'যাক, মেনেছেন।' যেন আশ্বস্ত হল ডাক্তার : 'কাজটা যে অন্যায় এ জ্ঞান আছে। দুঃখ প্রকাশ করছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নরেনকে বললেন, 'তুই তো খুব বুদ্ধিমান, তুই বল না, একে দে না বুঝিয়ে।'

নরেনের আগে গিরিশই এগিয়ে এল। বললে, 'আপনার ভুল হচ্ছে মশাই। মোটেই উনি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন না। এঁর দেহ শুদ্ধ, পাপস্পর্শহীন। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্যে জীবকে স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার সম্ভাবনা, কখনো কখনো সেই কথাটা ভাবেন। আপনার যখন কলিক হয়েছিল তখন কি আপনার দুঃখ হয়নি কেন রাত জেগে অত পড়তুম! তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্যে দুঃখ-কষ্ট হতে পারে, তাই বলে জীবের মঙ্গল করবার জন্যে স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ বলবেন না।'

ডাক্তার অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'তোমার কাছে হেরে গেলুম। দাও পায়ের ধুলো দাও।' গিরিশের পা ছুঁলো ডাক্তার : 'আর যাই হোক, তোমার বুদ্ধিকে মানতে হবে।'

'আর এক কথা দেখুন।' বললে নরেন, 'একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে আপনি আপনার জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে শরীরের অসুখ-বিসুখ কিছুই মানেন না। তেমনি ঈশ্বরকে জানা শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান, গ্র্যাণ্ডেস্ট অফ অল সায়েন্সেস, তার জন্য ইনি হেলথ রিস্ক করবেন না? শরীর নষ্ট হয় হোক এমনি ভাব করবেন না?'

'যত ধর্মাচার্য হয়েছে,' বললে ডাক্তার, 'যীশু চৈতন্য বুদ্ধ মহম্মদ, শেষকালে সবাই অহঙ্কারে পূর্ণ, বলে, আমি যা বললুম তাই ঠিক। এ কি কথা!'

'সে দোষ আপনারও হচ্ছে।' গিরিশ বললে, 'তাঁদের সকলের অহঙ্কার হচ্ছে আপনি একলা তাঁদের এই দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।'

শান্ত গাঢ় স্বরে নরেন বললে, 'এঁকে আমরা পূজা করি। সে পূজা ঈশ্বর-পূজার কাছাকাছি।'

আনন্দময় বালকের মত হাসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কদিন পরে আলাসিঙ্গাকে আবার লিখছেন স্বামীজি :

'তোমরা লোককে পিড়াপিড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করতে যেও না। আগে ভাবটা দাও, ঐ ভাবটা গ্রহণ করলেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মানবে, যদিও আমি জানি জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে তারপর তার ভাবটা নেয়। প্রভুকে প্রচার করে যাও, সামাজিক কুসংস্কার বা গলদ সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছু বোলো না। হতাশ হয়ো না, গুরুর উপর বিশ্বাস হারিও না, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস, যতক্ষণ তোমার এই তিনটি জিনিস আছে কেউই তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না।

কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোম নগর একদিনে নির্মিত হয়নি। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল, তিনি আমাদের অন্যতম আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক, প্রভুই মহান, তিনি আবার লোক পাঠাবেন আমাদের সাহায্য করতে।'

৬৫

ম্যাডিসন এভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল একটি মেয়ে। একটা বাড়ির জানলায় ছোট একটা বিজ্ঞাপন ঝুলছে, তার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। আগামী রবিবার বেলা তিনটের সময় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন—বিষয় : বেদান্ত কী। পরের রবিবার আবার একটা বক্তৃতা। বিষয় : যোগ কী!

বাড়িটার নাম হল্ অফ দি ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড। হল্ বলতে দোতলায় ছোট একট ঘর, যাতে পৌঁছুতে একটা মাত্র সিঁড়ি, শ্রোতা আর বক্তার আগমনির্গমের ওই একটাই মোটে রাস্তা। নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগেই পৌঁছুল সেই মেয়ে। ঘরজোড়া বেঞ্চি পাতা, পিছনের দিকে ছোট মঞ্চ, তাতে একটা ডেস্ক আর চেয়ার বসানো। তিনটে বাজতে না বাজতে সমস্ত ঘর বোঝাই হয়ে গেল, সিঁড়িতে পর্যন্ত

দাঁড়িয়ে গেল লোক,—সিঁড়িতে কী—নিচের তলায়ও ভিড় জমল। না দেখি, যদি শুনতে পাই সে মেঘমন্দ্রের আভাস! যদি সমীরের একটু কম্পন এসে প্রাণে লাগে।

হঠাৎ দশদিক স্তব্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে কার ধীর পায়ের শব্দ। স্বামীজি আসছেন। ঋজুতার মহিমান্বিত মূর্তি, স্বামীজি এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে। রুদ্ধনিশ্বাসে কক্ষে তার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল গম্ভীরে। তিনি বলতে লাগলেন, বলতে লাগলেন আর জনতার মধ্যে থেকেও সেই একাকিনী মেয়ে অনুভব করল, সময় বলে কিছু নেই, স্থান বলে কিছু নেই, অতীত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই—শুধু শূন্যের প্রান্তরে এক শব্দ-স্রোত বয়ে চলেছে, আকাশে উড়ে চলেছে এক মহাসঙ্গীতের বিহঙ্গম। আমি কে, কোথায় আমার দেশ, কী আমার ধর্ম, কী আমার ভাষা, সব হিসেব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সহসা। যেন কোন রহস্যপুরীর লৌহদ্বার সেই শব্দঝঙ্কারে খুলে গিয়েছে, যেন কোন অশেষের দেশের দিগন্তকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন আরম্ভ আছে শেষ নেই, যেন পথ আছে প্রান্ত নেই। চারিদিকে শুধু অনন্তের উৎসব, অনন্তের নিমন্ত্রণ।

আর স্বামীজি অনন্তের ঋষি।

আবার কখন স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল মেয়ে, চম্‌কে উঠে চোখ চাইল। বক্তৃতা কখন সাঙ্গ হয়ে গেছে। ঘর শূন্য। কখন সব চলে গিয়েছে লোকজন।

না, শুধু তিনজন আছেন। সভার যিনি উদ্যোক্তা সেই গুডইয়ার আর তার স্ত্রী। আর স্বয়ং স্বামীজি।

না, আরো একজন আছে। সে সেই মেয়ে। উত্তরকালে সিস্টার দেবমাতা। স্বামীজির পদমূলে একটি প্রফুল্ল প্রণতি।

বেদান্ত কী? আমিই সেই, এক কথায় তাই বেদান্ত। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা পাগলামি। আত্মা কখনো জন্মায়নি, কখনো মরেও না। তাই আমি মরব, আমি মরতে ভীত, এ সব কুসংস্কারমাত্র। এ আমি করতে পারি বা পারি না এও কুসংস্কার। আমি

সব করতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে। যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে বিশ্বাস না করে, বেদান্ত মতে সেই নাস্তিক। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি আগে থেকেই রয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত চাপা দিয়ে 'অন্ধকার', 'অন্ধকার' বলে চেঁচিয়ে মরছি। হাত সরিয়ে নাও, দেখবে প্রথম থেকেই ওখানে আলো ছিল। কখনোই অন্ধকার ছিল না, কখনোই দুর্বলতা ছিল না, আমরা নির্বোধ বলেই চিৎকার করেছি, আমরা দুর্বল, আমরা অপবিত্র। যখনই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব বলি তখনই মিথ্যা বলি, তখনই যেন জাদুবলে নিজেকে অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগ্য বানিয়ে ফেলি।

একককথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যোপাসনা। যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ তোমার ভাইকে উপাসনা করতে না পারো তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না। যে ভাইকে তুমি দেখছ তাকে যদি ভালো না বাসতে পারো তবে যাকে কখনো দেখনি তাকে কি করে ভালোবাসবে? যদি ঈশ্বরকে মানুষের মুখে না দেখতে পাও তবে তাকে মেঘে বা কোনো মৃত জড়ে বা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কি করে দেখবে? যখন সর্বভূতকে ঈশ্বররূপে দেখবে তখন যা কিছু তোমার কাছে আসবে, দেখবে সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভুই নানারূপে আসছেন। আমাদের আপন আত্মাই খেলা করছে আমাদের সঙ্গে।

আর যোগ কী?

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখতে পাই না কারণ তার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হয়ে জল স্থির হয় তখনই কেবল তার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা চঞ্চল থাকে তখন তলদেশ দেখা যাবে না কিছুতেই। যদি জল নির্মল হয় প্রশান্ত হয় তবেই দেখতে পাব তলদেশ। হ্রদের তলদেশই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, হ্রদ চিত্ত আর তার তরঙ্গই বৃত্তি। চিত্তকে নানা প্রকার বৃত্তি বা আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই যোগ।

তাছাড়া, দেখা যাচ্ছে, মন তিন ভাবে অবস্থান করে। প্রথম অবস্থা, অন্ধকার, তমঃ, যেমন পশু বা মূর্খ-মূঢ়ের মন। সে মনের কাজ শুধু

অন্যের অনিষ্ট করা। দ্বিতীয়, ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছাই বলবান। আমি ক্ষমতাশালী হব ও অন্যের উপরে প্রভুত্ব করব—শুধু এই ভাব। তৃতীয়, যখন সমস্ত প্রবাহ স্থির, হ্রদের জল অনাবিল, তখন সে অবস্থার নাম সত্ত্ব বা শান্ত। সেটা জড়াবস্থা নয়, সেটা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত হওয়াই শক্তির সর্বাপেক্ষা উচ্চতম বিকাশ। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াকে সবাই ছোটাতে পারে কিন্তু যে দ্রুতধাবনশীল ঘোড়াকে থামাতে পারে সেই মহাশক্তিধর। ছেড়ে দেওয়া আর বেগ ধারণ করা—কোনটা কঠিন, কোনটাতে বেশি শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি আর অলস ব্যক্তি এক নয়। সত্ত্বকে যেন অলসতা মনে কোরো না, অলসতাকে সত্ত্ব। যে মনের তরঙ্গগুলোকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে পেরেছে সেই শান্ত পুরুষ।

একদিকে যেমন ভক্ত-শিষ্য জুটছে, তেমনি আবার নিন্দুকের দল। আর তাদের অগ্রণী রমাবাই।

মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি :

'রমাবাই-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা প্রচার করছে তা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে আমার অসচ্চরিত্রতার দরুন ডেট্রয়টের মিসেস ব্যাগলিকে তাঁর একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে তাড়াতে হয়েছিল! মিসেস বুল, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, একজন যে ভাবেই চলুক না কেন, এমন কতগুলো লোক চিরদিনই থাকবে যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা করে প্রচার করবেই। শিকাগোতেও আমার বিরুদ্ধে কেউ না কেউ এইরকম লেগে থাকত। আর, সর্বদা দেখবেন, এই মহিলাগুলিই সেরা খ্রীস্টান! হিন্দুরা যে এদের অস্পৃশ্য বলে, আর বিধিমত স্নান না করলে যে তাদের স্পর্শদোষ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায় না বিশ্বাস করে, এটা কি আর আশ্চর্যের ব্যাপার? প্রাচীনেরা যা বলে গেছেন তা খুব ঠিক, আমি তাই এখন দিন-দিন হৃদয়ঙ্গম করছি।'

আরো লিখছেন :

'আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খ্রীস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষের

মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আমাদের ঐগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। সম্প্রদায়গত নামের শুভকারিণী শক্তি আর নেই, এখন ওসব নাম চারদিকে কেবল অশুভ বিস্তার করছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা গুণী তাঁরা পর্যন্ত দলীয় নামের কুহকে পড়ে অসুরবৎ ব্যবহার করতে পেছপা হচ্ছে না। ঐসব বাধার প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্যে কঠোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আর আমি বলছি, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।'

'চাই অকপট সরলতা, পবিত্রতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। এসব যাদের আছে এমনি মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে তবে দুনিয়া ওলটপালট করে দিতে পারে।' ই. টি. স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি: 'গত বছর এ দেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং প্রশংসাও পেয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু পরে দেখলাম সে সব কাজ যেন আমি নিছক নিজের জন্যেই করেছিলাম। চরিত্র গঠনের জন্যে ধীর ও অবিচলিত যত্ন আর সত্যোপলব্ধির জন্যে প্রবল প্রচেষ্টাই মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর আপনি আমার সঙ্গে একমত যে অদ্বৈতবেদান্তই মানুষকে তার স্ব-স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমান করে তুলতে সমর্থ। গুটি কয়েক বাছা-বাছা স্ত্রী-পুরুষকে অদ্বৈত বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আমি চেষ্টা করব, কতদূর সফল হব জানি না। প্রভুই আমাকে সাহায্য করবেন, প্রয়োজনমত তিনিই কর্মী পাঠাবেন আমাকে। আমি শুধু এই চাই আমি যেন কায়োমনোবাক্যে পবিত্র নিঃস্বার্থ ও অকপট হতে পারি।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। বৃহত্তর জগতের কল্যাণে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে সমগ্র জগৎই তার আপনার হয়ে যায়।'

স্টার্ডিকে আবার লিখছেন স্বামীজি:

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম। মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকলে সত্য প্রচার সহজ হয় বলে যাঁরা ধারণা করেন তাঁরা ভ্রান্ত। কালে তাঁরা

বুঝতে পারেন যে বিষ এক ফোঁটা মিশলে সমস্ত খাদ্য দূষিত করে ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী সেই সব করতে পারে জীবনে।

প্রভু আপনাকে সর্বদা মায়ামোহের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে সর্বদাই প্রস্তুত আর আমরা যদি খাঁটি থাকি তবে প্রভুও আমাদের শত শত বন্ধু প্রেরণ করবেন, 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ'। কত নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত—আর, সত্য ও শিবের মত যোগ্যতম আর কী হতে পারে ?'

কত জায়গায় যে বহিরঙ্গদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর ছোটখাটো ক্লাশ করছেন অন্তরঙ্গদের নিয়ে তার লেখাজোখা নেই। বস্টনের মিসেস বার্বারের কর্তৃত্বে 'বার্বার লেকচারস' দিয়ে এলেন, তারপর ডিক্সন সোসাইটিতে, মটস মেমোরিয়াল বিল্ডিংএর উপরতলায়। আর এইখানেই তাঁর বক্তৃতার বিষয় 'ধর্ম বিজ্ঞান'।

বেদান্তী বলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এক চৈতন্যবান পুরুষ আছে, তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলি সুতরাং এই জগৎ তাঁর থেকে পৃথক নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্তকারন নন, তিনি আবার উপাদানকারণ। কার্য থেকে কারণ কখনো আলাদা নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর। জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। বেদান্তীর দ্বিতীয় কথা, এই যে আত্মাগণ, এরাও ঈশ্বরেরই অংশ স্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক-একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড থেকে সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় তেমনি সেই পুরাতন পুরুষ থেকে এই সমুদয় আত্মা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

কিন্তু অনন্তের অংশ, এ কথার অর্থ কী ? বোঝাচ্ছেন স্বামীজি : অনন্তের কখনো অংশ হতে পারে না। পূর্ণ বস্তুর বিভাজন নেই। তবে এই যে স্ফুলিঙ্গের কথা বলা হল এর অর্থ কী ? বেদান্তের মীমাংসা এই, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের অংশ নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে প্রশ্ন, এত আত্মা কোত্থেকে এল ? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাচ্ছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্যের মূর্তি। তেমনি এ সকল আত্মা

প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নয়। প্রকৃতির উপর মায়াময় প্রতিবিম্ব। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষই আমি-তুমি রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, এই ভেদপ্রতীতি মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিভক্ত হননি, বিভক্ত হয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে মাত্র। যখন ঈশ্বরকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়ে দেখি, জড়জগৎ বলে দেখি। যখন আরো একটু উচ্চতর ভূমি থেকে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখি, তখন দেখি বা প্রাণীরূপে, আরো উঁচুতে উঠলে মানুষরূপে, আরো উঁচুতে গেলে দেবতারূপে। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা আর আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তা আপনিও তা, অংশ নয়, সমগ্র। তিনিই অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান, আবার তিনিই স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চ। তিনিই বিষয় তিনিই বিষয়ী। আমি তুমি সব তিনি।

মিস এ্যাণ্ডরুজ-এর বাড়িতেও ক্লাশ নিলেন স্বামীজি, আবার মিস কর্বিনের বাড়ি। মিস কর্বিন বিত্তবতী মহিলা, তার সংস্রব ভালো লাগল না স্বামীজির। ওলি বুলকে লিখছেন: 'আমি গত শনিবার মিস কর্বিনের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে বলে এসেছি আর তাঁর ওখানে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাসে এমনি কি কখনো দেখেছেন যে বড় লোকের দ্বারা কোনো বড় কাজ হয়েছে? হয়নি, কখনো হয়নি। চিরকাল হৃদয় ও মস্তিষ্ক থেকেই বড় কাজ হয়েছে, টাকা থেকে নয়।

আমার ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে আমি আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছি। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন, আমি আর কারু সাহায্য চাই না। এই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য। এর বাইরে আর কিছু রহস্য নেই।'

'ধর্মবিজ্ঞানে' আবার বলছেন স্বামীজি:

জ্ঞাতাকে কী করে জানা যাবে? জ্ঞাতা কখনো নিজেকে জানতে পারে না। আমি সবই দেখতে পাই, কিন্তু নিজেকে পাই না। আরশি ছাড়া তুমি তোমার নিজের মুখ দেখতে পাও না। তেমনি আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হলে পায় না নিজের স্বরূপ দেখতে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই

আত্মার নিজেকে উপলব্ধি করবার চেষ্টাস্বরূপ। বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, পূর্ণ মানব। যেমন খ্রীষ্ট, যেমন বুদ্ধ। তারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। মুখে যাই বলুন, এঁদের উপাসনা না করে মানুষের উপায় নেই।

আমি যদি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ তবে কেন আমার এই অপূর্ণ স্বভাব? যে মুক্ত সে আবার বদ্ধ হয় কী করে? বেদান্তী বললে, তুমি কোনো কালেই বদ্ধ হওনি, তুমি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানা রঙের মেঘের আনাগোনা কিন্তু নীল আকাশ বরাবর অব্যাহত। তার পরিবর্তন নেই, পরিবর্তন শুধু মেঘের। আমিও তেমনি আকাশের মত অক্ষুন্ন। আমি পূর্ব হতেই পূর্ণ, অনন্ত কাল ধরে পূর্ণ। আমি অপূর্ণ, আমি আংশিক, আমি নর আমি নারী, আমি পাপী, আমি রুগ্ন, আমি মন, আমি দেহ, আমি চিন্তা করেছি, আবার চিন্তা করব— সমস্ত ভ্রমমাত্র। তুমি কখনই চিন্তা করো না, তোমার কোনো কালে দেহ ছিল না, কোনো কালেই তুমি অপূর্ণ নও। তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। তোমার শক্তিতেই সূর্য আলো দিচ্ছে, সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে, পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে। তোমার আনন্দেই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসছে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুমি সকলের মধ্যে আছ, তুমিই সর্বস্বরূপ। কাকে ত্যাগ করবে কাকে গ্রহণ করবে? তুমিই যে সমুদয়। যখন এই জ্ঞানের উদয় হয় তখন আর ভয় কোথায়, কোথায় মায়া··· াহ?

তখন সেখানে কে বা কাকে দেখে? কে বা কার উপাসনা করে? কার সঙ্গে বা কার আলাপন? যেখানে একজন আরেকজনকে দেখে, কথা বলে, তা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, কথা বলে না, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই ভূমা, তাই ব্রহ্ম।

৬৬

গুরুভক্তির মূর্ত প্রতীক শশিভূষণ—রামকৃষ্ণানন্দ। রামকৃষ্ণময়। জীবনে কখনো তীর্থদর্শনে যায়নি, বলত, ঠাকুরই আমার তীর্থ। ঠাকুরের

অসুখের সময় কাশীপুরের বাড়িতে ভক্তরা যদি কেউ সাধন-ভজনে বসত, শশী বলত, প্রত্যক্ষ দেবতা ছেড়ে অদৃশ্য দেবতার পূজায় কী ফল ?

বরানগরের বাজার থেকে ঠাকুরের জন্যে বরফ কিনে চাদরের খুঁটে বেঁধে ছুটতে ছুটতে এসেছিল দক্ষিণেশ্বর। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর, রোদে তেতে-পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে । তালপাতার পাখায় ঠাকুর তাকে নিজ হাতে হাওয়া করতে লাগলেন। 'আপনার জন্যে এনেছি।' চাদরের প্রান্ত থেকে বরফের টুকরো বার করল শশী। ঠাকুরের খুশি আর ধরে না। বললেন, 'এই গরমে মানুষ গলে যায় কিন্তু শশীর ভক্তি-হিমে বরফ গলেনি।'

সেই থেকে, ঠাকুরের অসুখের সময়, সর্বক্ষণ শশীর হাতে পাখা। আর সকলে পর্যায়ক্রমে পরিচর্যা করছে, শশীর সেবা অবিচ্ছিন্ন। সামান্য ক্ষণ ছুটি নিয়ে স্নানাহার সেরে নিত। আর বাকি সময় দিন-রাত ঠায় দাঁড়িয়ে পাখা চালাচ্ছে একটানা। আমি হাওয়া করি, তুমি ঘুমোও, তুমি শীতল হও।

ঠাকুর লীলা-দেহ সম্বরণ করেছেন তবু সেই দেহকে জীবন্ত ভেবে হাওয়া করছে শশী। হোমের সময় দেখতে পেল আগুনের মধ্যে ঠাকুর বসে। মুহূর্তে পাখা তুলে নিয়ে শশী তাঁকে, প্রদীপ্ত অগ্নিকে হাওয়া করতে লাগল।

এই নাও ঘোড়ার ডিম! ঠাকুর যে ফুল ভালোবাসতেন তাই কষ্টসাধ্য হলেও শশী জোগাড় করে আনত—সেই নাগকেশর চাঁপা, গোলাপ আর কুড়চি। একবার কুকুরে কামড়াল, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কী করে ঠিক সময়ে ঠাকুরকে জলযোগ করাব, আবার তাঁর সন্তানদেরও প্রসাদ দেব, এতেই সর্বক্ষণ শশব্যস্ত, সর্বদিকে ত্বরান্বিত। ইচ্ছে করছে বটে ঠাকুরকে বিচিত্র ফুলে সাজাই, ওদিকে আবার জলপান দেবার সময় হয়ে এল। দেখ দেখি এদিকে এই ইয়ারিং জবাফুলটা কিছুতেই আলাদা করতে পারছি না। মালা পরবার সখ এদিকে অথচ একটার পর একটা করে ফুল সাজাতে কী ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবে কি আদা ছোলা বাতাসা মিষ্টি, আজ আর কিছু খাবে না? বা, তা কী করে হয়! আরে,

এদিকে বেলাও তো বেড়ে চলেছে,। দুত্তোর ছাই মালা। এই নাও ঘোড়ার ডিম। বলে সবগুলি ফুল একসঙ্গে ঠাকুরের পায়ের কাছে ঢেলে দিল। সেই অন্তরঢালা ব্যাকুলতাই শশীর পরাপূজা।

তুমুল তাণ্ডবে ঝড় জল বৃষ্টি সুরু হয়েছে, মাদ্রাজ মঠের মন্দির ভেঙে পড়েছে, শশী ঠাকুরের পটের উপর ছাতা ধরে বসে আছে নির্নিমেষ।

সেই রামকৃষ্ণানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি, এপ্রিল ১৮৯৫-এ।

'কল্যাণবরেষু, সমস্ত কাজের সাফল্য তোমাদের পরস্পরের ভালোবাসার উপরে নির্ভর করছে। দ্বেষ ঈর্ষা অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকবে ততদিন কল্যাণ নেই। ঐ যে কানে কানে গুজোগুজি করা ওটা মহাপাপ, ওটাকে একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা মুখ ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। মহোৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে হয়ে গেছে, ভালো কথা। আসছে বারে যাতে এক লাখ লোক হয় তার চেষ্টা করতে হবে। অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্যোগ যার সহায় সেই সিদ্ধকাম হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড়ো করিসনি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত মানুষ এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও তো শুনতে পাইনে। তোমরা তো মহোৎসবে লুচি সন্দেশ বাঁটলে আর কতগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে, তোমরা কী আধ্যাত্মিক খোরাক দিলে তা তো শুনলাম না। সেই যে পুরোনো ভাব- কেউ-কিছুই জানিনা-ভাব— যতদিন না দূর হবে ততদিন কারু সাহস হবে না. বুলিজ আর অলওয়েজ কাওয়ার্ডস। যারা কেবল লোককে দাবড়ে বেড়ায় তারা চিরকালকার কাপুরুষ।

সকলকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করবে, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানুক বা না মানুক। বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সঙ্গে নিরস্ত করবে। সকল মতের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। এই সকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে তখন তোমরা মহাতেজে কাজ করতে পারবে, অন্যথা জয়গুরু ফুরু কিছুই চলবে না। শরৎ কী করছে? আমি কী জানি, আমি কী জানি—ওরকম বুদ্ধিতে তিনকালেও কিছু জানতে

পারবে না। খালি খোলবাজানো হাঙ্গামার কী কাজ? সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে আই ফ্রেট য়্যাণ্ড স্ট্যাম্প লাইক এ লিশ্‌ড্‌ হাউণ্ড—একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে তেমনি ছটফট করি। এগিয়ে পড়ো, এগিয়ে পড়ো, উঠে পড়ে লেগে যাও।'

মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রকে স্বামীজি কিডি বলে ডাকেন। তাকে লিখছেন:

'অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই তো ধর্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না। জড়ের দ্বারা তো আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কী সম্বন্ধ? তুমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাকো। আর রামকৃষ্ণকে প্রচার করো। যে পানীয় পান করে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে পান করাও। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত কোরো না নিজেকে, বা, তোমার গোঁড়ামি দিয়ে অন্যকেও বিরক্ত কোরো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক।'

এই কথাই আবার লিখছেন মায়লাপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাজুণ্ডা রাওকে:

'প্রেমাস্পদেষু, দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের প্রচার-কার্যে লেগে যাও, কারণ সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে কর্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করো আর খুব সাধনভাজনের অভ্যাস করো। কারণ, তোমাকে একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে হবে। আমার গুরু মহারাজ বলতেন, নিজেকে মারতে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অন্যকে মারতে গেলে ঢাল-তলোয়ারের দরকার। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও অনেক তর্ক-যুক্তি করে বোঝাতে হয়। কিন্তু কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই নিজের ধর্মলাভ।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের উপর বহুকালের অত্যাচার। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের জন্যে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে, প্রতি অণুতে-পরমাণুতে তা ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্যে যাত্রা করবে? আমি আনন্দিত যে তুমি একজন পতাকাবাহী হতে ইচ্ছে করেছ, তোমার মধ্যে প্রভুই জাগিয়েছেন ইচ্ছে। প্রভু যাকে মনোনীত করবেন সেই ধন্য, সেই মহা গৌরবের অধিকারী।'

দুই শত্রু স্বামীজির—এক, রমাবাই সরস্বতী, আরেক মিশনরির দল। দুই শত্রুই এখন পরাস্ত। কারু সাধ্য নেই আমাকে বিপর্যস্ত করে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করেছি, দিবালোকের মত উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করেছি। যেন আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক নিয়ে মরতে না হয় যে আমি নামের জন্যে, এমন কি, পরের উপকারে ছলে লুকোচুরি খেলেছি। এক বিন্দু দুর্নীতি, এক বিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্যন্ত যেন আমাতে না থাকে। তাই যদি হয়, আমাকে পায় কে। কে আমাকে পরাভূত করে।

রমাবাই হিন্দু ছিল খ্রীষ্টান হয়েছে, আর খ্রীষ্টান হয়ে মিশনারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু নিন্দা শুরু করেছে। এর জন্যে তারও সাঙ্গোপাঙ্গ কম জোটেনি। আর স্বামীজি যখন হিন্দুধর্মের চারক-বাহক তখন স্বামীজিও তার হৃদয়শূল।

রমাবাইকে মিশনারিরা খুব সাহায্য করছে। তা করুক, যেখানে যে মহিলাসভায় রমাবাই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধতা করছে সেখানে সেই সভায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন স্বামীজি। শুধু তাই নয়, আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিয়ে দিচ্ছেন। আর যাই হোক, কাপুরুষতা কারু ধর্ম হতে পারে না।

এখন স্বামীজির আমেরিকান ভক্তরাই রমাবাইয়ের দলকে নাকাল

করছে, মিশনারিদের তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। পরের ধর্ম মন্দ, আমার ধর্মটাই মহৎ, এই নীতিটাই গর্হিত, আর যে স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্মকে আশ্রয় করে তাকে অজ্ঞান ছাড়া আর কী বলব!

আর যাই করুক, আমেরিকানরা যেন আমাদের জাতিভেদের না সমালোচনা করে! তাদের জাতিভেদ আরো জঘন্য। এদের ধনীতে-গরিবে জাতিভেদ। আর এদের নিগ্রোদের প্রতি ব্যবহার? এ বর্বরতা কল্পনাতীত। সামান্য অপরাধে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে মেরে ফেলে। এরা যেন না পরের চরকায় তেল দিতে আসে।

আমেরিকানদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কী? ঈশ্বর স্বর্গ নামক স্থানে সিংহাসনে বসা এক মহাক্রূর ও অত্যাচারী সম্রাট। আর শূন্য থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। আর, আত্মাও সৃষ্ট এক পৃথক পদার্থ। আমাদের হিন্দুদের মতে, সৃষ্টি ও আত্মা অনাদি, আর আত্মাতেই পরমাত্মার অবস্থান। আর ঈশ্বর আত্মারই সর্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা। বেদের এই মহান ব্যাখ্যাই ক্রমশ গ্রহণ করছে আমেরিকা। মিশনারিরা দাঁড়াতে পাচ্ছে না। মিশনরিরা যার বিপক্ষে, শিক্ষিত আমেরিকানরা তারই অনুকূলে। আর রমাবাইকে তো ডক্টর লুইস জেনস নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন।

'হিন্দুধর্মকে হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়েই সংস্কার করতে হবে, নব্যতান্ত্রিক মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়।' জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন স্বামীজি: 'আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কারকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দু দেশেরই সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করতে হবে। সেই মহা-আন্দোলনের সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করছেন বলে মনে হচ্ছে কি? ঐ তরঙ্গ-আঘাতের মৃদু গুঞ্জরন শুনতে পাচ্ছেন কি? সেই শক্তিকেন্দ্র সেই দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন, তিনি সেই মহান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আর তাঁকে কেন্দ্র করেই এক যুবকদল ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। ওরাই এ মহাব্রত উদযাপিত করবে। এ কাজের জন্যে সঙ্ঘের দরকার আর সূচনায় সামান্য কিছু অর্থের। কিন্তু ভারত-বর্ষে কে আমাদের টাকা দেবে? আমি তো সে জন্যেই আমেরিকায় এসেছি। যা কিছু টাকা, আপনি জানেন, গরিবদের থেকেই এনেছি,

বড়লোকদের থেকে নয়, যেহেতু ধনীরা আমার ভাব বোঝে না, পারে না বুঝতে। এদেশে ক্রমান্বয় বক্তৃতা করেও বিশেষ কিছু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, আমেরিকায় এবার বড় দুর্বৎসর, হাজার হাজার গরিব বেকার হয়ে আছে। দ্বিতীয় কারণ, মিশনরিরা আমার মতবাদ ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। তৃতীয়ত, আমি যে সত্যিই সন্ন্যাসী, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, আমি প্রতারক নই, এ কথাটা আমাদের দেশের গণ্যমান্য কেউ বলতে পারল না বোঝাতে পারল না আমেরিকাকে। আমার দেশবাসীদের এ জন্যে বাহবা দিতে হয়। তবু, দেওয়ানজী সাহেব, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।'

বরং দেশে আছেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে। মিশনরিদের বলে বেড়াচ্ছেন বিবেকানন্দ হচ্ছেন রাজনৈতিক পতাকাবাহী।

লিখছেন আলাসিঙ্গাকে :

'শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সামনে বক্তৃতায় বলেছেন, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক। আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে বলবে, হয় তিনি কলকাতার কোনো সংবাদপত্রে লিখে তা প্রমাণ করুন, নয়তো প্রত্যাহার করুন ভিত্তিহীন মূর্খ উক্তি। এটা আর কিছু নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার অপকৌশল। কোনো রাজনীতির সঙ্গে আমার সংশ্রব নেই, আমার সংস্পর্শ একমাত্র সত্যের সঙ্গে।

আমার বন্ধুদের বলবে যারা আমার নিন্দা করছে তাদেরকে একমাত্র আমার উত্তর—স্তব্ধতা। তাঁদের ঢিল খেয়ে আমি যদি পাটকেল মারতে যাই তবে তো আমি তাদেরই দলে গিয়ে পড়লুম, তাদেরই সঙ্গে হয়ে গেলুম একদরের। তাদের বলবে, সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, কারু কোনো আনুকূল্য বা বিরুদ্ধতাকে সে গ্রাহ্য করবে না।

সত্যি, সাধারণ সংসারীদের সঙ্গে জড়িত এই বাজে জীবনে আর খবরের কাগজের হুজুগে আমি একেবারে দিক্ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের মধ্যে শুধু এই আকুল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে হিমালয়ের শান্তির কোলে ফিরে যাই।'

যাদের হৃদয়ে ভগবান মঙ্গলায়তন হরি বাস করেন তাদের কোনো কার্যে অমঙ্গল নেই। সমাহিত চিত্তে ভগবচ্চিন্তাই পরা রক্ষা। যে ভগবানের আশ্রিত তাকে কে হিংসা করতে পারে? যে বিমলবুদ্ধি, যাতে মাৎসর্য নেই, যে প্রশান্ত পবিত্রস্বভাব, সর্বজীবের মিত্র, প্রিয় ও হিতভাষী, যার অন্তরে মান ও মায়া নেই, তারই হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব নিত্য অধিষ্ঠিত।

আমি দেহ—এই সঙ্কল্পই মহৎ সংসার। এই সঙ্কল্পই বন্ধন, হৃদয়-গ্রন্থি। আমি দেহ—এই জ্ঞানই অজ্ঞান, এই বুদ্ধিই অবিদ্যা। এই বুদ্ধিই তৃষ্ণাদুষ্ট।

যা কিছু সঙ্কল্প তাকেই তাপত্রয় বলে। কাম, ক্রোধ, দুঃখ, শোক, বিশ্ব, দেশ, কাল, রূপ, সব মনঃপ্রসূত। এই মনই মহারিপু। এই মনই জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি, বিরহ ও অপ্রিয়সংযোগ। মনই জীব, মনই চিত্ত, মনই অহঙ্কার।

মনই মহাবন্ধ, মনই ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশ। মনই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়, এই পঞ্চকোষই মনোভব। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয়ও মনোরূপ। সমস্ত দৃশ্যই মানস। যতক্ষণ সঙ্কল্প আছে ততক্ষণ এ সমস্তই আছে, যেই সঙ্কল্প ত্যাগ হল তখন আর কিছুই নেই। আমিও নেই তুমিও নেই গুরুও নেই শিষ্যও নেই—এক সচ্চিদানন্দে অনির্বাচ্যা চমৎকারিণী মহামায়া পুরুষ-প্রকৃতিরূপে খেলা করছে।

'লোকে কী বলল তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।' হরিদাস বিহারীদাসকে আবার লিখছেন স্বামীজি: 'আমার ভগবানকে আমার ধর্মকে আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি নিপীড়িত অশিক্ষিত ও দীনহীনকে। তাদের বেদনা কত তীব্রভাবে অনুভব করি তা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। মানুষের স্তুতি-নিন্দায় আমি দৃকপাত করি না।

প্রভুর কাজ চিরদিন দীনদরিদ্রেরাই সম্পন্ন করেছে। আশীর্বাদ করবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি গুরুর প্রতি আর নিজের প্রতি আমার

বিশ্বাস অটুট থাকে। প্রেম আর সহানুভূতিই একমাত্র পথ। ভালোবাসাই একমাত্র উপাসনা।'

'যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না তা কি আবার ধর্ম? আমাদের খালি 'ছুঁয়ো না' ছুঁয়ো না'।' লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে: 'যে দেশের বড়-বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বছর খালি বিচার করছে ডান হাতে খাব না বাঁ হাতে, ডান দিক থেকে জল নেবো না বাঁ দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ। কাল চিরজাগ্রত, তাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তার চোখে কে ধুলো দেবে?

যে দেশে কোটি-কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদেব উন্নতির বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না, নরক? সে কি ধর্ম, না, পিশাচনৃত্য? দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ। ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি, দেখছি এ দেশ। কারণ ছাড়া কি কার্য হয়? পাপ বিনে কি সাজা মেলে?

সমুদয় শাস্ত্রে ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বচন আছে। এক, পরোপকার করলে পুণ্য, আর দুই, পরপীড়ন করলে পাপ।

গুরুদেব বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। সে কথা ভুললে চলবে কেন? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ধরে কী করেছি? ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। ওদের ওঠবার শক্তি আমাদেরই জোগাতে হবে প্রাণপণে। আমাদের ধর্মের দোষ নেই, দোষ আমাদের। ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করবার দোষ।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ? তুমিই তো নিজে সমস্ত শক্তির আধার, তবে, বন্ধু, কেন কাঁদছ? জড়ের কী ক্ষমতা, আত্মার শক্তিই প্রবলতর। আমরা রামকৃষ্ণের দাস, আমাদের আবার ভয় কিসের?

দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে, তারাই কাতর হয়ে সকরুণ কাঁদে, আমরা ক্ষীণ, আমরা দীনহীন—এরই নাম নাস্তিক্য। আমরা যখন

অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন আমরা বীর, আমরা বিগতভী—এরই নাম আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

বীতসংসাররাগ হয়ে সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধিকে দূর করে পরমামৃত পান করতে করতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করছি। প্রণাম করছি সমগ্র পৃথিবীকে, সকলকে আমন্ত্রণ করছি সেই অমৃতভোগের উৎসবে।

অনাদিনিধন বেদ-সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত পাওয়া গিয়েছে, যার প্রকরণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বল সঞ্চার করেছে, যা পার্থিব নারায়ণদের প্রাণসারে পরিপূর্ণ, সেই অমৃতের পূর্ণপাত্ররূপ দেহ ধারণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমরা সেই রামকৃষ্ণের দাস।'

'আমরা সেই পরমপুরুষের দাস।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি: 'যার যা খুশি বকুক, প্রভুই জানেন কী হবে। আমরা কারু সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, সাহায্য অনাহূত এসে পড়লেও দিই না ছেড়ে। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে তার ভরসা রেখো না। সমগ্র মানুষের সাহায্যের চেয়েও প্রভুর শক্তি কি বেশি নয়? সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথাও নষ্ট হবে না। সত্যের মৃত্যু নেই, ধর্মের মৃত্যু নেই, পবিত্রতাও অবিনশ্বর। তোমরা সিংহতুল্য হও। মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে লেগে পড়ে থাকো। আসল কথা গুরুভক্তি। মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর উপর বিশ্বাস। তা হলেই নিশ্চিতসিদ্ধি।

সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। কারু সঙ্গে বিবাদ কোরো না। কারু বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কী এসে যায়? তারা যা খুশি তাই হোক না। কেন বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে যাবে? যার যে ভাবই হোক না, সকলের কথা সহ্য করো ধীর ভাবে। চাই ধৈর্য চাই পবিত্রতা চাই অধ্যবসায়।

আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, আমি সাধুও নই। আমি গরিব, গরিবদের আমি ভালোবাসি, কিন্তু এদের উদ্ধারের উপায় কী? তাদের জন্যে কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে

আলোয় আসতে পাচ্ছে না, শিক্ষা পাচ্ছে না, কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের পথ দেখাবে? জেনো, এরাই তোমাদের ইষ্ট, এরাই তোমাদের ঈশ্বর। তাদের জন্যে ভাবো, তাদের জন্যে কাজ করো, নিরন্তর প্রার্থনা করো তাদের জন্যে। দরিদ্রের জন্যে যার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হয় তাকেই আমি মহাত্মা বলি আর যারা দরিদ্রের পয়সায় শিক্ষিত হয়ে দরিদ্রের দিকে চেয়েও দেখছে না, দূর করছে না তাদের অন্ধকার—অভাবের অন্ধকার, অজ্ঞানের অন্ধকার—তাদের বলি দেশদ্রোহী। যারা ভারতের অগণন ক্ষুধার্ত মানুষকে পেষণ করে টাকা কামিয়ে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে তারা দেশদ্রোহী ছাড়া আর কী—আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু গরিবেরাই চিরকাল পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।'

জাতি নীতি কুল গোত্র, এ সমস্ত থেকে যিনি দূরে অবস্থিত যিনি নামহীন রূপহীন গুণহীন ও দোষাদিহীন, যিনি দেশকালসম্বন্ধাতীত ব্রহ্ম, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো।

যিনি বাক্যের অগোচর, বিমল জ্ঞানচক্ষুতে যিনি প্রত্যক্ষ, যিনি শুদ্ধ চিদঘনস্বরূপ অনাদিবস্তু ব্রহ্ম, নিষ্কল ও বুদ্ধির অবিষয়, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো।

যাঁর জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, পরিণাম নেই, ক্ষয় নেই, ব্যাধি নেই, বিনাশ নেই, যিনি অব্যয়, যিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত অচল, যিনি প্রত্যক্ষ চৈতন্য, যিনি অখণ্ড সুখস্বরূপ নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো।

৬৭

পঁচিশে এপ্রিল, ১৮৯৫ স্বামীজি লিখছেন মিসেস বুলকে নিউইয়র্ক থেকে :

'আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক) যাবার

বন্দোবস্ত করেছি। সেখানে আমার ছাত্রী মিস ডাচারের একটি কুটির আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে নির্জনে, শান্তিতে ও বিশ্রামে কাটাব মনে করেছি। আমার ক্লাশে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে জনকয়েককে যোগী তৈরি করতে চাই। গ্রীনএকারের মত কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ জায়গা এ সাধনার অনুপযোগী। আর সহস্রদ্বীপোত্থান লোকালয় থেকে দূরে বলে, যারা শুধু মজা চায়, তারা সেখানে যেতে বিশেষ সাহস করবে না।'

জুন মাসের গোড়ার দিকে গেলেন পার্সিতে, নিউ হ্যাম্পসায়ারে। লিখছেন :

'অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌঁচেছি। অনেক সুন্দর জায়গার মধ্যে এ একটা নিঃসন্দেহ। কল্পনা করো, চারিদেকে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের সার তার মধ্যে একটি হ্রদ, আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মধুর কি নিস্তব্ধ কি শান্তিময়! শহরের কোলাহলের পর আমি যে এখানে কী আনন্দ পাচ্ছি এ আমি কেমন করে বোঝাব!

আমার বোধহয় নবজীবন এসেছে! আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি খুলে পড়ি আর চুপচাপ বসে থাকি। এর বেশী আর কী চাই!

দিন দশেকের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে সহস্রদ্বীপোত্থানে যাব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব আর নির্জনবাস করব। এই কল্পনাটাই, কি বলব, সহসা মনকে উঁচু করে দেয়।'

সেণ্ট লরেন্স নদীর উপরে সব চেয়ে যেটা বড় দ্বীপ তারই নাম থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক। তাতে পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি বাড়ি, পিছনের দিকে তেতলা হয়ে সামনের দিকে দোতলা। চার পাশে ঘন বন, লোকালয় দেখা যায় না। কিছু দূরে মূল নদী কিন্তু তার একটা জলধারা পাহাড়ের ঢাল ছুঁয়ে বাড়ির পিছনে এসে থেমেছে। নদীর বুকে এখানে-ওখানে আরো সব দ্বীপ, হোটেলবাজারে আলোর মালা পরে ঝিকমিক করছে। দূরে ক্লেটনের আভাস জাগছে, কাছেই ক্যানাডার উপকূল। দোতলার প্রশস্ত ঘরে ক্লাস বসে। তেতলার ঘরে স্বামীজি

থাকেন। এই বাড়ি যার, মিস ডাচার, স্বামীজির জন্যে আলাদা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে। যাতে স্বামীজির বসবাস সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হয়।

দোতলার ক্লাশঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বারান্দা, ছাদ-দেওয়া। ক্লাশের পর আবার সেই বারান্দায় বসে স্বামীজি কথা কন ছাত্রদের সঙ্গে। স্বামীজির কথাই যেন ঈশ্বরের কথা।

ঠিক বারো জন ছাত্রছাত্রীই জুটল স্বামীজির, বাসিন্দে হল সে বাড়ির। স্বামীজির সঙ্গে বাস করাই, লিখছে অন্যতম শিষ্য, এস. ই. ওয়ালডো, অবিশ্রান্ত উচ্চ থেকে উচ্চতর অনুভূতিতে আরোহণ করা। প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক ভাব, এক ঘনীভূত ধর্মভাবের মধ্যে নিশ্বাস নেওয়া। ছেলেমানুষের মত ক্রীড়াকৌতুকও না করছেন এমন নয়, পরিহাস তো তাঁর স্বচ্ছচিত্রেরই পরিভাষা, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঈশ্বরই যে জীবনের মূলমন্ত্র এ সত্য থেকে স্খলিত হচ্ছেন না। নিটুট আছেন তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতিতে।

চারদিকে প্রশান্ত স্তব্ধতা, হঠাৎ কোথাও বা পাখির কাকলি, কীটপতঙ্গের গুঞ্জন, নয়তো বা পত্রপুঞ্জে সমীরমর্মর। তার মধ্যে বেজে উঠেছে স্বামীজির কণ্ঠ—শব্দ নয়, সঙ্গীত।

'মোটামুটি বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ। কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে পূর্ণপ্রেমের উদয়েই ভয় দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঈশ্বর কী বস্তু জানতে পারছি ততক্ষণ কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশু খ্রীস্ট মানুষ ছিলেন, তাই জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দেও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, তাই তাঁর ক্রোধেরও কোনো কারণ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনো সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হাত রক্তে কলঙ্কিত ছিল তাই তিনি মন্দির তৈরি করতে পারেননি।

আমাদের হৃদয়ে প্রেম ধর্ম ও পবিত্রতা যত জাগবে ততই আমরা বাইরে প্রেম ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাব। আমরা অপরের কাজের যে

নিন্দে করি তা আসলে আমাদের নিজেদেরই নিন্দে। তোমার হাতের মধ্যে রয়েছে তোমার যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড তা ঠিক করো, দেখবে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের ভিতরে যা নেই বাইরেও তা দেখতে পাইনে। জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোনো কালে ভালো কাজ করা যায় না। হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। কোনোই ফল হয় না নিন্দাবাদে।'

মিসেস ফাঙ্কি ও তার বন্ধু স্বামীজিকে খুঁজছে, কোথায় স্বামীজি? ডেট্রয়টে দেখেছিল কবার, ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেনি ঘনিষ্ঠ হয়ে। শুধু তাঁর কথাগুলিই প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ তুলছে—আর একবার দেখতে পাইনে তাঁকে? তপ্ত হতে পাইনে সে উপস্থিতিতে? কোথায় স্বামীজি?

কেউ-কেউ বললে ভারতে ফিরে গিয়েছেন। সমুদ্র পেরিয়ে চলো তবে ভারতবর্ষ। শুধু সমুদ্র কী, স্বামীজির জন্যে পৃথিবী অতিক্রম করতে পারি। যেতে পারি গহনে-দুর্গমে।

'স্বামীজি কোথায় বলতে পারো?' এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, উৎসুক হয়ে জিগগেস করল ফাঙ্কি: 'দেশে ফিরে গিয়েছেন?'

'না না, এখানেই আছেন।' বলল বন্ধু।

'এখানে? বলো কী?'

'হ্যাঁ, গ্রীষ্মকালটা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কাটাবেন।'

পরদিনই যাত্রা করল ফাঙ্কি, কালহরণ করার মত সময় নেই। দুই চোখে দেখবার পিপাসা, দুই কানে শোনবার।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে বার করল স্বামীজিকে। জনকোলাহল থেকে দূরে সরে এসেছেন, এখন তাঁর শান্তিভঙ্গ করা কি ঠিক হবে? কিন্তু কী করবে ফাঙ্কি, তার প্রাণের মধ্যে স্বামীজি যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তা কি আর নেববার?

অন্ধকার রাত, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথের শ্রমে মুহ্যমান দুজনে, ফাঙ্কি আর তার বন্ধু, কিন্তু স্বামীজিকে না দেখতে পেলেই বা

বিশ্রাম কোথায় ? তিনি কি তাদের শিষ্য বলে গ্রহণ করবেন ? আর, যদি না করেন, তাহলে তারা কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ? কী আহম্মক তারা, যিনি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানেন না, তাঁকে দেখবার পিপাসায় তারা বহুশত ক্রোশ চলে এসেছে। কী তাদের স্পর্ধা যে তারা তাঁর সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাঁর নিভৃতিতে চাঞ্চল্য আনে ?

পথ দেখাবার জন্যে তারা একটা লোককে ভাড়া করেছিল, লণ্ঠন হাতে সে আগ-আগে চলেছে। চড়াই ধরে উঠছে সকলে কষ্টে, আলোতে কতটুকু বা তরল হচ্ছে অন্ধকার, মাথার উপরে অনাবৃত দুর্যোগ—তবু কে বলবে কার এই দুর্দম আহ্বান, কিসের এ দুর্নিবার পিপাসা ? সমস্ত হিসেবের বাইরে কার এই দুঃসহ আকর্ষণ ?

যদি দেখা করেন তা হলে কী বলবে আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিল দুজনে, কিন্তু, আশ্চর্য, যখন সত্যিই দেখা গেল তখন ও-সব পোশাকী কথা আর কিছুই মনে হল না। গম্ভীর যেন সহসা সরল হয়ে গেল। উত্তুঙ্গ যেন হয়ে গেল সমতল।

'আমরা ডেট্রয়েট থেকে আসছি।' বললে মামুলি ভাবে। 'মিসেস পি আমাদের পাঠিয়েছেন।'

'যদি ভগবান যীশু এখন বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছেও আমরা এমনি আসতাম।' আরেকজন বললে, 'শুধু আসতাম না তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ভিক্ষে করে নিতাম।'

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'হায় আমার যদি যীশুর মতো ক্ষমতা থাকত!' স্নেহনয়নে তাকালেন মহিলাদুটির দিকে : 'যদি আমি পারিতাম তোমাদের এই মুহূর্তে মুক্ত করে দিতে।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন নীরবে। ঘরের কর্ত্রী কাছেই ছিল, তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এঁদেরকে উপরে নিয়ে যাও। এঁরা এখানেই থাকবেন।'

এ আনন্দ প্রত্যাশার অতীত। স্বর্গসুখের চেয়েও বেশি।

'বারোজন ছিলাম আমরা সেই বাড়িতে, আর সমস্ত গ্রীষ্মটাই আমরা কাটালাম একটানা। মনে হত যেন এক জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি ঊর্ধ্ব থেকে অবতরণ করে আমাদের সব সময়েই অধিকার করে আছে।

আর এখানেই এক দিন সন্ধ্যায় চকিতে স্বামীজি তাঁর বিখ্যাত কবিতা "সঙ্গ্‌ অফ দি সন্ন্যাসিন"—সন্ন্যাসীগীতা—রচনা করলেন আর তক্ষুনি-তক্ষুনি শোনালেন আমাদের :'

ধরো সেই গান। যে গানের জন্ম দূরদূরান্তে,
যেখানে পার্থিব মালিন্য পৌঁছুতে পারে না,
পর্বতগুহায়, গহন বনের বিস্তারে,
কামনা বা বৈভব বা নামাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস
ছুঁতে পারে না যার শান্তির গাম্ভীর্য,
যেখানে বয়ে চলেছে নিত্য জ্ঞানের নির্ঝর,
যার সহচর দুই শাখা, সত্য আর আনন্দ—
সেই গান তোলো এবার উচ্চ রোলে, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

ছিন্ন করো শৃঙ্খলজঞ্জাল—যা তোমাকে বেঁধে রাখচে নিচে,
জ্বলন্ত সোনার শৃঙ্খল কিংবা দীনম্লান লোহার—
ভালো মন্দ, ঘৃণা প্রেম, যত সব দ্বন্দ্বের কৌটিল্য।
আপ্যায়িতই হোক বা বেত্রাহতই হোক
দাস সব সময়েই দাস, সব সময়েই অধীনস্থ,
সোনার হলেও শৃঙ্খল বাঁধতে ঠিক সমান সমর্থ—
দূর করে দাও সেই আবর্জনা, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

দূর হও তমসা। যে আলেয়া ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গের আকর্ষণে
টেনে নিয়ে চলেছে এক অন্ধকারের উপর আরেক অন্ধকারের
ভার জমাতে—দূর হও সেই আলেয়া।
নিবে যাও জীবনতৃষ্ণা, যে শুধু আত্মাকে
জন্ম থেকে মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জন্মের আবর্তে নিক্ষেপ করছে,
নিবে যাও শেষ বাসনার শিখা।

যে আত্মজয়ী সে সর্বজয়ী
এই তুমি জেনে রাখো আর কখনো হার মেনো না, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
"যার যেমন বোনা তার তেমনি ফসল তোলা"
লোকে বলে। বলে, "কর্মই নিয়ে আসে তার ফল
ভালো ভালো, মন্দ মন্দ। কারু ত্রাণ নেই সেই নিয়ম থেকে,
যে-ই কায়া নিয়েছে সেই শিকল পরেছে।"
কিন্তু, নাম ও রূপের বাইরে বিরাজ করছে আত্মা
অনামী, অপরবশ।
জেনে রাখো তুমি সেই অসঙ্গ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

যারা পিতা মাতা পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব বলে
তারা অসার স্বপ্নে আচ্ছন্ন।
অলিঙ্গ যে আত্মা, সে কার পিতা, কার সন্তান,
কার বন্ধু ? আর সে যখন একাকী, একমাত্র,
তখন কার সঙ্গে তার শত্রুতা ?
আত্মাই একেশ্বর, সে ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে,
আর তুমিই সেই, তুমিই সেই, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

কেবলই একজন, একচ্ছত্র—সর্বস্বাধীন, সর্বজ্ঞাতা,
অনাখ্য, অকায়, অকলঙ্ক।
তার মধ্যেই বাস করছে মায়া, স্বপ্নদর্শিনী প্রকৃতিরূপিনী,
দাঁড়িয়ে তাই দেখছে সর্বসাক্ষী, প্রশান্ত ও নির্বিচল।
জেনো তুমিই সেই সাক্ষীস্বরূপ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

কী তুমি খুঁজছ ? ইহ বা পর কোনো লোকই
তোমাকে দিতে পারবে না সেই স্বাধীনতা।

তা নেই শাস্ত্রে বা মন্দিরে, পূজায় বা উপাসনায়,
হায়, নিরর্থক তোমার অন্বেষণ।
যে রজ্জু তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে
তাতে মাত্র তোমার মূর্তি এনে রাখা।
তবে আর কিসের জন্যে শোক,
হাতের মুঠ ছেড়ে দাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

বলো, শান্তি, শান্তি হোক সকলের।
আমরা থেকে কোনো প্রাণীর ভয় নেই,
যে উচ্চে বিচরণ করছে যে বা ধূলিপঙ্কে
আমিই সকলের আত্মা, সকলধারক,
ইহ বা পর সমস্ত জীবন তাই আমি বিসর্জন দিচ্ছি,
সমস্ত স্বর্গ আর মর্ত আর নরক, সমস্ত আশঙ্কা আর আশা—
এমনি করে কাটো তোমার পাশগুচ্ছ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

এই দেহ যেমন খুশি থাক বা চলে যাক
দেখো না তাকিয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যাক
ওকে ওর কর্মস্রোত। ওর দিন ফুরোবে একদিন।
কেউ ওকে মালা দেবে, কেউ দেবে লাথি
ওকে, এই কাঠামোকে। কিছু বোলো না।
নিন্দা বা স্তুতির অর্থ কী,
যখন স্তুত ও স্তাবক নিন্দক ও নিন্দিত একই ব্যক্তি।
সুতরাং প্রশান্ত হও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

সত্য সেখানে ফোটেনা যেখানে যশোলিপ্সা
গৃধ্নুতা বা কামের বসবাস।

যে নারীকে স্ত্রী বলে দেখতে চায়
সে সমস্তসম্পূর্ণ হতে পারে না।
নয় বা সে যার সামান্যতমও বিত্ত আছে, স্বার্থ আছে,
যে ক্রোধে বংশবদ
মায়ার তোরণ সে পারে না উত্তীর্ণ হতে।
সুতরাং ও সব জলাঞ্জলি দাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

ঘর বেঁধো না। হে বন্ধু, কোন ঘর তোমাকে বাঁধবে?
আকাশই তোমার আচ্ছাদ, তৃণাস্তরণ তোমার শয্যা,
আর যা খাদ্য তোমার জোটে, সুপক্ক বা বিস্বাদ,
বিচার কোরো না, তাই তোমার আহার্য।
যে নিজেকে জানে, কোনো ভোজ্য বা পানীয়ই
পারে না তার মহৎ স্বরূপকে কলুষিত করতে।
তুমি হও সেই চিরপ্রবহমান তরস্বান তরঙ্গ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

অল্পজনই সত্যকে মূল্য দেয়। বাকি লোক, বেশি লোক,
ধিক্কার দেবে তোমাকে, উপহাস করবে।
তবু হে মহান, তাতে কান দিও না।
বিমুক্তের মত এগিয়ে চলো, দেশ থেকে দেশে,
দুঃখে নিঃশঙ্ক, সুখে স্পৃহাহীন—
আর অন্ধকার থেকে, মায়ার আবরণ থেকে
উদ্ধার করো ওদের।
সুখ-দুঃখের ওপারে চলে যাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥

এই ভাবে, দিনে দিনে, যতক্ষণ না কর্মশক্তি
চিরতরে তোমার আত্মাকে না ছুটি দেয়।

অপুনর্ভব, আর জন্ম নেই,
না আমি না তুমি, না, মানুষ না ঈশ্বর।
অহংই আত্মা আত্মাই অহং আর পরিপূর্ণ আনন্দ।
জেনো তুমিই সেই আনন্দ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
বলো, বলো উচ্চঘোষে, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ॥

কী কোমলতা, কী ধৈর্য স্বামীজির। তিনি বয়সে কত ছোট কিন্তু মহিলা দুটির মনে হত তিনি যেন তাদের স্নেহাতুর পিতা, সব সময়ে লক্ষ্য কী ভাবে তাদের যত্ন করবেন, সেবা করবেন। আরো মনে হত যেন ব্রহ্মাকে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। তবু সহজের সঙ্গে সামান্যের সঙ্গে তাঁর কী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

'চলো তোমাদের জন্যে কিছু রান্না করি।'

স্বামীজি রান্নাঘরে ঢুকলেন। উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধতে লাগলেন একমনে। একটা ভারতীয় খাদ্য খাওয়াবেনই তাঁর শিষ্যদের।

কী অগাধ করুণা, কী অপার ভালোবাসা।

'স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে বিশ্রামসুখ অনুভব করবে—এর জন্যে বসে থেকো না।' স্বামীজি শিষ্যদের উপদেশ করছেন : 'এইখানেই একটা বীণা নিয়ে সুর করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্যে কেন মিছে অপেক্ষা করা? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল।'

আবার বলছেন :

'যদচ্যুত-কথালাপ-রস পীযূষ-বর্জিতম।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম॥'

সেই দিনই দুর্দিন যেদিন ভগবৎপ্রসঙ্গ না করি। যেদিন মেঘাচ্ছন্ন সেদিন দুর্দিন নয়।

সব সময়ে ঈশ্বরের চিন্তা করো। অন্যের সঙ্গে বলো শুধু ঈশ্বরকথা। তুমি যীশুর উপর তোমার ভার দাও তা হলে তোমাকে নিরন্তর যীশুকেই চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তার ফলে তুমি তদভাবাপন্ন হবে।

সকল কাজই মনে হবে যীশুর কাজ। এই অবিচ্ছিন্ন চিন্তার নামই ভক্তি বা প্রেম।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। ভক্তিই সবচেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোনো যুক্তিতর্কের স্থান নেই। ভক্তি স্বয়ং প্রমাণ, এতে অন্য কানো প্রমাণের অপেক্ষা নেই। যুক্তিতর্ক কাকে বলে? কোনো বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। অর্থাৎ মনের জাল ফেলে কোনো বস্তুকে ধরে ফেলা আর বলা, প্রমাণ করেছি। সাধ্য নেই কোনো কালে জাল ফেলে ঈশ্বরকে ধরি। তিনি যে মন বুদ্ধি অহঙ্কারের বাইরে।

ভক্তিযোগের প্রথম কথা, ঈশ্বরের জন্যে প্রবল অভাববোধ। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই যেহেতু জড়জগত থেকেই আমাদের সব বাসনার পবণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন জড়জগতেই সীমাবদ্ধ ততদিন আমাদের ঈশ্বরের জন্যে অভাববোধ নেই। কিন্তু যখন আমরা চারদিক থেকে ঘা খেতে থাকি, ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোনো বস্তুর জন্যে আমাদের প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়। তখনই সুরু হয় আমাদের ঈশ্বরসন্ধান।

ভক্তি আমাদের কোনো প্রবৃত্তিকেই ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের এই শিক্ষা যে আমাদের সকল প্রবৃত্তিই মুক্তির উপায়-স্বরূপ হতে পারে। ঐ সব প্রকৃতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করো। ে ভালোবাসা অনিত্যে দিয়ে রেখেছ, সেই ভালোবাসাই দাও এবার ঈশ্বরকে।

যদি ভগবানকে ভালোবাসতে চাও, ভক্ত হতে চাও, তোমার বাসনাগুলো পুঁটলি করে বেঁধে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢোকো। ভগবান রাজার রাজা, আমরা তাঁর কাছে ভিক্ষুকের বেশে যাব কেন? দোকাদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, কেনা-বেচা চলবে না সেখানে। বাইবেলে পড়নি যীশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মন্দির থেকে।

ভক্তি বা প্রেমের পথে বিনা চেষ্টায় মানুষের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে, যেমন ধরো স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। ভক্তিই স্বাভাবিক

পথ আর সে পথে যেতেও বেশি আরাম। জ্ঞানমার্গ কী রকম? যেন প্রবলবেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে সত্বর বস্তু লাভ হয় বটে কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ করো। ভক্তিমার্গ বলে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করো। এ পথ দীর্ঘ বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ঈশ্বর বলে কেউ যদি নাও থাকেন তবুও প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো। কুকুরের মত পচা মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভালো। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শই ঈশ্বর, তাই বেছে নাও, আর সেই আদর্শে পৌঁছুবার জন্যে সারা জীবন নিয়োজিত করো। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্যে জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই, পারে না হতে। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।'

বাইবেলে মার্থা-মেরীর কথা মনে পড়ে? তারা দু বোন, প্রভু যীশু একবার গিয়েছিলেন তাদের বাড়ি। তাঁকে সামনে দেখে এক বোন তা ভাবানন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল, আরেক বোন ব্যস্তসমস্ত হয়ে যোগাড় করতে লাগল খাবার-দাবার। যীশুকে বললে, প্রভু, বিচার করো, আমার বোনের কাণ্ডটা দেখ। আমি তোমার জন্যে ছোটাছুটি করে খেটে-খেটে মরছি আর ও দিব্যি তোমার সামনে চুপচাপ বসে আছে।'

যীশু বললেন, তোমার বোনই ধন্য, সে সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করেছে।

গৌরাঙ্গকে দেখে একজনের তাই হয়েছিল। কাঁদছে আর বলছে, সংসার আর আমার দেখা হবে না। আমার চোখ গৌরকে যেই একবার দেখেছে অমনি ডুবে মরেছে। আর তা ফিরে আসবে না আমার কাছে, দেখাবে না আর জগৎশোভা। আমার পোড়া মনও ডুবেছে, হায় সে ভুলে গেছে সাঁতার দিতে, ভুলে গেছে কূলে ফিরতে।

দুটো পথ—নেতিমার্গ জ্ঞানের আর ইতিমার্গ ভক্তির। জ্ঞান বড় দুর্গম স্থান। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' ব্রহ্মজ্ঞানে

গুরুশিষ্যের ভেদ বোঝা যায় না। ভক্তিতে তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা আমি সন্তান, তুমি প্রিয়তম আমি সেবিকা। ভালোবেসে কী হবে? এ নির্বোধের প্রশ্ন আর কোরো না। আনন্দ পেতে এসেছ, একমাত্র ভালোবাসাতেই তো আনন্দ। শুধু ভালোবাসো, আর কিছু চেয়ো না, প্রেমপাত্র নিঃশেষ হবার নয়। কেন তীরে দাঁড়িয়ে আছ? প্রেমযমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, ডুবে যাও, মিশে যাও। তলিয়ে যাও।

নারদ রামকে বললে, প্রভু, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে। রাম বললে, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ বললে, প্রভু, আর কিছুই চাই না, শুধু অবিচলা সুনির্মলা ভক্তিই আমার প্রার্থনা।

ভক্তেরই সম্পুর্ণ জগদেব নন্দনবনং।

হে স্রোতস্বিনী, তোমার অন্তরের জলভারই তোমাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে। প্রেমই তোমার পথ যে-পথ ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁচেছে। ধীরে চলছ তাতে ক্ষতি কী। যে নদী ধীরে চলে সে মানুষের দিক আর ঈশ্বরের দিক দুই দিকই সিক্ত করে উর্বর করে চলে।

শুধু চলো, শুধু চলো, রূপসাগর পেরিয়ে অরূপের বন্দরে।

৬৮

বেড়াতে বেরিয়েছেন স্বামীজি। শিষ্য-শিষ্যারা যারা সঙ্গ নিয়েছে তাদের থেকে খানিক এগিয়ে গিয়েছেন বোধহয়।

এ পথ ও পথ করে এ কোন পথে ঢুকে পড়লেন।

সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। 'ছি ছি কী হবে?'

'ওঁকে ধরে নিয়ে এস।' অস্ফুট স্বরে বলাবলি করতে লাগল সবাই, 'অন্য পথে নিয়ে চলো।'

কিন্তু এই আত্মভোলাকে কে নিবৃত্ত করবে? যে নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ে পথ চলে তার বিধিই বা কী, নিষেধেই বা কী!

রাস্তার দুপাশে সারবন্দী ঘর, দুয়ারে সাজসজ্জা-করা কতকগুলি

মেয়ে দাঁড়িয়ে। স্বামীজি তাদের লক্ষ্যের মধ্যেই আনছেন না, ভাবাবেশে চলেছেন আপন মনে।

মেয়ের দল দূর থেকে দেখতে পেয়েছে স্বামীজিকে। কে এই উন্নতদর্শন সুন্দর যুবাপুরুষ! হুতাশনে যাদের পতঙ্গবৃত্তি তারা স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি এই রাজপুত্র আমার আলয়ে পদার্পণ করেন! যদি পারি এঁকে অভিনন্দন করতে!

ব্রহ্মচর্যপ্রদীপ্ত নেত্রে সেই উদারধী উদাসীন চললেন এগিয়ে।

মেয়েগুলো নানা রকম অঙ্গভঙ্গি সুরু করল। ঢেউ তুলল লাস্য-লালিত্যের। কলহাস্যের।

স্বামীজি দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন শিষ্যদের, এরা কারা?

'আপনি চলে আসুন।' লজ্জিত শিষ্যের দল উপরোধ করল।

'চলে যাব কেন? ওরা যে আমাকে ডাকছে ইশারা করে। এস-এস বলছে।' স্বামীজি সরল শিশুর মুখে জিগগেস করলেন, 'ওরা কারা?'

শিষ্য-শিষ্যারা মাথা নোয়াল। বললে, 'এটা পতিতার পল্লী।'

স্বামীজি ফিরলেন। ধীর পায়ে মেয়েদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কারুণ্যপরিপূর্ণ চোখে তাকালেন মুখগুলির দিকে। স্নেহস্বরে বললেন, 'আহা, দুখিনী বাছারা আমার!'

এমনটি শুনতে পাবে এ কখনো কেউ ভাবেনি। সন্তান বলে সম্বোধন করছে? ঘৃণা নয়, ক্রোধ নয়, শৃঙ্গারচেষ্টা নয়—জানাচ্ছে আত্মীয়ের মমতা! এ কে অভিনব! যে মুহূর্তে কলুষপরিবেশে নিয়ে আসতে পারে শুচিস্পর্শ সমীরণ! এ যেন এক রাতের অতিথি নয়, এ অখণ্ড জীবনের অধীশ্বর।

মেয়েগুলি পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। না থাকল বিলোল অঙ্গভঙ্গি, না বা কামকটাক্ষের কুটিলতা। এ যেন তাদের সামনে এক মহিমান্বিত আবির্ভাব, আর তার সামনে তাদের ভাষা একমাত্র প্রার্থনার ভাষা।

'এ তোমরা কী করছ?' গভীর শান্তির সুরে বললেন স্বামীজি, 'তোমাদের এ দেহ ঈশ্বরের মন্দির, তাকে কেন পঙ্কে ফেলে রেখেছ?

আরো কত বড় সম্ভোগের সংবাদ দিতে পারে দেহ, আরো কত প্রসাদস্বাদের সম্ভাবনা! এই দেহ তো অমৃতপাত্র, তাকে কেন মদিরার ভাণ্ড করে তুলছ? এই মদিরার আয়ু কতটুকু, তীব্রতা কতক্ষণ? নিঃসীমমহিমা মহামায়া তোমরা, যদি নাও একবার সেই মুক্তির স্পর্শ অমৃতের স্পর্শ, দেখবে তাতে ইতি নেই, বিরতি নেই, আসক্তি-বিরক্তি নেই, জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে তা অফুরন্ত ঝরে পড়ছে।'

মেয়ের দল, কোথায় হাত ধরে টানাটানি করবে, স্বামীজির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। এ যেন তাদের সামনে স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট এসে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত পাপ আর লজ্জার যেন স্খালন হয়ে গেল মুহূর্তে। শূন্যতা শুষ্কতা ও শ্রীহীনতার লেশমাত্র রইল না। উড়ে গেল অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপ। সকলে অন্তরে শুনতে পেল দিব্যকণ্ঠের সম্ভাষণ। তোমার এখনও সময় আছে, সব সময়েই সময় আছে। একবার অভিমুখী হও, নাও তোমার অমেয় সম্ভাবনার সংবাদ। সুযোগে-দুর্যোগে যেকোনো অবস্থায় যদি একবার শরণাগত হও তা হলেই তুমি আর প্রত্যাখ্যাত নও।

'শূকর কখনো মনে করে না সে অশুচি বস্তু খাচ্ছে, ঐ তার স্বর্গ।' বলছেন স্বামীজি, 'আর যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তার নিকটে এসে দাঁড়ায় সে তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ভোজনেই তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত। মানুষের সম্বন্ধেও তাই। ঐ শূকরশাবকের মতই তারা গভীর বিষয়পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে, তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দ্রিয়সুখভোগের অপ্রাপ্তিই তাদের কাছে স্বর্গবিচ্যুতির মত। তারা কেবল লুচিমণ্ডারই স্বপ্ন দেখছে, তাদের স্বর্গের স্বপ্নও ঐ লুচিমণ্ডার স্বপ্ন। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ধারণা, স্বর্গ একটা ভালো মৃগয়ার জায়গা। আমাদের নিজ-নিজ বাসনার অনুরূপই স্বর্গের ধারণা। কিন্তু কে যেতে চায় স্বর্গে? নাস্তিক চায় না, যেহেতু সে স্বর্গের অস্তিত্বই মানে না। ভক্তও চায় না, যেহেতু স্বর্গ তার কাছে একটা ছেলেখেলামাত্র। ভক্ত কেবল চায় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ছাড়া জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কী হতে পারে? ঈশ্বরই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য সর্বোত্তম আদর্শ। সেই ঈশ্বরকেই দেখ, ঈশ্বরকেই সম্ভোগ করো। ঈশ্বরই

পূর্ণস্বরূপ। তেমনি প্রেমের চেয়েও উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করতে পারিনা: প্রেমই আনন্দস্বরূপ।

সংসারের সাধারণ স্বার্থপর যে ভালোবাসা তা অন্তঃসারশূন্য, অল্পস্থায়ী। স্ত্রী স্বামীকে খুব ভালোবাসে, যেই একটি ছেলে হল অমনি অর্ধেক বা তারও বেশি ছেলেটির প্রতি গেল। স্ত্রী নিজেই টের পাবে যে স্বামীর প্রতি তার আর সেই পূর্বের আকর্ষণ নেই। অহরহই আমরা দেখছি, যখনই অধিক ভালোবাসার বস্তু আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন আগের ভালোবাসা ম্লান হয়ে যায়, অন্তর্হিতও হয় বা ধীরে ধীরে। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু স্ত্রী রোগে বিধ্বস্ত হলে, রূপযৌবন হারিয়ে বিকৃতাকৃতি হলে অথবা সামান্য দোষ করলে তার দিকে আর চেয়েও দেখে না। ঈশ্বরের ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন নেই। আর তিনি সর্বদাই সর্বাবস্থায়ই আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বলো এমন জনকে ভালোবাসব না? যার মনে ক্রোধ নেই ঘৃণা নেই, যাঁর সাম্যভাব কখনো নষ্ট হয় না, যিনি আজ অবিনাশী—তাঁকে ছাড়া আর কাকে ভালোবেসে আমরা পরিপূর্ণ হব?

কী বলছেন যীশু? বলছেন, 'চাও, তবেই তোমাদের দেওয়া হবে। ঘা দাও, তবেই খুলে যাবে দরজা। খোঁজো তবেই পাবে মনোনীতকে।' চায় কে? খোঁজে কে? আমাদের চলতি কথায় বলে, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। গরিবের ঘর লুট করে বা পিঁপড়ে মেরে কী হবে? যদি নিতে হয় ভগবানটাকেই নেব। তাই ভক্তিই সর্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বছরেও আমরা এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে পারি কিনা জানি না, কিন্তু একেই সর্বোচ্চ আদর্শ করতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছানো নাও যায়, কিছু দূর পর্যন্ত তো যাওয়া যাবে। এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করেই ধীরে ধীরে এগুতে হবে ঈশ্বরের কাছে, যে প্রচ্ছন্নতম হয়েও প্রস্ফুটতম।'

'শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কারু-কারু অভিযোগ এই যে তিনি গণিকা-

দের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন না।' বলছেন স্বামীজি, 'এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের উত্তরটি মনোরম : শুধু রামকৃষ্ণ নয়, অন্যান্য ধর্মগুরুরাও এই অপরাধে অপরাধী। আহা, কী মধুর কথা! বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী আম্রপালী ও হজরতের দয়াপ্রাপ্তা সামরিয়া নারীর কথা মনে পড়ে। দারুণ অভিযোগই বটে—মাতাল, বেশ্যা, চোর দুষ্টদের মহাপুরুষেরা কেন দূর-দূর করে তাড়াতেন না, আর চোখ বুজে কেন ছেঁদো ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কথা বলতেন না! আক্ষেপকারীর এই অপূর্ব পবিত্রতা ও সদাচারের আদর্শে জীবন গড়তে না পারলেই ভারত রসাতলে যাবে। যাক রসাতলে যদি ঐ রকম নীতির সহায়ে উঠতে হয়!'

'গণিকারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পারে তো কোথায় যাবে?' আরো বলছেন স্বামীজি, 'পাপীদের জন্যেই প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্যে তত নয়। মেয়েপুরুষ-ভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ—নরকের দ্বার এ সমস্ত ভেদ সংসারের মধ্যে থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থানেও যদি ঐরূপ ভেদ হয়, তাহলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কী? আমাদের মহাজগন্নাথপুরী—যেখানে পাপী, অপাপী, সাধু, অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের অধিকার—বছরের মধ্যে একদিন অন্তত হাজার-হাজার নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে হরিনাম করে ও শোনে, এইহ পরম মঙ্গল।

যারা ঠাকুর ঘরে গিয়েও ঐ পতিত পাপী ঐ নীচ জাত ঐ গরিব ঐ ছোটলোক ভাবে, তাদের, অর্থাৎ যাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো, সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল। যারা ভক্তের জাতি বা ব্যবসা দেখে তারা আমাদের ঠাকুরকে কী বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, শতশত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে। বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে তো নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। 'বরং একটি উট ছুঁচের গর্তের ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু ধনীব্যক্তি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।'

যিনি তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক গণিকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, যাও, তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও

আর তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর, জীবনবলি, যাদের তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেই সব দীন-দরিদ্র পতিত-উৎপীড়িতের জন্যে।'

আর বলো, মেয়েমাত্রই মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা। ভারতে আমরা যখন আদর্শ রমণীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তার আরম্ভ, মাতৃত্বেই তার শেষ। ভগবানকে তাই আমরা মা বলে ডাকি। পাশ্চাত্ত্যে নারী স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতে কেন্দ্রীভূত। এদেশে আমি এমন পুত্র দেখিনি যে মাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত। বলছেন বিবেকানন্দ: মৃত্যুসময়েও আমরা স্ত্রী-পুত্রকে মায়ের স্থান অধিকার করতে দিই না। যদি আগে মরি তবে তাঁর কোলেই মাথা রেখে মরতে চাই। নারীর নারীত্ব কি শুধু এই রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে জড়িত? দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকতে হবে এমন আদর্শ কল্পনা করতেও হিন্দু ভয় পায়। মা এই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন শব্দ আছে যার সম্মুখীন হতে কাম সাহস করে না, যাকে কোনো পশুত্বই পারে না স্পর্শ করতে। সেই অপূর্ব স্বার্থলেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাস্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ। স্ত্রী তার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া মাত্র।

বিবেকানন্দের আরো কথা: পশ্চিমে যে নারীপূজার কথা শুনে থাকি সাধারণত তা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা, তাঁর পূজা। আমি নিজে দেখেছি, সমাজ যাদের ছোঁবে না, তিনি সেই পতিতাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, শেষে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পদতলে পড়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলছেন, মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হয়ে আছ। তোমাকে প্রণাম করি মা, তোমাকে প্রণাম করি। ভেবে দেখ সেই জীবন কত ধন্য যার থেকে সমস্ত রকম পশুভাব চলে গিয়েছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেছেন, যাঁর কাছে সকল নারীর মুখই জগদ্ধাত্রীর মুখ। এই আমাদের চাই। রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তা তোমরা কী করে ঠেকাবে? কী করে ঠকাবে?'

'ঈশ্বরে বিদ্যা-অবিদ্যা দুইই আছে।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় অবিদ্যা মায়া মানুষকে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে আরেক ধাপ উপরে উঠবেই ব্রহ্মজ্ঞান। এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্ছে ঠিক দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। ত্যাজ্য গ্রাহ্য থাকে না। কারু উপর রাগ করবার যো নেই। গাড়ি করে যাচ্ছি, দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। যখন এই অবস্থা প্রথম হল তখন মা কালীকে পুজো করতে বা ভোগ দিতে পারলাম না। হৃদে আর হলধারী বললে, খাজাঞ্চী বলেছে ভটচাজ্জি ভোগ দেবে না তো কী করবে? সঙ্গে কুবাক্য উচ্চারণ করেছে খাজাঞ্চী। কুবাক্য বলেছে শুনেও হাসতে লাগলাম, একটুও রাগ হল না। আবার বলছেন খানিকপর : 'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি। ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তো কাজ হবে। তখন, সে অবস্থায়, অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বর। দেখবে তিনিই দেহ, তিনিই মন, তিনিই প্রাণ, তিনিই আত্মা।'

'তখন মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার পাত্র কোনো মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃৎখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছেন স্বামীজি, 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসবে যদি সে ভাবে, স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে আরো বেশি ভালোবাসবে যদি সে জানে, স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপা। তিনিই স্ত্রীতে তিনিই স্বামীতে বর্তমান। তোমার স্ত্রী থাক তাতে ক্ষতি নেই। তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে এর কোনো অর্থ নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখ। আর তুমি স্ত্রী, তোমার স্বামীর মধ্যে দেখ নারায়ণকে।'

'তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেও ঈশ্বরদর্শন হয়। তেমন টোপ হলে বড় রুই-কাতলা কপ করে খায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার ঘটে। গোপীরা সর্বভূত কৃষ্ণময় দেখেছিল। গাছ দেখে বললে, এরা

তপস্বী, কৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বললে, কৃষ্ণের পদস্পর্শে এ হচ্ছে পৃথিবীর রোমাঞ্চ। পতিব্রতাধর্মে স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায় পূজা হয় আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না?'

'ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে,' বলছেন আবার ঠাকুর: 'তাহলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে। আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে। জানো, স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়, যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝনঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো। স্ত্রীসম্ভোগ স্বপনেও হল না।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক ভবনাথ বিয়ে করে সংসারে পড়েছে। তার জন্যে ঠাকুর খুব চিন্তিত। নরেন তার বন্ধু, তাকে বলছেন বারে-বারে, ওরে ওকে খুব সাহস দে।

ভবনাথ বলছেন, 'খুব বীর পুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্না, তাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না! ভগবানে ঠিক মন রাখবি। পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীর কথা কইবি।'

'জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমে বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করতে হবে,' বলছেন স্বামীজি, 'আর তারই সাহায্যে মাতৃপূজার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। ভারতীয় রমণীদের যে রকম হওয়া উচিত সীতা তার আদর্শ। সীতা শুদ্ধ হতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠামূর্তি। বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে যিনি মহাদুঃখের জীবন যাপন করেছিলেন, সেই সাধ্বী সেই সদাশুদ্ধা শুধু নরলোকের নয় দেবলোকেরও আদর্শভূতা। সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বিরাজ করবেন। তিনি আমাদের জাতির মজ্জায়-মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়েছেন, আমাদের প্রতি শোণিতকণায়। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। তিতিক্ষার প্রতিমূর্তিই সীতা, সর্বংসহা, সদাপতিপরায়ণা। এত দুঃখ এত অবিচার, তবুও চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের কোনো প্রতিকার হল না তাতে কেবল জগতে আরেকটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হল। ভারতের এই বিষয়ে ভাবটিই সীতার প্রকৃতিগত।'

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেকের আক্ষেপ এই যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করেছেন। তাতে কী বলছেন ম্যাক্সমুলার? বলছেন, 'তিনি স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন। আর যতদিন তিনি মর্তকায়ায় ছিলেন, তাঁকে গুরুভাবে গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় পরমানন্দে ব্রহ্মচারিণীরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।' আরো বলছেন অধ্যাপক: 'শরীর সম্বন্ধ না থাকলে কি বিবাহে এতই অসুখ? শরীর সম্বন্ধ না রেখে ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করে ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে এ বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা সফলকাম হয়নি বটে কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে কামজিৎ অবস্থায় থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি।'

'অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' স্বামীজি বলছেন উল্লসিত হয়ে: 'ব্রহ্মচর্যই ধর্মলাভের একমাত্র উপায় বিজাতি বিদেশী হয়েও ম্যাক্সমুলার তা বোঝেন আর ভারতে যে সে রকম ব্রহ্মচারী বিরল নয় এও তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই পান না খুঁজে।'

যিনি বরসুধা ভক্তগণদীপিকা, ধারাধরশ্যামলা, কুমারীপূজনপ্রসন্না, গগনগা, গায়ত্রীস্বরূপা, ধরিত্রীরূপিনী সেই শিবসতী কারুণ্যবারিনিধি জননী ভগবতীকে ভাবনা করি।

যিনি অরুণকমলসংস্থা, রজঃপুঞ্জবর্ণা, চতুর্ভুজা, দু করে দুটি কমল আর দু করে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা, প্রকোষ্ঠে মণিময় বলয়, সেই বিচিত্রালঙ্কৃতা ভুবনমাতা পদ্মাক্ষী মহালক্ষী আমাদের শ্রীমন্ত করুন।

হে পরম ব্রহ্মমহিষী, আগমবিদ জ্ঞানীরা ব্রহ্মার পত্নীকে বাগদেবী ক্রিয়াশক্তি বলে, হরিপত্নীকে পদ্মা জ্ঞানশক্তি বলে, অদ্রিতনয়াকে হরসচরী ইচ্ছাশক্তি বলে। কিন্তু হে মহামায়ে, ত্রিশক্তির অতীত ত্রিগুণাতীতা চতুর্থী চিতিশক্তি তুমি কে? হে দুরধিগম্যা, নিঃসীমমহিমা তুমি এই বিশ্বকে ভ্রামিত করছ। হে নিধে, নিত্যস্মরে, নিরবাধগুণে—হে বিশ্ব-আধারভূতে, নিত্যহাস্যাননা, অসীমগুণশালিনি, হে নীতিনিপুণে

বেদান্তবেত্তাচিত্তবাসিনি, নিয়তিনির্মুক্তে, নিখিলবেদান্তস্তুতপদে, নিত্য নিরাতঙ্কে, আমার এই স্তবকে বেদতুল্য প্রামাণ্য করে দাও।

৬৯

'এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি: 'যদিও আমার বিরুদ্ধে মিশনারিদের গালিগালাজের কমতি নেই। আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত গল্প তৈরি করে প্রচার করছে তা যদি শোনো অবাক হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও যে সন্ন্যাসী হয়ে আমি ক্রমাগত ও-সমস্ত কুৎসিত আক্রমণের প্রতিবাদ করে বেড়াব? আত্মসমর্থনে ছড়িয়ে বেড়াব প্রশংসার চিঠি? আর তোমরা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুবে? লড়াই করবার ভারটা তোমরা নিতে পারো না? তাহলে আমি নিশ্চিন্তে আমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারি প্রাণপণে।

এখানে আমি দিনরাত অচেনাদের মধ্যে কাজ করছি, প্রথমত, অন্নের জন্যে, দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করে ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু ভারত কী সাহায্য পাঠাচ্ছে জিগগেস করি? এদেশের অনেকে তোমাদের 'অর্ধনগ্ন বর্বর জাতি বলে মনে করে, সেই কারণে ভাবে সে চাবুক মেরে তোমাদের মধ্যে সভ্যতা ঢোকাতে হবে। এর উলটো দিক তোমরা দেখাও না কেন? তোমরা কিছুই করতে পারো না, শুধু কুকুর বেড়ালের মত বংশবৃদ্ধি করতে পারো। যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্টু মিশনারিদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকো, একটা কথাও না বলো, তাহলে এই সুদূর দেশে আমি একা লোক কী করব বলো? তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্মের সমর্থনে কেন লিখে পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রাখছে? বোস্টনের এরিনা মাসিক পত্র তোমাদের লেখা সানন্দে ছাপবে আর যথেষ্ট টাকা দেবে। তোমরা তা করবে কেন? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সব বিষয়ে তোমরা কাপুরুষ। তোমরা শুধু একজন সন্ন্যাসীকে

খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে চাও, আর তোমরা নিজেরা সাহেব দেখলেই ভয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকবে। কথাটি কইবে না।

তোমরা জানো, আমি এ দেশে নাম-যশ খুঁজতে আসিনি, যদি তা এসে পড়ে থাকে সেটা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে। এ পর্যন্ত যে সব হতভাগ্য হিন্দু এ দেশে এসেছে তারা অর্থ ও সম্মানের জন্যে নিজের দেশ ও ধর্মের কেবল কুৎসা করেছে। আমি সে দলের নই। আমি যদি বিষয়ী হতাম, তবে এখানে একটা বড় সঙ্ঘ ফেঁদে বেশ গুছিয়ে নিতে পারতাম। হায়, হায়, এখানে ধর্ম বলতে এর বেশি কিছু বোঝায় না। টাকার সঙ্গে নামযশ এই হল পুরোতের দল। আর টাকার সঙ্গে কাম এই হল সাধারণ গৃহস্থ। আমাকে এখানে একদল নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী আর যারা সংসারউদাসীন। ভয় নেই, আমি কারু সাহায্য চাইনে। আমি নিজের মস্তিষ্ক ও দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যেই সব করব।

ভারতে গিয়ে আমি কী করব? মাদ্রাজে তেমন লোক কোথায় যে ধর্মপ্রচারের জন্যে সংসার ত্যাগ করবে? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একসঙ্গে একদিনও চলতে পারে না। আমিই একমাত্র লোক যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছি এদেশে, আর এদেশের নিন্দুকের দল নিন্দুকদের কাছ থেকে যা আশা করেনি তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইঁট মেরেছে তার বদলে আমি ছেনি পাটকেল মেরেছি—সুদে-আসলে। কখনো আমি তোমাদের মত কাপুরুষ হব না, কাজ করতে-করতেই মরব, করব না পলায়ন। না, কখনো না।

মানুষের মন রেখে কথা বলতে নারাজ স্বামীজি। তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা কত তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে একটু নরম হয়ে কথা বলতে, কিন্তু সিংহকে তিনি মেষশাবকের অনুপাতে নিয়ে আসতে রাজি নন। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবে হেল-পরিবারের লোকেরাও যেন বিব্রত বোধ করছে। ওঁর দৃঢ়তাকে মনে করছে বা নম্রতার অভাব। মিস হেল অভিযোগ করে চিঠি লিখল স্বামীজিকে। তাতে একটু বুঝি বা তিরস্কারের ছোঁয়াচ।

উত্তরে লিখছেন স্বামীজি :

'তোমার সমালোচনার জন্যে আমি আনন্দিত। সেদিন মিস থার্সবির বাড়িতে এক প্রেসবাইটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছিল, আর যেমন রেওয়াজ, সেই ভদ্রলোক ভীষণ তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আমিও বিশেষ ঠাণ্ডা ছিলাম না। এর জন্যে মিস বুল আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, বলেছিলেন ও রকম বাদানুবাদে আমার কাজ ব্যাহত হয়। এখন দেখছি তোমারও সেই মত। আমিও এ বিষয় ভেবে দেখেছি। শোনো, এসবের জন্যে আমি মোটেও দুঃখিত নই, আমার এক বিন্দু অনুতাপ নেই। হয়তো এ শুনে তুমি বিরক্ত হবে কিন্তু আমি অনুপায়। আমি জানি যার পার্থিব বিষয়ে লক্ষ্য তার পক্ষে মধুর হওয়া কত সুবিধে, কিন্তু যখন অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে মীমাংসার প্রশ্ন আসে তখন আর মাধুর্যে আমি সম্মত নই। আমি নম্রতায় বিশ্বাস করি না, আমার বিশ্বাস সমদর্শিতায়, সকলের প্রতি মনোভাবের সমত্বে। সাধারণ লোকের কর্তব্যই হচ্ছে তার সমাজরূপী দেবতার তাঁবেদারি করা—যারা জ্যোতির তনয় তাদের তা ধর্ম নয়। সাধারণ লোক কী করে? তারা তাদের পারিপার্শ্বের নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। আর যা আকাঙ্ক্ষিত তাই আদায় করে নেয়। যে জ্যোতির তনয় সে ও-সব সঙ্কীর্ণ হিসেবের ধার ধারে না। সে একা দাঁড়ায়, দূরে দাঁড়ায় আর সমস্ত সমাজকে তার কাছে তুলে নিয়ে আসে। সাধারণ সুবিধাবাদী লোক গোলাপ-বিছানো রাস্তা বাছে আর সত্যের সন্তানেরা কণ্টকাকীর্ণ পথেই যাত্রা করে। জনমতসেবীরা অচিরে ধ্বংস হয় আর যারা সত্যের সন্তান তাদেরই অমেয় পরমায়ু।

প্রেসবিটেরিয়ান পুরোতের সঙ্গে ও পরে মিসেস বুলের সঙ্গে আমার তীব্র সঙ্ঘর্ষ আমাকে আমাদের মনুর সেই কথাটাই সবলে মনে করিয়ে দিচ্ছে : অবস্থান করো একাকী, বিচরণ করো একাকী। ভগিনী, পথ দীর্ঘায়ত, সময় স্বল্প, সন্ধ্যা সমাসন্ন—শিগগিরই আমাকে ফিরে যেতে হবে গৃহে। আমার আদবকায়দায় পালিশ বুলোবার আমার আর সময় নেই—আমার পরমবক্তব্যকেও হয়তো সম্পূর্ণ বলে যেতে পারব না।

তুমি কত ভালো, কত তোমার দয়া, রাগ কোরো না, তোমরা শিশু, শিশু ছাড়া কিছু নও।

মিসেস বুল-এর মত যদি তুমি ভেবে থাকো আমার কোনো কাজ আছে, তাহলে বলব, তোমার ভীষণ ভুল হচ্ছে। পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাইরে আমার কিছুই করণীয় নেই। শুধু আমার এক বক্তব্য আছে—তা আমি তা নিজের ধরনে প্রচার করব, তা আমি হিন্দুত্বের ছাঁচে ঢালবনা, না বা খ্রীষ্টিয়ানির ধাঁচে—আমার বক্তব্য, শুধু তা আমারই ধাঁচে হবে। ব্যস, এই কথা। মুক্তি—মুক্তিই আমার ধর্ম, আর যা কিছু তাকে প্রতিহত করতে চায় তাকে আমি পরাভূত করব, হয় প্রহারে নয় পরিহারে। পুরোতদের ঠাণ্ডা করতে হবে, তাদের সঙ্গে মিটমাট আর তারই জন্যে নরম হওয়া, মধুর হওয়া অসম্ভব, ভগিনী, অসম্ভব!'

সকলের চেয়ে বেশি পাপ হচ্ছে, নিজেকে দুর্বল ভাবা। বলছেন স্বামীজি : তোমার চেয়ে বড় আর কে আছে? উপলব্ধি করো যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যেখানে যা শক্তির বিকাশ দেখছ, ভাবো, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

আমরা সূর্য চন্দ্র তারা, সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে। মন্দ বলে কিছু আছে এটি স্বীকার কোরো না, যা নেই তাকে আর সৃষ্টি কোরো না নতুন করে। সদর্পে বলো আমিই আমার প্রভু, সকলের প্রভু। আমরাই নিজের-নিজের শৃঙ্খল গড়েছি আর আমরাই ইচ্ছা করলে ভাঙতে পারি সে শৃঙ্খল।

স্বাধীনতার অপূর্ব মুক্তবায়ু সম্ভোগ করো। তুমি তো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত। অবিরত বলো আমি সদানন্দস্বভাব, মুক্তস্বভাব, আমি অনন্ত স্বরূপ। আমার আত্মাতে আদি-অন্ত নেই।

চিত্ত শুদ্ধ করো, ধর্মের এই হচ্ছে সার কথা। অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফল পাওয়া যায়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করো। নিজেকে পুরুষত্বহীন কোরো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে। এই শক্তিটা যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত বেশি কাজ

হবে। প্রবল জলের স্রোত পেলেই তার সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে।

যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না। আমার নিজের ভিতরে দোষ আছে বলেই তো অপরের ভিতরে দোষ দেখি। প্রত্যেক নরনারী বালকবালিকার মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করো, অন্তর্জ্যোতি দিয়ে তাঁকে দেখ। যে যা চায় সে তাই পাবে, সুতরাং সংসারকে চেয়োনা, ভগবান, একমাত্র ভগবানকেই চাও, ভগবানকেই অন্বেষণ করো। যত অধিক শক্তি লাভ হবে ততই বন্ধন আসবে ভয় আসবে। একটা সামান্য পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত বেশি ভীতু আর দুঃখী। এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করো, সৃষ্টের তত্ত্ব জেনে কী হবে ?

স্বামীজি সাত সপ্তাহ ছিলেন সহস্র দ্বীপোদ্যানে। আর, একদিন নির্জনে, সেন্ট লরেন্সের পাড়ে, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হল।

তেলাপোকা যেমন অন্য বিষয়ে আসক্তি ছেড়ে সর্বদা কাঁচপোকার চিন্তা করে তার স্বারূপ্য লাভ করে, তেমনি নিয়তনিষ্ঠায় পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যান করে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। স্থূল প্রত্যক্ষের দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্ম তত্ত্ব অসাধ্য। অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যোগ ও সমাধিবলেই তা জানা যায়। আগুনে সংস্কৃত হলে সোনা যেমন ময়লা ছেড়ে তার নিজ বিশুদ্ধ রূপ লাভ করে, তেমনি মনও ধ্যানের সাহায্যে সত্ত্বরজতম মল ত্যাগ করে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মসাজুয্য প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর অভ্যাসবলেই পরিপক্ক মনে ব্রহ্মে বিলীন হতে পারে। এই নির্বিকল্প সমাধিতেই যাবতীয় বাসনার বিনাশ হয়, অখিলকর্ম নষ্ট হয়ে যায়, অন্তরে বাহিরে যত্ন ছাড়াই স্বরূপস্ফূর্তি ঘটে। শ্রবণের চেয়ে মনন শতগুণে শ্রেষ্ঠ, মননের চেয়ে নিদিধ্যাসন বা অনন্যচিত্ততা লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ, নিদিধ্যাসনের চেয়ে নির্বিকল্প ভাব অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই, হে বৎস, গুরু বলছেন শিষ্যকে, তুমি ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রশান্তভাবে নিরন্তর পরমাত্মাতে সমাধি-অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও ও ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভূতি দ্বারা অবিদ্যাজনিত তিমিররাশি দূর করে দাও।

সহস্রদীপোদ্যান থেকে স্বামীজি ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। খেতড়ির মহারাজকে লিখছেন: 'অগাস্টের শেষে লণ্ডনে যাব মনে করেছি, সেখানে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। দেখি ওদিকের পাদ্রীদের কেমন হৈ-চৈ। আগামী শীতকাল খানিকটা লণ্ডনে খানিকটা নিউইয়র্কে কাটাতে হবে, তার পরেই আর দেশে ফেরবার আমার বাধা থাকবে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, এই শীতের পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্যে যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক কাজকেই তিনটে অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও শেষে স্বীকৃতি। যদি কেউ চলতি ভাবের বাইরে উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করে তাকে নিশ্চিত লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, আসতে দিন, সুস্বাগতম—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে আর ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই উড়ে যাবে কুয়াশা।'

আলাসিঙ্গাকে লিখছেন: 'আলাসিঙ্গা, শুধু কাজে লাগো, কাজ করো। আর মনে রেখো, মানুষ দুবার মরে না, একবার মাত্রই মরে।

একটা পুরনো গল্প শোনো। এক বুড়ো তার দরজার গোড়ায় চুপচাপ বসে আছে। পথচলতি একটা লোক তাকে জিগগেস করলে, ভাই, অমুক গাঁটা এখান থেকে কত দূর? প্রশ্নটা বুড়ো কানেও তুলল না। পথিক আবার জিগগেস করল। বুড়ো আগের মতই রইল নীরবে। সে কী, কানে শুনতে পান না, না কী বোবা? পথিক কটু করে আবার জিগগেস করল। এবারও বুড়ো নির্বাক। পথিক বিরক্ত হয়ে পথ ধরে চলতে আরম্ভ করল। তখন বুড়ো চেঁচিয়ে তাকে ডাকল, বললে, আপনি অমুক গাঁয়ের কথা জিগগেস করছিলেন না? সেটা মাইলখানেক হবে এখান থেকে। পথিক বললে, এতক্ষণ এত অনুরোধ-উপরোধ করছিলাম, কই একটা শব্দও তো করেননি, এখন জানাবার দরকার কী? বুড়ো হাসল। বললে, যতক্ষণ জিগগেস করছিলেন, নিষ্ক্রিয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন নিঃশব্দে। তাই সাহায্য করিনি। এখন দেখছি নিজের বুদ্ধিতেই হাঁটতে সুরু করেছেন, তাই জানিয়ে দিলাম কথাটা।

আলাসিঙ্গা, গল্পটা মনে রেখো। যে কাজ করে যে কাজে লাগে তাকেই ভগবান পথ দেখান। তারই সব কিছু যুগিয়ে দেন অকাতরে।

'কেবল মানুষই ঈশ্বর হতে পারে।' মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি। আবার ই. টি. স্টার্ডিকে লিখছেন: 'বাকসর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখে আমার যে ভয় পাবার কিছু নেই তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা কখনো অন্যের শত্রুতা করতে পারে না। বনবাগীশরা বক্তৃতা করুক। তার চেয়ে বেশি আর তারা কী দেবে? নামযশ কামিনীকাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর থাক। কিন্তু আমরা যেন ধর্মোপলব্ধিতে আরূঢ় হই, ব্রহ্ম হওয়ারজন্যে হই দৃঢ়ব্রত। যেন মৃত্যু পর্যন্ত আঁকড়ে থাকতে পারি সত্যকে। অন্যের কথায় যেন কান না দিই।

ভারতকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা কী! ভুলে লোকে যাকে মানুষ বলে আমরা তো সেই নারায়ণেরই সেবক। যে বৃক্ষমূলে জল সেচন করে সে কি আরেকভাবে সমস্ত বৃক্ষেরই সেবা করে না?'

লেগেট ইংলণ্ড থেকে নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এসেছে। অগাস্টের শেষাশেষি প্যারিসে রওনা হলেন স্বামীজি। রওনা হবার আগে শিকাগোতে গেলেন হেল্-দের সঙ্গে দেখা করতে। প্যারিস থেকে পাড়ি দেবেন লণ্ডন।

যাবার আগ লিখছেন আলাসিঙ্গাকে:

'মিশনারিদের নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা যে চেঁচাবে এ তো স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুবছরে মিশনারিদের ট্যাঁকে প্রকাণ্ড ফাঁক পড়েছে, তাদের অস্থির না হয়ে উপায় কী। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর উপর বিশ্বাস থাকবে আর সত্যে নিঃসংশয় মতি, ততদিন, হে বৎস, কোনো কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তবে ঐ তিনটের একটা যদি চলে যায় বা টলে যায় তাহলেই বিপদ। তাহলেই পতন।

আমি সত্যে বিশ্বাসী। যেখানেই যাইনা কেন প্রভু আমার জন্যে দলে-দলে কর্মী পাঠান। আর তারা ভারতীয় শিষ্যের মতন নয়, তারা

তাদের গুরুর জন্যে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্তৃব্যে বিশ্বাসী নই। কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর অভিশাপ, সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে কিছু নেই। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—আমার আবার কর্তব্য কী। এ শরীর কোথায় যায় না যায় তা আমি গ্রাহ্য করি না।

তোমাদেরই বা ঠিক-ঠিক ধর্মভাব কোথায়? তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর, তোমাদের শাস্ত্র ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয় নিজেদের মত রাশি-রাশি সন্তান-জন্মদান। তোমরা যেন সেই প্রাচীন কালের ইহুদী—সেই গল্পের কুকুরের মত নিজেরাও খাবে না অন্যকেও খেতে দেবে না। তোমরা কয়েকটি ছেলে, সন্দেহ নেই, খুব সাহসী, কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হয় তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। কিন্তু আমি বিশ্বাসে নির্বিচল। আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমার এক সত্য জগৎকে শেখাবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তিনিই আমাকে বীর্যবত্তম সহকর্মী জুটিয়ে দেন। অপেক্ষা করো, দেখবে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রভু পাশ্চাত্ত্য দেশে কী কাণ্ড করেন।'

৭০

'যাঁর প্রেমপ্রবাহ আচণ্ডাল, অপ্রতিহতগতি, যিনি লোকাতীত হয়েও লোককল্যাণমার্গ ত্যাগ করেননি, ত্রৈলোক্যেও যিনি মহিমায় অপ্রতিম, যিনি জানকীপ্রাণবন্ধু, যাঁর জ্ঞানস্বরূপ রামদেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা আবৃত; আর যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোলাহল স্তব্ধ করে অজ্ঞানরজনীর অন্ধকার দূর করে গীতারূপ সিংহনাদ তুলেছিলেন, দুজনে এখন একত্র হয়ে প্রথিতপুরুষ রামকৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছেন।'

তাঁকে প্রণাম।

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি :

'আমার নিজের জীবনে একটু অভিজ্ঞতা তোমাকে জানাই। যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করলেন তখন আমরা বারোজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক তাঁকে ঘিরে ছিলাম। আর বহু শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদের পিষে মারবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে পেয়েছিলাম আমরা এক অতুল ঐশ্বর্য, শুধু বাকসর্বস্ব না হয়ে যথার্থ জীবনযাপনের জন্যে একটা দুর্নিবার ইচ্ছা ও বিরামবিহীন সাধনার অনুপ্রেরণা। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে, শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নেয়ায়। তিনি যে সত্য প্রচার করেছেন তা দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে তাঁরা জন্মতিথিউৎসবে একশো লোক একত্র করতে পারিনি, আর গত বৎসর তাঁর উৎসবে পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল।'

'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার এসব প্রচার করবার আবশ্যক নেই।' শশী মহারাজকে লিখছেন স্বামীজি : 'তিনি পরোপকার করতে এসেছিলেন, নিজের নাম প্রচার করতে নয়। রামকৃষ্ণ কোনো নতুন তন্ত্র চালাতে আসেননি, তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্যের উদ্ঘাটনই তাঁর জীবন।'

'তাঁর জন ছাড়া কোথাও আর পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। দেখতে পাচ্ছি তিনিই রক্ষে করছেন। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—সব তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। এ কি আমার জোরে? না। তিনি রক্ষা করছেন, তিনি।'

অধর সেনের বাড়িতে, বৈঠকখানায়, ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। নরেন গান গাইবে তার আয়োজন চলছে। তানপুরা বাঁধতে গিয়ে তার ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। ওরে কী করলি? ঠাকুর প্রায় কেঁদে উঠলেন। নরেন বাঁয়া তবলা বাঁধছে। ঠাকুর বললেন, 'তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে।'

কীর্তনাঙ্গের কথা উঠল। নরেন বললে, কীর্তনে তাল সম নেই, তাই অত জনপ্রিয়।

'তুই এটা কী বললি!' বললেন ঠাকুর, 'করুণ বলে লোকে এত ভালোবাসে।' নরেন গান ধরল :

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
আমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ
কেমনি বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥

হাজরার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর হাসলেন। 'প্রথম দিনে এই গানটাই গেয়েছিল। ওরে, সেই গানটা গা? আমায় দে মা পাগল করে।'

নরেন গান ধরল : 'আমায় দে মা পাগল করে। আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে॥'

ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞানী রূপও চায় না অবতারও চায় না। বনে যেতে যেতে রামচন্দ্র কতগুলি ঋষি দেখতে পেলেন। ঋষিরা বললে, রাম, তোমাকে দেখে আমাদের নয়ন সফল হল। কিন্তু আমরা জানি তুমি শুধু দশরথের বেটা। ভরদ্বাজ তোমাকে অবতার বলে। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শুধু সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম হাসতে লাগলেন। আমার সে কী অবস্থাই গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে গেল। জড় হয়ে গেলুম। ঘরে ছবিটবি যা ছিল ফেললুম সরিয়ে। কিন্তু আবার যখন হুঁশ এল, মন নেমে আসবার সময় আঁকু-পাঁকু করতে লাগল। তখন ধরি কী, তখন কী নিয়ে থাকি! তখন আমার ভক্তি-ভক্তের উপর মন এল। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে তখন কী নিয়ে থাকবে? কাজেই ভক্তি-ভক্ত চাই। তা না হলে মন দাঁড়ায় কোথায়!'

'প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এরাও সমাধির পর রেখেছিল ভক্তি।'

'জ্ঞান ভক্তি দুটোই পথ।' বললেন ঠাকুর, 'যে পথ দিয়ে যাবে তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আরেকভাবে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।'

ঠাকুরের যেমন দুই পথ, জ্ঞান আর ভক্তি, স্বামীজিরও তেমনি।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক। যা দিয়ে ব্রহ্মকে জানতে পারা যায়

তাই পরাবিদ্যা। অবিচ্ছিন্ন আসক্তিতে ভগবানে হৃদয়ের নিত্যস্থৈর্যই পরাভক্তি। পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঢালবার সময় তেল যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়ে তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ভগবানে লগ্ন হয়ে থাকাই পরাভক্তি। সে ভক্তি জাগলে ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না জগতে। তখন কিসের বা অনুষ্ঠান, কিসের বা শাস্ত্র, কিসের বা প্রতিমা! সাধারণ মানবীয় প্রেম সেখানেই যেখানে প্রতিদান আছে। যেখানে প্রতিদান নেই সেখানেই ঔদাসীন্য, সেখানেই বৈপরীত্য। ভগবানকে ভালোবাসা, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসা, প্রতিদানের জন্যে নয়। যেমন অনলের জন্যে পতঙ্গের ভালোবাসা। প্রাণত্যাগ জেনেও আত্মসমর্পণ। সে প্রেম আধ্যাত্মিক ভূমিতে কাজ করতে আরম্ভ করলেই পরাভক্তি।

'আমার গুরুদেবের থেকে আমি বুঝেছি,' আমেরিকাকে বলছেন স্বামীজি: 'মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তাঁর মুখ থেকে কারু উপর কোনো অভিশাপ বর্ষিত হয়নি, এমনকি কারু সমালোচনা পর্যন্ত তিনি করতেন না। তাঁর চোখে এমন দৃষ্টি ছিল না যে কারু মন্দ দেখে। মন কুচিন্তায় অসমর্থ ছিল। ভালো ছাড়া কিছুই দেখতেন না তিনি। সেই মহাপবিত্রতা মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র উপায়। বেদ বলে, ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। যীশু বলেছেন, তোমার যা কিছু আছে, বিক্রয় করে গরিবদের দান করো ও আমার অনুসরণ করো।'

'আচ্ছা, রোগ হল কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে কেন?' বললে মাস্টার, 'তারা দেখছে দেহের এত অসুখ তবু আপনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।'

বলরামেরও সেই কথা। 'আপনারই এই, তা আমরা তো কোন ছার!'

'সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে পারল না' বললেন ঠাকুর, 'লক্ষ্মণ

তো অবাক। কিন্তু উপায় কী, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মকেও কাঁদতে হয়।'

'ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখ্রীস্টও সাধারণ লোকের মত কেঁদেছিলেন।' বললে মাস্টার।

'বলো কী? কী হয়েছিল শুনি?'

'মার্থা আর মেরী দু বোন আর ল্যাজেরাস তাদের ভাই। সবাই যীশুখ্রীস্টের ভক্ত। ল্যাজেরাস মারা যায়। যীশু যাচ্ছিলেন তাদের বাড়ি, পথে ছুটে গিয়ে মেরী তাঁর পায়ের তলে পড়ল, কাঁদতে-কাঁদতে বললে, তুমি যদি আসতে তাহলে সে মরত না। যীশু তাই শুনে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।'

'তারপর?'

'তারপর তিনি ল্যাজেরাসের কবরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এল।' বললে মাস্টার।

'আমার কিন্তু ওগুলো হয় না।'

'সে আপনি ইচ্ছে করে করেন না। ও সব সিদ্ধাই, ও সব আপনি পোঁছেন না। ও সব করলে লোকের দেহেতেই মন যাবে, শুদ্ধা ভক্তির দিকে যাবে না। তাই আপনি করেন না। কিন্তু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আপনার অনেক মেলে।'

'আর কী মেলে?'

'আপনি ভক্তদের উপোস করতে কি আর কোনো কঠোর করতে বলেন না। খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও কোনো কঠিন নেই। যীশুর শিষ্যেরা রবিবারে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত, তিরস্কার করেছিল। যীশু বললেন, ওরা খাবে খুব করবে, যতদিন বরের সঙ্গে আছে বরযাত্রীরা তো আনন্দ করবেই।'

'তার মানে কী?'

'মানে যতদিন অবতারের সঙ্গে আছে সঙ্গোপাঙ্গরা নিরানন্দে থাকবে কেন? তারা সম্ভোগ করবে। অবতার যখন লীলাসম্বরণ করবেন তখনই আসবে তাদের নিরানন্দের দিন।'

ঠাকুর হাসলেন। 'আর কিছু মেলে?'

'মেলে।' মাস্টার বললে, 'আপনি বলেন, নতুন হাঁড়িতেই দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে রাখতে গেলে নষ্ট হবার ভয়। যীশু বলেন, পুরোনো বোতলে নতুন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে। পুরোনো কাপড়ে নতুন তালি দিলে ছিঁড়ে যায় শিগগির।'

'আর?'

'আপনি যেমন বলেন 'মা আর আমি এক' তেমনি যীশু বলেন, 'বাবা আর আমি এক।' আই য়্যাণ্ড মাই ফাদার আর ওয়ান।'

ঠাকুর শুনছেন তন্ময় হয়ে।

'আরো মেলে।' বললে মাস্টার, 'আপনি যেমন বলেন ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন, যীশু বলেন, দোরে ঘা মারো, খুলে যাবে দরজা। নক য়্যাণ্ড ইট শ্যাল বি ওপোনড আনটু ইউ।'

আমেরিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আবার শোনাচ্ছেন স্বামীজি:

'এই ব্যক্তি ত্যাগের মূর্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের সমস্ত ধন ঐশ্বর্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়, আর আমার গুরুদেব তাই করেছিলেন অক্ষরে-অক্ষরে। তিনি টাকা-পয়সা ছুঁতেন না, পারতেন না ছুঁতে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও কোন ধাতুদ্রব্য তাঁর গায়ে ঠেকালে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে যেত তাঁর সমস্ত দেহ ঐ ধাতুদ্রব্যকে ছুঁতে অস্বীকার করত। অনেকে তাঁকে কিছু দিতে পারলে কৃতার্থ মনে করত, কেউ-কেউ বা হাজার-হাজার টাকা, আর যদিও তাঁর উদার হৃদয় সকলকে নির্বিশেষে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, তবুও তিনি ঐ সব লোকের থেকে দূরে সরে যেতেন। কাম-কাঞ্চন জয়ের তিনি জ্বলন্ত উদাহরণ।

জীবনে একরত্তি বিশ্রাম পাননি—চাননি। জীবনের প্রথমাংশ গেছে ধর্ম-উপার্জনে আর শেষাংশ গেছে ধর্ম-বিতরণে। দলে দলে লোক আসত তাঁর উপদেশ শুনতে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা কইতেন, আর এমনি চলত হঠাৎ দু-একদিনের জন্যে নয়, মাসের পর মাস, বিচ্ছেদবিহীন। অবশেষে কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে

পড়ল। কিন্তু মানুষমাত্রকেই তিনি এত ভালোবাসতেন যে যারাই তাঁর করুণার জন্যে আসত, শুনে যেন কথামৃত। কাউকে তিনি বঞ্চিত করতেন না। ক্রমে তাঁর গলায় ঘা হল। তবু তাঁকে অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, লোকজন তাঁর কাছে না যায় তারই চেষ্টা করতে চাইতাম, কিন্তু যেই তিনি শুনতেন লোক এসেছে, তাঁর কাছে যেতে দেবার জন্যে মিনতি করতেন। সে কি, কথা বলতে আপনার কষ্ট হবে না, শরীর অসুস্থ হবে না আরো? তিনি করুণ-নয়নে হাসতেন। কি, শরীর? শরীরের কষ্ট? আমার কত শরীর হল কত গেল। যদি একটি মানুষের ঠিক-ঠিক উপকারে আসতে পারি, হাজার হাজার শরীর আমি দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

একদিন একজন তাঁকে বললে, আপনি তো প্রকাণ্ড যোগী, আপনার দেহের উপর মন স্থাপন করে ব্যাধিটা সারিয়ে ফেলুন না।

'আমি তোমাকে জ্ঞানী মনে করেছিলাম।' বললেন আমার আচার্যদেব, 'কিন্তু এখন দেখছি সাধারণ সাংসারিক লোকের মতই তোমার কথাবার্তা। যে মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে তা সেখান থেকে তুলে নিয়ে এই তুচ্ছ দেহটার উপর রাখি কি করে?'

কত দূর-দূর দেশ থেকে লোক আসত। তাদের প্রশ্নের উত্তর বলে না দিলে তাদের সমস্যার সমাধান না করে দিলে তাঁর শান্তি কোথায়! 'যতক্ষণ আমার কথা বলার বিন্দুমাত্র শক্তি আছে ততক্ষণ আমি বলব ভগবানের কথা। ভগবানই তো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত সমস্যার সমাধান।'

যেদিন দেহত্যাগ করবেন ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন আমাদের। বেদের পবিত্রতম ওঁ বলতে বলতে মহাসমাধিতে লীন হলেন। পরদিন তাঁর মৃতদেহ দগ্ধ করলাম শ্মশানে।

হে আমেরিকাবাসী, তোমাদের মধ্যে যদি থাকে এমন কেউ পবিত্র ফুল, তাকে ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ করতে দাও। তোমাদের মধ্যে কে আছ নিষ্পাপ নবীন বীর্যবান যুবক, এগিয়ে এস, ত্যাগ করতে শেখ। ত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র রহস্য। প্রত্যেক রমনীকে জননী বলে চিন্তা

করো আর কাঞ্চন পরিত্যাগ করো, পরিহার করো। কিসের ভয়? যেখানেই থাকো না কেন, প্রভু তোমাদের রক্ষা করবেন, তিনিই ভার নেবেন সন্তানদের।

দেখছ না জড়বাদের প্রবল স্রোতে পাশ্চাত্যদেশ ভেসে যাচ্ছে? কতদিন আর থাকবে চোখে কাপড় বেঁধে? দেখছ না কাম আর অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করে নিচ্ছে? শুধু বক্তৃতায় বা সংস্কার-আন্দোলনে এ শোষণ বন্ধ হবে না, শুধু ত্যাগের দ্বারাই বন্ধ হবে। চারিদিকের ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মাচলের মত অনড় অকল্প হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলেই রুদ্ধ হবে অপচয়। বাক্যব্যয় কোরো না, তোমার দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে ত্যাগের শক্তি, পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি বিনির্গত হোক। যারা দিনরাত কামকাঞ্চনস্পৃহায় প্রধাবিত হচ্ছে, তাদেরকে ঐ শক্তি গিয়ে প্রবল আঘাত করুক, তোমাকে দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। উঠে পড়ে লেগে যাও, দাঁড়াও প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। যদি কামকাঞ্চন ত্যাগ করো, দেখবে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তোমার হৃৎপদ্মের সৌরভ আপনি থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যেই আসবে তোমার কাছে নিয়ে যাবে সে সুগন্ধ।

তোমাদের ত্যাগের সময় এসেছে, হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। হে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক, সত্যকে ধরে থাকো, অকামহত হও, মঙ্গলায়তন ভগবানকে হৃদয়স্থ করে জগতে জীবনে নিত্য উৎসবের আলো জ্বালাও।

দক্ষিণামূর্তিদেব গুরুদেবকে নমস্কার করি। যিনি বট বিটপী সমীপে ভূমিভাগে উপবিষ্ট, যিনি মুনিদেরও জ্ঞানদান করছেন, যিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষ, সেই মঙ্গলময় গুরুমূর্তিকে নমস্কার।

কী আশ্চর্য! বটবৃক্ষমূলে শিষ্যেরা সব বৃদ্ধ আর গুরু হলেন যুবা, আর গুরু মৌনী হয়ে ব্যাখ্যা করছেন, আর তাতেই শিষ্যদের সংশয়ের নিরসন হচ্ছে।

যিনি প্রণবের অর্থস্বরূপ, শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তি, যিনি নির্মল ও প্রশান্ত সেই ওঁকারকে, দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

যিনি সর্ববিদ্যার আধার, ভবরোগের ভিষক, নরকার্ণবতারণ, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

বরানগর মঠের মোটে পাঁচ মাস বয়স, দুদিন পরে ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়েছে, রাখালের বাবা এসেছে রাখালকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

'কেন কষ্ট করে আসেন?' বললে রাখাল, 'আমি এখানে বেশ আছি। আমি আর ফিরব না বাড়ি। এখন শুধু আশীর্বাদ করুন, আপনাদের আমি যেন ভুলে যাই আর আপনারাও ভুলে যান আমাকে।'

সকলের তীব্র বৈরাগ্য। নিরন্তর সাধনভজন। সকলেরই এক আকুলতা, কিসে ভগবান দর্শন হয়!

তারক আনন্দে শিবের গান ধরেছে। নরেনের লেখা গান।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
বোম বব বাজে গান।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল-মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে উগরে অনল ত্রিশূলরাজে,
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল॥

নরেন তামাক খাচ্ছে আর বলছে, 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ সংসার করলেও একেবারে নির্লিপ্ত। ফস করে কেমন বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন দেখ।'

রাখাল বললে, 'আবার দ্বারকা ত্যাগ করতেও তেমনি।'

কালী গীতা পড়ছে। পাঠের মধ্যে মধ্যে বিচার করছে নরেনের সঙ্গে।

'আমিই সব।' বললে কালী, 'আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছি।'

নরেন বললে, 'আমি সৃষ্টি করছি কই? আর-এক শক্তিতে আমাকে করাচ্ছে। এই নানা কার্য নানা চিন্তা সব তিনি করাচ্ছেন।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে কালী বললে, 'কার্য যা বললে সব মিথ্যে। আর চিন্তা? চিন্তা আদপেই হয়নি।'

'সোহহং বললে যে আমি বোঝায় সে এ আমি নয়।' বললে নরেন, 'মন দেহ সব বাদ দিলে যা থাকে সেই আমি।'

মাস্টার বললে, 'যতক্ষণ আমি ধ্যান করছি এই বোধ আছে ততক্ষণ তা আদ্যাশক্তির এলেকা। এ ঠাকুরের কথা। ঠাকুরের কথায়, মানতেই হবে শক্তিকে।'

হ্যাঁ, ঠাকুরের কথা বলো।

'ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের চেয়ে অনেক বড় হবে।' লিখছেন স্বামীজি : যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেদিন থেকে মডার্ন ইণ্ডিয়া, বর্তমান ভারতের জন্ম, সেদিন থেকে সত্যযুগের আবির্ভাব। এই বিশ্বাসেই অবতীর্ণ হও কার্যক্ষেত্রে।'

ঠাকুরের বন্দনা করো। স্বামীজিই স্তোত্র রচনা করলেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ, চিদঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল নয়ন-বীক্ষণে মোহ চায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ ভব পার॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায়॥

'যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন তোমরাও সত্য।' আরো লিখছেন স্বামীজি : 'তোমাদের সকলের মধ্যে মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের মধ্যে ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর, তাদের মধ্যেই মহাশক্তির বিকাশ হবে। রামকৃষ্ণাবতারেই জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের সমপ্রকাশ। অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনো বুঝতে পারিসনি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈন কশ্চিৎ। কেউ-কেউ এঁর বিষয় শুনেও জানে না। হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র হিন্দুজাতি যা চিন্তা করেছে শ্রীরামকৃষ্ণ তা এক জীবনেই আদ্যোপান্ত উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সমস্ত জাতির শাস্ত্রসমুচ্চয়ের জীবন্ত টীকা। এখন লোকে বুঝবে। আমারও সেই পুরোনো বুলি—স্ট্রাগল, স্ট্রাগল আপ টু লাইট, অনওয়ার্ড। প্রাণপণে আলোকের দিকে অগ্রসর হও।'

এমনি কথা আরো আগে লিখেছিলেন রাখালকে : 'সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। যে আত্মম্ভরী শুধু নিজের আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে নিজে নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্যে কাতর হয়, তার উপকারের চেষ্টা করে সেই রামকৃষ্ণের ছেলে, ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহাসন্ধিপূজার ক্ষণে কোমর বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, আমার ছেলে, বাকি যারা তা না পারো দূর হয়ে যাও ভালয়-ভালয়। যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে নিজের ভালো চায় না। প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণ-চিকীর্ষুঃ, প্রাণ ত্যাগ হলেও পরের কল্যাণকারী। ওঠো ওঠো, বিপুল বন্যা আসছে, বিপুল আধ্যাত্মিক বন্যা, তাঁর কৃপায় নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ পণ্ডিতের গুরু। প্রভুর চরিত্র, শিক্ষা আর ধর্ম ছড়াও চারদিকে—এই সাধন এই ভজন এই সিদ্ধি। অনওয়ার্ড। মেয়েমদ্দ আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে, নামযশের সময় নেই, ভক্তি মুক্তিও পরে দেখা যাবে। এখন, এ জন্মে, শুধু তাঁর অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর বিরাট জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, তা কি দেখেও দেখছ না? অনওয়ার্ড। তিনি পিছনে আছেন। হরে হরে, অনওয়ার্ড। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। সব ভেসে যাবে। হুঁশিয়ার, আসছেন তিনি। যারা তাঁর সেবার জন্যে, তাঁর নয়, তাঁর ছেলেদের, গরিবগুর্বো পাপীতাপীদের সেবার জন্যে তৈরি হবে, তাদের মধ্যে তিনি আসবেন, তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, বক্ষে মহাশক্তি মহামায়া। আর যারা নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, তারা কী করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক। তাদের চলে যেতে বলো।'

'খেলা মোর সাঙ্গ হল'—নিউইয়র্কে এসে কবিতা লিখছেন স্বামীজি।

কালের তরঙ্গে ভেসে চলেছি আমি
কখনো উঠছি, ডুবছি বা কখনো
জীবনের জোয়ারে-ভাঁটায়
চলেছি এক ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য থেকে আরেক স্বল্পজীবী দৃশ্যে।

হায়, এই অনন্তহীন প্রহসনে আমি ক্লান্ত,
এই শুধু খাওয়া আর না-পাওয়া ?
খাওয়া আর না-পাওয়া।
দূরের তীরের ধূসর রেখাটিও অগোচর।
জন্ম থেকে জন্মান্তর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি
খুলল না কপাট।
ইপ্সিত একটি রশ্মির রেখার আশায় চেয়ে থেকে-থেকে
চোখ ক্ষয় হয়ে গেল
জাগলনা আভার আভাসলেশ।
অতি ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণ সেতুর উপর দাঁড়িয়ে
দেখছি নিচে চেয়ে,
অগণ্য মানুষ হাসছে কাঁদছে খুঁজছে যুঝছে—
কেন, কার জন্যে, কেউ জানে না।
সামনের সেই রুদ্ধ কপাট ভ্রূকুটি করে বলছে,
আর এগিও না, ঐ পর্যন্তই তোমার সীমা,
তোমার ভাগ্যকে আর লুব্ধ কোরো না
যতদূর পারো সহ্য করে নাও নিঃশব্দে।
পেয়ালায় যা উঠেছে, সুধা না হলাহল,
পান করো নিঃশেষে, জনতার সঙ্গে তুমিও মত্ত হও।
জানতে চেও না।
যে জানতে চায় সেই শোকার্ত।
সুতরাং ঐখানেই স্থির হয়ে থাকো
হায়, আমি স্থির হতে জানি না,
নামে শূন্য রূপে শূন্য, এর জন্ম মৃত্যু সকলি শূন্য—
এই জলবুদ্বুদ পৃথিবী—
আমার কাছে এ এক অপূর্ব মিথ্যা।
আমি এর নাম আর রূপের আবরণ ছিন্ন করতে চাই,
চাই খুলতে ঐ অবরুদ্ধ দুর্ধর্ষ কপাট।

তোমার গৃহপ্রবেশপিপাসু ক্লান্ত পুত্র দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে,
দরজা খুলে দাও, মা,
আলোকের দরজা—
আমার খেলাধুলা শেষ,
প্রত্যাবর্তনের সময় সন্নিহিত।
কী দারুণ খেলা তোমার, মা,
অন্ধকারে নিয়ে যাও খেলতে, ছেড়ে দাও,
তার পরে ভয় দেখাও, তলহীন অকূলের আতঙ্ক।
খেলার আনন্দ তাহলে কোথায়, কোথায় বা আশার উষ্ণতা!
শুধু গভীর দুঃখ আর অতীব্র কামনার সাগরে
মন্থিত আলোড়িত হওয়া।
জীবন্ত মরণই বুঝি জীবনের অর্থ।
নিয়তি-চক্রের সেই মামুলি আবর্তন
দুঃখ আর সুখ জন্ম আর মৃত্যু আলো আর অন্ধকার!
কোথায় সে অভিনব আবির্ভাব!
শিশুর স্বপ্ন, এখানে যতই কেননা তা স্বর্ণসমুজ্জ্বল,
ধূলিতে অবসিত।
পশ্চাতে তাকিয়ে দেখ, ভগ্ন ধ্বস্ত কত শত আশা
পুঞ্জীভূত জীবনের মালিন্য,
চক্রাবর্তন থেকে ত্রাণ নেই কারুর—
অবিরত বেগে ঘুরছে এই চক্র, এই মায়ার খেলনা,
কামনা এর কেন্দ্র, নিরর্থক আশা এর গতিশক্তি,
সুখ দুঃখ এর দণ্ড।
ঘুরছি, ঘুরছি, কোথায় চলেছি ঘুরতে-ঘুরতে
এ ঘোরার আগুন থেকে বাঁচাও আমাকে, মা,
করুণাধারা মা—
তোমার রুদ্র মুখ ফিরিওনা আমার দিকে
এ আমার সহনাতীত।

আমার দোষ আর ধোরো না, আমাকে মার্জনা করো
সদয় হয়ে অভয় দাও আমাকে,
সেই দূর পরপারে নিয়ে যাও
যেখানে সকল দ্বন্দ্বের অবসান,
সকল অশ্রুর শেষ, সকল দুঃখের নির্বাপণ,
সকল পার্থিব সুখেরও ওপার।
যার গরিমা সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রও পারে না প্রকাশ করতে
না বা বিদ্যুৎদীপ্তি,
সকলেই যার বিভার ক্ষীণশ্বাস প্রতিভাস।
মাগো, মিথ্যা মায়ার লুণ্ঠন যেন আমার নয়ন থেকে
তোমার মুখখানিকে না আড়াল করে।
আমার খেলা আজ শেষ হল,
শৃঙ্খল ছিন্ন করো আমার
তোমার কোলের মাঝে আমাকে মুক্ত করো।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্বামীজি চললেন ইউরোপের দিকে। পৌছুলেন প্যারিস। সেখান থেকে লণ্ডন।

৭১

প্যারিস থেকে লণ্ডন যাবেন। এই ঠিক করলেন স্বামীজি। লণ্ডনে তাঁকে দুজনে নিমন্ত্রণ করেছে। এক মিস হেনরিয়েটা মুলার আর এক মিস্টার ই টি স্টার্ডি।

মুলার জার্মান মেয়ে, আমেরিকাতেই স্বামীজির সঙ্গে তার পরিচয়। স্টার্ডি এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ, এখনো তার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ হয়নি। আলাপ-আমন্ত্রণ পত্রে চলেছে।

স্টার্ডি ভারতবর্ষকে ভালোবাসে, ভারতবর্ষের বহু তীর্থ সে পর্যটন করেছে, আর সব চেয়ে অভিনব কথা, বন্ধুতা করেছে স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে। স্বামী শিবানন্দ হৃদ্যতার সমুদ্র। তাঁর সেই হৃদয়ের কাছে

দেশী-বিদেশী নেই, স্বধর্মীবিধর্মী নেই, যাকেই তিনি কাছে পাবেন টেনে নেবেন গভীরে। নিবিড়ে-নিভৃতে।

শিবানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েই স্বামীজিকে চিঠি লেখে স্টার্ডি। এবং অবশেষে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করে পাঠায়।

'আপনার নিমন্ত্রণ প্রভুর আহ্বান বলে মনে করি।' স্বামীজি উত্তর দিলেন।

প্রভু বলতে স্বামীজি কাকে সবিশেষ চিহ্নিত করছেন। তাঁকে জানে স্টার্ডি। শিবানন্দের কাছ থেকে সব সে শুনেছে, একান্ত মনে ভালোবেসেছে। আলমোড়ায় শিবানন্দের সঙ্গে বসে সাধন করেছে আর শিবানন্দ যখন মাদ্রাজে গেল তখনও সে তার সঙ্গ ছাড়ল না।

বারাসতের রামকানাই ঘোষাল রানী রাসমণির মোক্তার। তারকেশ্বরের শরণ নিয়ে ছেলে পেয়েছিল বলে নাম রেখেছে তারক। সাত রাজার ধন এক মাণিক পেয়েছে অথচ তার যত্ন করে না রামকানাই। বলতে গেলে বলে, বাবা তারকনাথের ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন। তিনিই দেখবেন।

রামকানাই কালীভক্ত, তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে সাধন করত। প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেত, গঙ্গাস্নান করে লাল চেলি পরে ভবতারিনীর মন্দিরে ঢুকত। প্রকাণ্ড দশাসই চেহারা, গৌর বর্ণ, বুকটা টকটকে লাল—ভৈরব বলে মনে হত। ঠাকুর তাকে খাতির করতেন। সাধনকালে তাঁর যখন প্রচণ্ড গাত্রদাহ হয়েছিল তখন রামকানাই বলেছিল ইষ্টকবচ ধারণ করো। ইষ্টকবচ ধারণ করতেই দূর হল গাত্রদাহ।

ঠাকুর কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। দেখলেন রাম, মাস্টার, কেদার আর তারক দাঁড়িয়ে আছে।

তারককে দেখে ঠাকুর মহাখুশী। তার চিবুক ধরে সস্নেহে আদর করলেন।

কেদারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, ঈশ্বরের কথা হলেই চোখ জলে ভরে আসে। ঠাকুরের পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে। ভাবখানা এই, এই স্পর্শেই তার শরীরে শক্তি সঞ্চার হবে।

ঠাকুর বললেন, 'মা, আঙুল ধরে এ আমার কী করতে পারবে।' পরে কেদারকে লক্ষ্য করলেন: 'কামিনীকাঞ্চনে মন টানে তোমার। মুখে বললে কী হবে, আমার ওতে মন নেই।'

কামিনীকাঞ্চনে মন নেই কার?

মন নেই স্বামীজির। মন নেই শিবানন্দের।

বীর্য নষ্ট হলেই চিত্ত অস্থির হয়। অস্থির হলেই ইষ্টের মূর্তি চিত্তে স্পষ্ট হয় না। 'আয়নার পারা ঠিক থাকলে তবে প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে।' বলছেন ঠাকুর, 'পারা একবার এধার-ওধার হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব পড়ে না।'

চিত্ত কি? ভাবপট। যেখান থেকে ভাব ওঠে সেখানেই প্রথম ছাপ পড়ে। যেখান থেকে ভাব উঠবে সে পর্দাই যদি কাঁপে তবে আর স্থিরচ্ছবি ফুটবে কি করে? অসাবধান হাত থেকে ক্রীড়াকন্দুক সোপান-শ্রেণীর প্রথম ধাপের উপর পড়ে গেলে যেমন তা লাফাতে লাফাতে নিচে পড়ে যায়, তেমনি যদি চিত্ত লক্ষ্যচ্যুত হয় তবে ক্রমশ পড়তে-পড়তে শেষে নেমে যায় অতল ধূলিতে।

ওজঃশক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান খুলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান মানে কী? ব্রহ্মজ্ঞান তো আগে থেকেই রয়েছে, তাকে প্রকাশ করে দেওয়া। বারো বছর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারলে চিত্ত সুস্থ হয় আর চিত্ত সুস্থ হলেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।

প্রথম যৌবনেই তারকের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—সব সময়ে ভয়, কি করে কী হবে। এদিকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ওদিকে সংসারে বিতৃষ্ণা। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললে এ দ্বন্দ্বের কথা। ঠাকুর বললেন, ভয় কি রে, আমি আছি।

আমিই পথনেতা, জিতকাম, সর্বসংশয়রাক্ষসহন্তা।

'স্ত্রী যদ্দিন আছে তাকে ভরণপোষণ করতে হবে বৈকি।' বললেন ঠাকুর, 'একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। তাঁর কৃপায় স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।' তারকের বুকে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন।

চিৎ হয়ে শো, চিন্তা কর মা কালী বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন ঠাকুর, এ ভাবনার ফলে কামজয় হয়।

রক্তধারাসমাকীর্ণে করকাঞ্চীবিভূষিতে।
ঘোরদংষ্ট্রে কোটরাক্ষি নমস্তে ভৈরবপ্রিয়ে॥
শবাস্থিকৃতকেয়ূরশঙ্খকঙ্কণমণ্ডিতে।
শববক্ষঃ সমারূঢ়ে নমস্তে শিববন্দিতে॥

'বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ আর কোথায়।' বললে নরেন, 'একমাত্র একজনকে, ঠাকুরকেই দেখেছি।'

'আরো একজনকে দেখ, সে এই আমি।' বললে তারক, 'ঠাকুর আমার মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে আমিও পেরেছিলাম কাম জয় করতে। ঠাকুরের কৃপায় কী না হয়। অসাধ্য সুসাধ্য কর তুমি কৃপা কর যারে।'

সেই থেকে শিবানন্দের নাম হল 'মহাপুরুষ।' স্বামীজিই দিলেন সেই নাম।

জিতেন্দ্রিয় না হলে সেবা করবার অধিকার হবে কী করে? আর ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে হলে মার কাছে প্রার্থনা করো।

হে ভবানী, ভবমোচনী, সর্বাসুরবিনাশা সমস্তদোষঘাতিকে, আমাকে শক্তি দাও। হে অচিন্ত্যরূপগহনা কামাঙ্কুশে কামদুঘে, আমাকে শক্তি দাও। হে অভয়ে অনঘে অর্জিতে অমিতে অপরাজিতে, আমাকে শক্তি দাও।

ক্ষীর ভবানীকে দেখে স্বামীজি শিশুর মত কাঁদতে বসলেন। 'এবার ধরব চরণ লব জোরে।' এবার তোমার কোলে বসা ছেলে হব। তুমি নির্দোষা সর্বদুঃখহা দয়ার্দ্রহৃদয়, আর তোমাকে ছাড়ব না। আর নামব না কোল থেকে। 'ছাড় ছাড় যদি বল মা তবু না ছাড়িব। রতন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।'

কালীকে সম্বোধন করে কবিতা লিখলেন স্বামীজি:

ঘোররূপা হাসিছে দামিনী, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
কালি তুই প্রলয়রূপিনী, মৃত্যুরূপা, মা আমার আয়।

নির্ভীক যে দুঃখদৈন্য বরে, মৃত্যুর যে বাঁধে বাহুপাশে,
যোগ দেয় প্রলয়নর্তনে, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ॥

যদি দেহে-প্রাণে বলবান না হয়, যদি শক্তিমান সাহসী ভয়শূন্য না হয়, তবে সে সেবা করবে কী করে? যদি প্রাতিভ জ্যোতিতে তারকজ্ঞান লাভ না হয়, যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় তা হলে সেবা করবে কী করে? যদি মহাশক্তি ভক্তি না প্রকাশিত হয়, যদি প্রতি পদে পরমবৈরাগ্যকে না নমস্কার করা যায়, তাহলে সেবা করবে কী করে?

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

'এত তপস্যা করে সার বুঝেছি যে জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।' বললেন স্বামীজি।

কী আবশ্যক? আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি। আবশ্যক দোষদৃষ্টির উচ্ছেদ। অহং-এর উৎপাটন। 'পূজা কর—বিরাটের পূজা। তোমার সামনে তোমার চারদিকে যারা আছে, তাদের পূজা। পূজা করতে হবে, মনে রেখো, সেবা নয়। সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাব বোঝা যাবে না, পূজা শব্দেই ঠিক বোঝা যাবে। এই সব মানুষ এই সব পশু—তোমার এই সব স্বদেশবাসী, এরাই তোমার ঈশ্বর, এরাই তোমার প্রথম উপাস্য।'

জীবঃ শিবঃ শিবোজীবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

যোগী কে? যে নিসঙ্গ যে বিসঙ্গ, যে উপাধি ও বাসনাকে বিসর্জন দিয়েছে, যে নিজস্বরূপনিমগ্ন সেই যোগী। যার দেহ দেবালয়, জীবমাত্রই যার সদাশিব দেবতা, যে সোঽহং মন্ত্রে সর্বজীবকে পূজা করে সেই যোগী। যার অন্তর্বহিঃ সদা হরিঃ, যার ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম পুরস্তাৎ, সেই যোগী—সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ।

'ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে।' বলছেন স্বামীজি: 'এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন নয়তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, নয়তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।

বোম্বাইয়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে, মানুষগুলো মরে যাক।'

সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্য পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥

পরোপকারই একমাত্র পুণ্য, পরপীড়নই একমাত্র পাপ।

এই মানব শরীর ব্রহ্মপুর। আর সমস্তই ওঙ্কার, সমস্তই ব্রহ্ম। এক দেবতা সর্বভূতে গূঢ়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব কর্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতের অধিবাস। ভূত ও ভব্য সমস্ত কিছুর শাসক, সে-ই আজ, সে-ই আগামীকাল। নিরবদ্য, নিরঞ্জন, তিনিই অমৃতের পরম সেতু। আর জেনো সকলের আত্মা, বিশ্বের মহান আয়তন, সে তুমি, সে তুমি।

'দেশজোড়া এই দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।' বলছেন স্বামীজি, 'আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর লোককে মেটাফিজিক্স শোনাচ্ছি এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ কী? তার কারণ মূর্খতা। ঐ মূর্খতা দূর করবার জন্যে কী করছি? দরিদ্রদেবতা, মূর্খদেবতার সেবায় লাগো।'

সর্বং তরন্তু দুর্গানি। সকল দুর্গতি সকলে পার হোক। ভদ্র দেখুক সংসার। স্বস্তিতে লালিত হোক। সর্বভূত সৌখ্যলাভ করুক। মেঘস্নেহ বর্ষিত হোক। শস্যোচ্ছল হোক বসুমতী। তাদের ক্ষয় কোথায় যাদের হৃদয়ে আনন্দাশ্রয় বাসুদেব বসে। যা কিছু করি বলি স্মরণ করি সব আমার বাসুদেবে সমর্পণ।

সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হও, সর্বভূতে হিতপরায়ণ থাকো। যিনি জগন্ময় সর্বভূতে অধিষ্ঠিত তাঁর সেবা করবে কি করে? লোকসেবাই তাঁর সেবা। লোকপূজাই তাঁর পূজা। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করো। ফলে স্পৃহা নেই, শুধু সেবা-পূজা করতে পারার মধ্যেই আনন্দ, প্রাণধারণের তাৎপর্য। সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নয়, ঈশ্বরে কর্মসমর্পণ।

'যদি ভালো চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান—মানবদেহী নারায়ণের—হরেক মানুষের পূজা করো

গে—বিরাট আর স্বরাট। স্বরাট মানুষ আর বিরাট এই জগৎ। পূজা মানে সেবা আর সেবা মানে কর্ম। কর্ম মানে ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয় আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব না আধঘণ্টা বসব এ বিচার নয়। এ সব পাগলাগারদের কাণ্ড।'

বিরাট পুরুষ সহস্রশির, সহস্রপদ, সহস্রলোচন। তিনি বিশ্বকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করে দশ আঙুল পরিমিত স্থান, অর্থাৎ দশদিক অতিক্রম করে অবস্থিত আছেন।

দৃশ্যমান এই জগৎই সেই বিরাট পুরুষ, অতীত আর ভবিষ্যৎও তিনি। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর। জীবাত্ম অর্থাৎ কর্মফল দেবার জন্যে তিনি স্বীয় কারণ বা অব্যক্ত ভাব থেকে কার্যভাব বা ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সেই বিরাটের পূজা করো। স্বরাট হয়ে বিরাটের পূজা। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা। যে পূজা করছে তার শুধু জ্ঞান নয় যে জীব শিব, যে পূজা পাচ্ছে তারও জ্ঞান যে সে মাত্র জীব নয় সে ঈশ্বরের প্রতিরূপ।

মাদাম কালভেকে তাই বললেন স্বামীজি: 'আমি আবার আসতে চাই, আবার জন্মাতে চাই, চাই আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচতে। আমি বৃষ্টিবিন্দুর মত সমুদ্রে ঝরে পড়ে লীন হয়ে যেতে চাই না।'

'তার মানে আপনি সমুদ্র হয়ে যেতে চান না।' বললে মাদাম।

'না, আমি মোক্ষ চাই না বিলুপ্তি চাই না, আমি চাই বারে বারে জন্মাতে, পূর্ণ হতে পূর্ণতর হতে। কেবল এগিয়ে যেতে।'

'কাঠুরে তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না তোর জঠর জ্বালা॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে, মিলে ধন দূর বনে গেলে,
ও কাঠুরে—
(ও তুই) এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চ্যালা॥
আরও যদি যাস এগিয়ে, রজত খনি দেখবি গিয়ে
ও কাঠুরে—
(ওরে) তারও ধানে সোনা হীরে মণি মাণিক রত্ন মেলা॥

দেহের মাঝে আছে সে বন, যদি না পাস তার অন্বেষণ,

ও কাঠুরে—

ধর ওরে রামকৃষ্ণচরণ, সেবন যার করেন কমলা ॥'

'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি। যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন সৎ বিষয়ের জন্যেই দেহত্যাগ শ্রেয়। আমি মরি আর বাঁচি, দেশে ফিরি বা নাই ফিরি, তোমরা প্রেম ছড়াও।' বন্ধুদের লিখছেন স্বামীজি : 'ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালোবাসো। জগতের কল্যাণ করা, অচণ্ডালের কল্যাণ করা, এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো, ঈশ্বর বলো, অবতার বলো, নিজের নিজের ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সেই সে মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী, অশান্তির লেশমাত্র থাকবে না।'

আবার লিখছেন :

'সত্য বটে আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের অনুপ্রেরণায় চলছে কিন্তু তাতে কী? ঈশ্বরীয় ভাব শুধু একজনের মধ্যে দিয়েই জগতে প্রচারিত হয়নি। সত্য বটে আমি বিশ্বাস করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন কিন্তু জেনে রাখো, আমিও একজন আপ্ত তুমিও একজন আপ্ত।'

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বাইরের কোনো ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি না বা কোনো বাইরের দৈত্যদ্বারা। তা আপনা-আপনি সৃষ্ট হচ্ছে, আপনি-আপনি প্রকাশ পাচ্ছে, আপনা-আপনি বিলয় হয়ে যাচ্ছে। সেই এক অনন্ত সত্তাই ব্রহ্ম। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'—হে শ্বেতকেতু, তুমি তাহাই, তাহাই তুমি।

শিব হয়ে শিবকে পূজা করো। তুমি নিজে শুধু শিব হবে না, যার সেবা করবে তাকে বলো, তাকে বোঝাও যে সেও শিব।

তাই জীবসাম্য নয় শিবসাম্য।

প্যারিসে অল্প কদিন ছিলেন স্বামীজি। তার মধ্যেই সেখানকার যা

সব দর্শনীয় গির্জে থেকে আর্টগ্যালারি সব দেখে নিলেন, শিখে নিলেন বিদ্যার্থীর মত।

লিখলেন: 'পারি নগরী ইউরোপী সভ্যতাগঙ্গার গোমুখী। মর্তের অমরাবতী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ এ বিলাস এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। ইংরেজ তো ওলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশের বাসিন্দে, সদা অখুশি। লণ্ডনে নিউইয়র্কে ধন আছে, বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি আর সব চেয়ে নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যা থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক, মানুষ কোথায়? প্রাচীন গ্রীক যেন মরে জন্মেছে তাই মনে হয় ফরাসীদের দেখে। তার সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি চটুল আবার অতি গম্ভীর, তার সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশিক্ষণ থাকে না, আবার ফরাসী জেগে ওঠে।

স্বাধীনতার আবাস এই ফ্রাঁস। প্রজাশক্তি এই পারিনগরী থেকে পাঠ নিয়ে মহাবেগে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন থেকে ইউরোপের নতুন মূর্তি। কিন্তু সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে' ধ্বনি চলে গিয়েছে ফ্রাঁস থেকে। ফ্রাঁস অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ এখনো সেই ফরাসী বিপ্লব মন্ত্র করছে। পারিতে যে ধ্বনি উঠবে তার প্রতিধ্বনি ইউরোপে। পারি হচ্ছে সমস্ত নতুনের পীঠস্থান।'

তুমি অপরকে, তোমার শত্রুকেও ভালোবাসবে কেন? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে ভালোবাসো বলে। তুমিই সেই—তত্ত্বমসি। এই তত্ত্বই হিন্দুর ধর্মনীতি। তাই হিন্দুধর্ম শুধু হিন্দুর ধর্ম নয়, বিশ্বমানবের ধর্ম।

কী বলে হিন্দুর উপনিষদ?

লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অর্থাৎ

নিজের প্রতি অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়। মনুষ্যপ্রীতি ছাড়া ঈশ্বরভক্তি নেই, আবার ঈশ্বরভক্তি ছাড়া মনুষ্যপ্রীতি নেই। যতক্ষণ না বুঝব যে সকল জগৎই আমি, সর্বলোক আমাতে অধিষ্ঠিত, ততক্ষণ আমি জ্ঞানশূন্য ভক্তিশূন্য প্রীতিশূন্য। যেহেতু হিন্দুর ধারণায় সমস্ত মানুষই ঈশ্বর, মানুষকে না ছুঁয়ে ঈশ্বরকে ছোঁয়া যাবে না। বিশ্বপ্রেম বলে যদি কোনো বস্তু থাকে তা হলে তার মূলে হিন্দুর বেদান্তবুদ্ধি আত্মদর্শনসম্ভূত সমত্ববুদ্ধি বর্তমান। একমাত্র বেদান্তবাদীই বলতে পারে বিশ্বপ্রেমের কথা।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ যে একত্বে স্থিত হয়ে অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবান অধিষ্ঠিত এই বুদ্ধি অবলম্বন করে সর্বভূতের সেবা করে, অর্থাৎ নারায়ণ-জ্ঞানে সর্বভূতে প্রীতি করে, সে যে অবস্থায়ই থাকুক, সন্ন্যাসী কি সংসারী, শাস্ত্রজ্ঞ কি অশাস্ত্রজ্ঞ, সে ভগবানই নিত্যযুক্ত থাকে। জ্ঞানে সে তদ্ভাবপ্রাপ্ত, কর্মে সে তৎকর্মকৃৎ, ভক্তিতে তদ্গতচিত্ত। সেই নিত্য সমাহিত। সমদর্শনই সমাধি।

যিনি তোমার অন্তরে ও বাইরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন, সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা করো, অন্য প্রতিমায় কী হবে? যিনি উচ্চ-নীচ সাধু-পাপী, দেবতা-কীটে সর্বব্যাপী সেই জ্ঞেয় গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ সত্যের উপাসনা করো। যাঁতে অবস্থিতিহেতু আমরা অখণ্ড অবিভাজ্য, যে সমস্ত জীবন্ত নারায়ণে, তাঁর জ স্ত প্রতিবিম্বে, তিনি প্রতীয়মান সেই নেত্রপথবর্তী সাক্ষাৎ দেবতাকে পূজা করো, অন্য প্রতীকে কী প্রয়োজন?

দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে তারাই করুণকাতরস্বরে বলে, আমরা ক্ষীণ ও দীন, আমরা অবসন্ন। বলছেন স্বামীজি: একেই বলে নাস্তিক্যবুদ্ধি। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা বীর ও বিগতভী। একেই বলে আস্তিক্যবুদ্ধি। আমরা রামকৃষ্ণদাস। রামকৃষ্ণ-দাসা বয়ম।

অমৃতত্বে ডাক দিলেন স্বামীজি। বললেন, সংসারশক্তিশূন্য হয়ে সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করে সর্বকল্যাণমূর্তি শ্রীগুরুর চরণ

ধ্যান করে সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করে পরমামৃতের আস্বাদ নাও। অনাদিনিধন বেদসমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া গেছে, হরিহরব্রহ্মা যাতে বলাধান করেছেন, যা পার্থিব নারায়ণ অবতারসমূহের প্রাণসার দিয়ে পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণই সেই অমৃতের পূর্ণপাত্র। সেই অমৃত আস্বাদ করো।

ইংলণ্ডে যাবার আগে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন স্বামীজি। অধীন দেশের এক অখ্যাত হিন্দু—কে জানে ইংরেজরা তাঁকে কী ভেবে নেবে। কেউ কি শুনবে তাঁর কথা, শুনলেই বা মানবে কে? পদানত দেশের লোক তার আবার ধর্ম কী, কী শোনাতে এসেছে সে তত্ত্বকথা? তাই বলবে নাকি, মুখ ফিরিয়ে নেবে নাকি উপেক্ষায়? না, কি, বিপুল বদান্যতার সংবর্ধনা করবে, পরাবে জয়মাল্য?

কিন্তু ভয় কিসের? ভয় কোথায়? "যন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ, মহাত্মাসর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।" আমি স্থির, আমি শান্ত, আমি নির্বিচল। আমিই চিদানন্দরূপ, আমিই সমস্ত ভীতিভ্রংশী, অখণ্ডচেতন। আর কিছু নয়, তিনি আমার চোখের উপর চোখ রেখেছেন।

আঠারোশ পঁচানব্বইয়ের নয়ুই সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে স্বামীজি লিখছেন আলাসিঙ্গাকে: 'কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। আমার সেখানকার ঠিকানা হবে: কোয়ারঅফ ই. টি. স্টার্ডি, হাইভিউ, কেভারস্যাম। রেডিং, ইংলণ্ড।

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। প্রসীদ রামকৃষ্ণ।

৭২

দেশকে এমন করে আর কে কবে ভালোবেসেছে।

দেশকে ভালো না বাসলে জগৎকে ভালোবাসবে কি করে? যে জানে তার মা পার্বতী, পিতা মহেশ্বর, সেই ত্রিভুবনকে স্বদেশ জ্ঞান করে। নিজের দেশও এই ত্রিভুবনের মধ্যে।

সমগ্র ভারতবর্ষ খালি পায়ে হেঁটেছেন স্বামীজি। দেশের ধূলিকে স্পর্শ করেছেন, গায়ে মেখেছেন, আস্বাদ করেছেন মাটির সঙ্গে মানুষের

আত্মীয়তা। কাশী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাতরাস—হিমালয়। আবার রাজপুতানা, আলোয়ার, জয়পুর, আজমির, খেতড়ি, অহমেদাবাদ, কাঠিয়াওয়াড়, জুনাগড়, পোরবন্দর, দ্বারকা। তার পরে বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা, বেলগাঁও। দক্ষিণে বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারী। যত মানুষের যত সমাজ আছে, অভিজাত থেকে অধোগত, যত ঘর আছে, প্রাসাদ থেকে কুলিধাওড়া, সর্বত্র তিনি অতিথি হবেন। প্রত্যক্ষ করবেন দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য আর দৈন্য, প্রাচুর্য আর রিক্ততা, প্রত্যেক ধূলিকণাকে স্বীকার করবেন তীর্থ বলে। বাস্তবের রূঢ়তার মধ্যেই আবিষ্কার করবেন দৈবী সত্তার মহিমা।

দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন তিনি শাশ্বত ভারতের শিবমূর্তি। নিরন্ন দরিদ্র আর মহারাজা অস্পৃশ্য ভিক্ষুক আর গর্বিত মোগল সবই সেই একজন। সেই একজনকে যখন ভালোবাসি তখন সকলকে ভালোবাসি। আস্তাবলে সহিসদের সঙ্গে শুই, কিম্বা ভিক্ষুকদের সঙ্গে গাছতলায়, আবার আতিথ্য নিই রাজার অট্টালিকায়। মধ্যভারতে একবার কদিন মেথরদের বস্তিতে কাটিয়ে এলাম। ভস্মস্তরের নিচে দেখে এলাম আত্মার মাণিক্য। কোথাও ভেদ নেই ব্যবধান নেই। সমস্ত এক, সর্বত্র এক, এক ছাড়া দুই নেই কোনোখানে।

যখন স্বামীজি কন্যাকুমারিকায় এসে পৌঁছলেন, হাতে একটা পয়সা নেই যে নৌকো ভাড়া করে যান ওপারে। কী করলেন তিনি? সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিংস্র জলজন্তুদের গ্রাহ্য করলেন না। উত্তাল সমুদ্রকে সবল বাহুতে পরাস্ত করে উঠলেন তার শিলাখণ্ডে। ফিরে তাকালেন ভারতবর্ষের দিকে। যেন দুই বাহু বাড়িয়ে গোটা দেশটাকে তিনি বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরেছেন। এক বাহুতে প্রেম আরেক বাহুতে পৌরুষ, এই তো বিবেকানন্দ। জ্ঞান আর প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে কে আর এমন একাত্ম করে দেখেছে দেশকে।

সেই গুরুভাই গঙ্গাধরের সঙ্গে কবে প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। বললেন স্বামীজি, 'ছাখ গ্যাঞ্জেস, কোথাও আর বাবা-টাবা নেই,

একেবারে সিধে উত্তরাখণ্ড।' কিন্তু নামতে হলে ভাগলপুর, পরে বৈদ্যনাথ শেষে কাশী। এখন আবার গঙ্গাধরের ইচ্ছে অযোধ্যায় থামবে। স্বামীজি 'না' করলেন, তাঁর মন হিমালয়ের জন্যে ব্যাকুল। হিমালয়ের দুর্গম মৌনে একা বসে ধ্যান করবেন এই এখন তাঁর স্বপ্ন।

ট্রেনে উঠে দেখলেন গঙ্গাধরের হাতে দুখানা টিকিট আর দুখানাই অযোধ্যার। গম্ভীর হলেন স্বামীজি। গঙ্গাধরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।

অযোধ্যা স্টেশনে নেমে একায় উঠলেন দুজনে। গঙ্গাধরের জানা জায়গা অযোধ্যা, একাকে বললে, সরযূতীরে লছমনঘাটের কাছে সীতারামের মন্দিরে চলো। মনে বড় সাধ সেখানকার মহান্ত জানকীবর-শরণের সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয়।

সারা রাস্তা কথা কইলেন না স্বামীজি। মন্দিরে পৌঁছে মহান্তকে দেখেও মুখ বুজে রইলেন।

পরদিন সকালে মহান্ত জানকীবরশরণই আলাপ করলেন স্বামীজির সঙ্গে। বৈরাগ্য ও প্রেমের সমাহার, মহান্ত মঠাধীশ হয়েও সাধারণ অভ্যাগতদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে শালপাতায়ই প্রসাদ পান। মঠের বিস্তর আয়, সমস্ত বিষয় ব্যাপার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে আছেন সাধন-ভজন নিয়ে, হরিগতমনপ্রাণ হয়ে।

স্বামীজি মুগ্ধ হলেন মহান্তকে দেখে আর মহান্তও স্বামীজিকে দেখে।

অযোধ্যা ছেড়ে যেতে মন আর চায় না স্বামীজির। কিন্তু হিমালয়ের ডাক বুঝি আরো কঠিন, আরো বিশাল।

'তারি জন্যে তো তোকে এত ভালোবাসি।' অযোধ্যা ছেড়ে উত্তরা-খণ্ডের পথে যেতে ট্রেনে উঠে বলছেন স্বামীজি, 'আর কেউ হলে আমার রাগ দেখে আমাকে আনতই না এখানে। কিন্তু তুই কি জানতিস কী মহৎ সঙ্গ পেলে আমি আনন্দিত হব। তাই জোর খাটাবার অত জোর পেলি। সত্যি, এমন সাধু খুব কম মেলে।'

আলমোড়ার পথে যাচ্ছেন দু'জনে, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দ। স্বামীজি বললেন, 'গ্যাঞ্জেস, তুই হাঁটা পথ দিয়ে যা, আমি বনের মধ্য দিয়ে এগুই।'

'সে কি ?' আপত্তি করতে চাইল গঙ্গাধর।

স্বামীজি আপত্তি অগ্রাহ্য করে চললেন একা-একা। গঙ্গাধর পৃথক হয়ে গেল।

কিন্তু একি, নির্জন বনে স্বামীজি কার সঙ্গে কথা কইছেন? কে তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে চলছে? এ অজানা জায়গায় হঠাৎ তাঁর সাথি মিলল কি করে?

বনে প্রবেশ করল গঙ্গাধর। কতদূর এগিয়ে দেখতে পেল স্থাবরে-প্রস্তরে অজস্র ফুল ফুটেছে। তারই এক পাশে স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছে। একা নয়, তার কাছে কে আরেকজন সহচর। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আছে দুজনে। কে সেই দ্বিতীয়? আর কে! স্বয়ং অদ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

হে প্রভু, তোমার চরণদ্বন্দ্ব সংসারদ্বন্দ্ব থেকে আমাকে নিস্তার করুক তার জন্যে তোমাকে বন্দনা করছি না, না বা গুরুকুম্ভীপাক নরক থেকে ত্রাণ পেতে। রম্যা-রামা-মৃদুতন্নুলতানন্দনবিহারও আমার প্রার্থনীয় নয়। আমার এই শুধু প্রার্থনা, জন্মে জন্মে হৃদয়ভবনে তোমার ভাবনা যেন করতে পারি নিরন্তর।

কোনো ধর্মে-কর্মে আমার মতি নেই, কোনো ঐশ্বর্যে মতি নেই, না বা কোনো কামভোগে। পূর্ব কর্মানুপাতী যা হবার তা হোক। কিন্তু আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আমার শুধু তোমার পদযুগগতা নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

স্বর্গে মর্তে নরকে যেখানেই আমার বাস হোক, হে নরকান্তক, আমার এই কেবল প্রার্থনা, মরণকালেও যেন তোমার সারদাসেবিত-চরণারবিন্দ চিন্তা করতে না ভুলি।

হে পরমসুখকন্দ গোবিন্দ, হে পৃথ্বীভারনাশ মুকুন্দ, হে বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ, তোমার জয় হোক। হে মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গ, হে বিমলবনমাল, হে প্রাণপ্রেষ্ঠ, তোমার জয় হোক। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, হরিচরণস্মরণামৃতের তুল্য সুখতর আর কিছু নেই।

স্বামীজি লণ্ডনে এসে পৌঁছুলেন।

এত ঘৃণা নিয়ে কে আর নেমেছে ঐ বিজেতার দেশে। আর কে এত শ্রদ্ধা নিয়ে ভালোবেসেছে ইংরেজদের।

'এরা বীরের জাত, এরা সত্যিকার ক্ষত্রিয়।' লিখছেন স্বামীজি: 'এদের শিক্ষাই হচ্ছে নিজের আবেগকে গোপন করে রাখা, বাইরে দেখাবার আড়ম্বর না করা। কিন্তু এদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, যতই এদের বাইরের খোলস কঠোর হোক, আছে, আছে এক গভীরাবেগের উৎস। সেখানে কি করে পৌঁছুতে হয় যদি তার কৌশল জানো, তুমি চিরকালের মত তাদের বন্ধু হয়ে যাবে। একটা জিনিস যদি তারা ধরে, কামড়ে ধরে, সিদ্ধ না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। এরা সর্বাপেক্ষা কম ঈর্ষী। নিয়মের প্রতি শৃঙ্খলার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি সশ্রদ্ধ। তাই এরা জগতের উপর প্রভুত্ব করে চলেছে। এদের জয়গান করব না তো কার করব।'

স্টার্ডির বাড়িতে উঠলেন স্বামীজি।

রব উঠল ভারতবর্ষ থেকে এক হিন্দু যোগী এসেছে। চলো শুনে আসি কী বলে তার বেদান্ত! কেন তার মূর্তিপূজা! কী বা তার ধ্যানপদ্ধতি।

হিন্দুর মূর্তিপূজা রোম বা ব্যাবিলনের মূর্তিপূজার মত নয়। হিন্দু মূর্তি-পূজা করে না, সে মূর্তির সামনে বসে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের অনুধ্যান করে। চিন্তা করে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম সমস্ত বিলীন হয়ে গেছে, একমাত্র আমার আত্মা জ্যোতির্ময়ই বর্তমান। চিন্তা করে, সোঽহং, হংসঃ, স্বাহা—সেই ব্রহ্মা আমিই, আমিই সেই ব্রহ্ম শক্তি—সমস্ত বিশ্বের নামরূপ তাতে বিধৃত হয়ে আছে। যে এই পূজায় অসমর্থ, সে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে সচ্চিদানন্দ আমি তোমার যথার্থ ভাবনা করতে পারি না বলেই এই বিশিষ্ট নামজপের মধ্য দিয়ে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমার সহায় হও। আমি জানি আমার নাথই জগন্নাথ, আমারি আত্মাই জগদাত্মা, আমার গুরুই জগদগুরু।

আর ধ্যানপদ্ধতি?

'নরেন খুব উঁচু থাকের—অখণ্ডের ঘর।' বলতেন ঠাকুর,' কেউ দশদল কেউ ষোড়শদল, কেউ শতদল, নরেন সহস্রদল।'

সোজা হয়ে বোসো, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখো। দুই চাক্ষুষ নাড়ীর সংযমে চিত্তবৃত্তির শাসন হবে। তারপর মাথার কিছু উপরে একটি পদ্ম কল্পনা করো। এর কেন্দ্র ধর্ম, বৃন্ত জ্ঞান, দলগুলি অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, কোরক বৈরাগ্য। ঐ কেন্দ্রের উপরে অস্পর্শ, দুর্জয়, জ্যোতির্ময় পুরুষের ধ্যান করো। তার নামই ওঙ্কার।

দিনের বেলায় স্বামীজি শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখেন আর সন্ধ্যায় আগন্তুকদের দর্শন দেন, আর যারা কৌতূহলী বা জিজ্ঞাসু তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। যে দেখে সেই অভিভূত যে শোনে সেই আত্মহারা। ইংলণ্ডে দুজন ভারত-তত্ত্ববিৎ আছেন ম্যাক্স মুলার আর পল ডয়সন। কে জানে তাঁদের সঙ্গেও লড়তে হতে পারে। কে আসবে তাঁর সাহায্যে। যদিও তাঁর পাশে স্টার্ডি আছে আর আছে গুডউইন, মাথার উপরে আছেন রামকৃষ্ণ।

'তুমি কেন সন্ন্যাসী হয়েছ?' একজন জিজ্ঞেস করল স্বামীজিকে: 'কেন ছেড়েছ সংসার?'

'সংসারকে সন্ন্যাস বোঝাতে, আমার প্রভু রামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করতে।'

'কী তোমার রামকৃষ্ণের ভাব?'

'ঈশ্বর অনন্ত তাঁর পথও অনন্ত। অনন্ত মত অনন্ত পথ। যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সত্য। সকল মানুষই ভগবান। আর এই আমাদের বেদান্তের কথা। রামকৃষ্ণ সেই বেদান্ত মূর্তি। বনের বেদান্তকে তিনি ঘরে নিয়ে এসেছেন।'

'কী বলেন তিনি?'

তিনি সবরকম সাধন করেছেন, তারপর সব পথ হেঁটে সব মত ঘেঁটে বলতে পেরেছেন একছাড়া দুই নেই। যাকে শিব বলি সেই কৃষ্ণ, সেই আল্লা। এক ঈশ্বর তার হাজার নাম, হাজার চেহারা, সকলেই এক জিনিসকেই চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। সব চেয়ে বড় কথা, সকলেই আবার এক জিনিস। যাকে চাই সেই আমি নিজে।'

'নতুন রকম কথা বটে।'

'হ্যাঁ, এই এক নতুন বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বৈকতত্ত্ব।' বলছেন স্বামীজি : 'রামকৃষ্ণ বলেন যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী—সকলেই তাঁকে, সেই একজনকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নেই। বিরোধ বিসম্বাদের মানে হয় না। নানা নদী নানা দিক দিয়ে আসে কিন্তু সব নদীর লক্ষ্যই সমুদ্র, সব নদীই মেশে এসে সমুদ্রে।'

'তোমার দলের নাম কী?'

'দল? আমার কোনো দল নেই। আমি কোনো সাম্প্রদায়িক মত চালাতে আসিনি। আমার ভাব বিশ্বজনীন। আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে এই বলতে চাই যে তিনিই সব হয়েছেন, তিনিই চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জল, মাটি, দিক, দেশ—সমস্ত। তিনি নর নারী কুমার কুমারী, তিনিই দণ্ড ধরে চলেছেন স্খলিত পদে, তিনিই দোলনায় দুলেছেন শিশু হয়ে। তিনিই পাখি পতঙ্গ মেঘ বিদ্যুৎ সাগর পর্বত। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই প্রতিচ্ছায়া। সমস্ত মানুষ তাঁরই প্রতিকৃতি। আর এই বলতে চাই মানুষ যখন জানবে সে ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, এই বিশ্বব্যাপী মহিমা তাঁরই মহিমা তখনই সে আনন্দিত। তখনই সে বীতশোক।'

ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পত্রিকার লোক দেখা করতে এসেছিল স্বামীজির সঙ্গে। যাবার সময় বলে গেল : 'এমন সর্বনবীন লোক আর দেখিনি।'

ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর, ভগবান—এ সব কি এদেশে চলে? জোর করে সকলকে ঐ ভাবটা গেলাবার চেষ্টা উচিত নয়। তাতে আমাদেরকে একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করবে। ঐ রকম চেষ্টা থেকে বিমুক্ত থাকবে। তাই বলে কেউ যদি তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে ক্ষতি কী। তোমরা তাকে উৎসাহও দিয়ো না, নিরুৎসাহও কোরো না। জনসাধারণ তো চিরকাল ব্যক্তিই চাইবে, উচ্চতর লোকেরাই ভাবটা গ্রহণ করবে। আমরা দুইই চাই।

কিন্তু জানবে ভাবই সার্বভৌম, ব্যক্তি নয়। সুতরাং তাঁর প্রচারিত ভাবগুলোকে ধরে থাকো। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যার যা খুশি ভাবুক, কিছু আসে যায় না। সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির বিরাম হোক। যে প্রথমে আছে সে সর্বশেষে যাবে, আর যে সর্বশেষে আছে সে প্রথমে যাবে। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ। আমার ভক্তগণের যারা ভক্ত তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

পিকাডেলি, প্রিন্সেস হলএ, স্বামীজির বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। বিষয় আত্মজ্ঞান।

লোকে লোকারণ্য সভা, তার মধ্যে অনেক বিদগ্ধ মনীষী, বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। সেই উন্নতশীর্ষ অপরাভূত পুরুষসিংহ। রণে বনে দারুণে যে অকুতোভয়।

চরম সিদ্ধান্ত এই যে, আমিই সেই এক সত্তা। জগতে একাধিক সত্তা নেই। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হচ্ছে। যেমন দড়িকে সাপ বলে দেখাচ্ছে। এখানে দড়ি আর সাপ দুটো পৃথক বস্তু নেই। সত্য ও মিথ্যা এক সঙ্গে দেখা যায় না। আমরা সর্বদাই এক দেখে থাকি। যখন দড়ি দেখি তখন আর সাপ দেখি না আবার যখন সাপ দেখি তখন দড়ি অন্তর্হিত, যেহেতু আমরা একই দেখি, আমরা তাই জন্ম থেকেই অদ্বৈতবাদী, তা থেকে আর আমাদের পালাবার উপায় নেই। যখন কাউকে দেহরূপে দেখি তখন আমি দেহমাত্র যখন আমার দেহবোধ নেই তখন কাউকে বা শুধু ভাবরূপে অনুভব করি। স্যর হাম্ফি ডেভি সম্বন্ধে গল্পটা জানেন বোধ হয়। তিনি যখন লাফিং গ্যাস পরীক্ষা করছিলেন, একটা নল ফেটে যায়, নিঃশ্বাসে গ্যাস টেনে নিতেই তিনি কয়েক মিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। সে অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন যে সমগ্র জগৎ একটা ভাবসত্তা ছাড়া কিছু নয়। দেহজ্ঞানের বিস্মরণ ঘটাতেই তিনি দেখলেন যাকে তিনি এতদিন শরীর বলে জেনেছিলেন সে শুধু একতাল চিন্তা। তেমনি যখন আমার ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বিস্মরণ ঘটবে দেখতে পাব আমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ— নিত্যবোধ, নিরূপম, নিত্যমুক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম।

বিলিতি কাগজগুলো প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। স্ট্যাণ্ডার্ড লিখল : 'এমনটি আর হয় না। সেই রামমোহন রায়ের সময় থেকে আজ অবধি—অবশ্য এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া—এমনটি আর কেউ দাঁড়ায়নি ইংরেজের সভামঞ্চে। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিলোলুপতাকে নিন্দা করে কী আশ্চর্য বক্তৃতা দিল এই হিন্দু, আর কী দ্বিধাশূন্য মধুর তার কণ্ঠস্বর!'

লণ্ডন ডেলি ক্রনিকেল লিখল : 'হিন্দুযোগী বিবেকানন্দের আননে সেই বুদ্ধের মহিমা। আর কী তার বজ্রঘোষ নিন্দা আমাদের রক্তাক্ত যুদ্ধকে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে, শূন্যগর্ভ অসার সভ্যতাকে।'

'কী শান্ত করুণাস্নাত তার চোখ দুটি!' লিখছে ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট : 'মাঝে মাঝে মুখখানি শিশুর হাসির মত অপার্থিব আলোতে ভরে যায়—এত সরল সহজ আর অকৃত্রিম। আর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষী, কী সুন্দর তাঁকে দেখতে আর কী সুন্দর তাঁর মাথায় পাগড়ি বাঁধা।'

ইংরেজরা এমন করে মেতে উঠবে এ যেন ভাবনার অতীত ছিল।

আর এমনি এক ইংরেজ মেয়ে, লণ্ডনে এক স্কুলের হেডমিসট্রেস, মিস মার্গারেট নোবল ওয়েস্ট এণ্ডের এক ড্রয়িংরুমে প্রথম দেখল স্বামীজিকে।

লেডি ইসাবেল মার্জেসন তাঁর ড্রয়িংরুমে একদিন ডাকলেন হিন্দু যোগীকে, যদি কিছু বলেন অধ্যাত্মসংবাদ। খবরটা কানে গেল মার্গারেটের। যদিও তখন তাঁর আটাশ বছর বয়স, নানা সংশয় ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার জীবন কাটছিল। এক তরুণ ইঞ্জিনিয়রকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে অতর্কিত রোগে মারা গেল। নোবলের মনে জাগল বিচিত্র জিজ্ঞাসা, কোথায় জীবনের সদুত্তর, কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছু সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন সময় মার্জেসনের নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছুল।

'বেশ তো, যাওনা', এক বন্ধু পরামর্শ দিল, 'কতই তো পড়লে আর শুনলে, এবার দেখে এস না এই হিন্দু যোগীকে। কে জানে হয়তো বা পেয়ে যেতে পারো পথ, তোমার রহস্যভেদের কৌশল।'

মন্দ কি, যাইনা। কত জলাশয়ের কাছে গিয়েছি, কত বৃক্ষতলে, শান্তি বা শীতলতা পাইনি, পাইনি পূর্ণতার তৃপ্তি। দেখিনা হিন্দু যোগী কি বলে!

নভেম্বরের এক রবিবারে সন্ধ্যায় সেই ড্রইংরুমের এক কোণে বসল নিবেদিতা। আর দেখল স্বামীজিকে। জাগ্রত ভারতাত্মাকে।

হে ওঙ্কারমূর্তি তোমাকে নমস্কার। হে সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু প্রাণেশ জীবেশ তোমাকে নমস্কার। হে ভস্মভূষিতাঙ্গ ভাস্বর, পাপনাশপরেশ, প্রসন্ন হও। হে নিঃসঙ্গ নিরীহ, জগদ্দীপাকার, শাশ্বত, জগৎসংসৃতি থেকে রক্ষা করো আমাকে।

তুমি ভূমি নও জল নও বহ্নি নও বায়ু নও আকাশ নও, তোমার তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই, দেশ নেই, বেশ নেই, মূর্তি নেই, তুমি ত্র্যক্ষরাত্মক মহেশ্বর, তোমাকে নমস্কার।

হে কলাতীত কল্যাণ ভাসকের ভাসক, প্রকাশকের প্রকাশক, হে তমঃ-পারবর্তী অদ্বৈত, হে চিদানন্দমূর্তি পরমপাবন, তোমাকে নমস্কার। তোমার চেয়ে গণ্য কেউ নেই, মান্য কেউ নেই, বরেণ্য কেউ নেই, শুধু করুণায় এ জগৎকে হনন পালন করো, তোমাকে নমস্কার।

হে জগন্নাথ, মন্মথ, গৌরীনাথ, হে শরণানুকম্পী, বিপন্নার্তিহারী, হে সমস্তৈকবন্ধো, তোমাকে নমস্কার। হে স্মরশত্রু, ত্রিপুরশত্রু, শমনশত্রু, হে অনাথনাথ, হে বরদ তমোহর, সর্বদারিদ্র্যদুঃখদহন, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

৭৩

মাত্র পনের ষোল জন লোক, বেশির ভাগই বিলাসিনী তরুণী জননী, অর্ধবৃত্তাকারে বসেছে। আর তাদের মুখোমুখি বসেছেন স্বামীজি, পিছনে আগুন জ্বলছে চুল্লিতে। নভেম্বরের শীত। কী সুন্দর গেরুয়া পোশাক আর কোমরবন্ধ পরেছেন আর কী জ্যোতিপরিপূর্ণ বিশাল চক্ষু। বিস্ময়-উদ্বেল চোখে তাকিয়ে রইল নিবেদিতা।

একটি ঘরোয়া বৈঠক। বক্তার সংস্পর্শে ঠিক একটি প্রাচ্য পরিবেশ

গড়ে উঠেছে। যেন গ্রামাঞ্চলে কুয়োর ধারে বা গাছের নিচে বসেছে এক আত্মভোলা সাধু আর তাকে ঘিরে গ্রামের একটি নিরীহ প্রাণী জড়ো হয়েছে ঈশ্বরের কথা শুনতে। আত্মভোলা সাধুর মুখে ধ্যানীর তন্ময়তা আর হাসিটি দেখ! যেন শিশুর শুচিতা ও সরলতার ছবি। সেই র‍্যাফেলের আঁকা শিশু-যীশু।

কথা বলছেন স্বামীজি আর নিবেদিতার মনে হচ্ছে যেন কোন দূর দেশের সংবাদ অন্তরঙ্গ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। যেন কোন গোপন কথা শোনাচ্ছে আপন কথার মত। আর বক্তার কী সাহস, থেকে থেকে 'শিব' 'শিব' বলে উঠছে। শ্রোতারা যে ইংরেজ, পরিবেশ যে বিদেশী, লক্ষ্যের মধ্যেই আনছে না। আর এ শুধু একটা শব্দ নয়, যেন মৃতকে উত্থিত করার মন্ত্র। সমস্ত কল্লোলকোলাহলের উর্দ্ধে শাশ্বত শঙ্খস্বর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্যাখ্যা করছেন স্বামীজি। একই বহু হয়েছে, ব্রহ্মই সর্বাত্মক। সর্বব্যাপী বলে আবার বাইরে অবস্থিত। নাত্যেতি কশ্চন। কেউই তাকে অতিক্রম করতে পারে না। রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েও তদতিরিক্ত, অবিকৃত। ব্রহ্ম চৈতন্য দ্বারাই সকলে জ্যোতিষ্মান। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। এই বিশ্ব প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম। দূর হতে সুদূর হয়েও চেতনজীবের হৃদয়গুহাতেই নিহিত। ব্রহ্ম দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। আনন্দ আত্মা। সর্বজীবের অন্তর্যামী হয়েও সর্বতোমুখ। যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট সেই স্বয়ম্প্রকাশকে নমস্কার।

আবার বলছেন, গীতার কথা, ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগনা ইব। একটি নির্লক্ষ্য সুতোকে অবলম্বন করে যেমন মণিমালা গাঁথা হয় তেমনি আমাকে ধরেই এই বিশ্ব ঘুরছে, দুলছে, ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কেমন নতুন বলে মনে হল। তারপর আবার যখন বললেন হিন্দুর মতে শুধু দেহ আর মনই মানুষ নয় তার অন্তরালে রয়েছে এক তৃতীয় বস্তু, আত্মা, যে সমস্ত কিছুর চালক বাহক তখন মার্গারেটের চমক লাগল। এক অগ্নিপিণ্ড থেকে বিচিত্র স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসেছে। এক দুন্দুভিধ্বনি থেকে বিভিন্ন শব্দলহরী। আরো কত কথা যা মার্গারেট কোনদিন শোনেনি। 'মানুষ ভুল থেকে ভুলে অগ্রসর হচ্ছে না, সত্য

থেকে সত্য উন্মোচিত হচ্ছে।' 'কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু তার গণ্ডির মধ্যেই মরা ভালো নয়।'

তারপরে বললেন কাকে বলে ভালোবাসা।

সকলেই নিজেকে, আত্মাকে ভালোবাসে। আমি নিজেকে ভালোবাসি বলেই অন্যকে ভালোবাসি। পরের জন্যে নয় নিজের জন্যেই ভালোবাসা। আত্মাকে ভালোবাসি বলেই সে আমার প্রিয়। অতএব কে সেই আত্মা জানা চাই। আত্মাকে না জেনে ভালোবাসাই স্বার্থপরতা। মনে করুন আমি কোনো স্ত্রীলোককে ভালোবাসছি। যদি আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মা থেকে আলাদা করে, বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করি, তা আর নিত্যস্থায়ী প্রেম হল না। তা স্বার্থপর ভালোবাসা হল যার পরিণাম দুঃখ। কিন্তু আমি যদি সেই স্ত্রীলোককে আত্মারূপে দেখতে পারি তখনই সেই ভালোবাসা যথার্থ প্রেম হল, তাহলে আর তার বিনাশ নেই। তেমনি যদি কোন জাগতিক বস্তুকে আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভালোবাসি তাহলেই প্রতিক্রিয়া। আত্মা ছাড়া যা কিছু আমরা ভালোবাসি তারই ফল শোক আর দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভেবে ও আত্মস্বরূপে সম্ভোগ করি তাহলে কিছু হারাবার নেই। নেই কোনো প্রতিক্রিয়া। আর এরই নাম পূর্ণ আনন্দ।

'ভাবো সে সময়ে যদি স্বামীজি না আসতেন লণ্ডনে।' পরবর্তী কালে চিঠি লিখছে নিবেদিতা : 'তা হলে কী হত ? এ জীবন নিরর্থক হয়ে যেত। আমি জানতাম আমি এক মহত্তম সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। কে যেন বলত, আসবে, আহ্বান আসবে। আর সত্যি সত্যে এল সেই সমুদ্রের ডাক। কোন সংশয় জাগল না, পরম লগ্নকে অনিবার্য বলে চিনতে পারলাম। যদি তিনি না আসতেন! কত সময় গেছে, বুকের মধ্যে জ্বলন্ত আকুতি নিয়ে বসে আছি, কিন্তু প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আর আজ মনে হচ্ছে কথার বুঝি অন্ত নেই। এ জগতে যে কাজের জন্যে ভগবান আমাকে যুক্ত করেছেন, যোগ্য করেছেন, সন্দেহ কী, সেই কাজে আমার প্রয়োজন আছে।'

আর নিবেদিতাকে লিখছেন স্বামীজি :

প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে। আর তা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়া আর সব কাজে এই দেবত্ব বিকাশের পথ নির্ধারণ করে দেওয়া।

জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য। যারা সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাদেরকে চিরদিন বহুজনের সুখ আর হিতের জন্যে আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম আর করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাদের চায় যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত, যারা স্বার্থহীন। সেই প্রেমই প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের মত শক্তিশালী করবে।

তোমার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা পৃথিবী নড়িয়ে দিতে পারে। আর আমি জানি, তোমার মতো আরো অনেকে আসবে। চাই জ্বালাময়ী বাণী আর তার চেয়েও জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। সংসার দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?

এস আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন।

তুমি আমার অশেষ আশীর্বাদ নাও ইতি।

শুভাশীর্বাদক বিবেকানন্দ

দলে দলে লোক আসতে লাগল স্বামীজিকে শুনতে। ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, কথার শক্তি, বাচনভঙ্গির স্পষ্টতা, উদাত্ত মদির কণ্ঠস্বর—সকলকে অপূর্বের আস্বাদ এনে দিল। শুধু তাই নয়, এত বড় উদার ধর্মের উদ্গাতা আর দেখিনি। আর কী দৃঢ়ধৃত পৌরুষ, কী দুশ্ছেদ্য সাহস লোকে বশীভূত না হয়ে করবে কী।

ক্রমে ক্রমে আরো সব গণ্যমান্যদের ভিড়ে ডাক পড়ল স্বামীজির। খবরের কাগজ লুফে নিল। অভিজাতদের মধ্যেও জুটে গেল বন্ধু। ভেবেছিলেন স্বামীজি এবার শুধু ইংলণ্ডের মাটি ছুঁয়ে চলে যাবেন,

দেখলেন একেবারে হৃদয়ের মধ্যস্থানটা ছুঁয়েছেন। ইংরেজ আমেরিকানের মত সহজে মাতে না কিন্তু যদি একবার বোঝে এর মধ্যে পদার্থ আছে তাহলে তাকে আর ছাড়ে না, আঁকড়ে ধরে থাকে। সেই কথাই লণ্ডন থেকে লিখছেন আলাসিঙ্গাকে :

'আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি ইংলণ্ডে আমার কাজের ফল দেখে। ইংরেজ খবরের কাগজে বেশি বকে না, নীরবে কাজ করে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডেই বেশি কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে কিন্তু এত লোকের আমি জায়গা দিই কী করে? বড় বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসছে। শুধু মেয়েরা কেন, আপামর সকলেই। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি, এ ভারতবর্ষের আকাশের নিচে ডালপালা মেলা বিস্তীর্ণ বটগাছ, তার নিচেই সকলে বসে আছে। তারাও এ ভাবটাই পছন্দ করে।

আমি আসছে সপ্তাহে আমেরিকা ফিরে যাব, তাই এরা ভারি দুঃখিত। আমি যদি এত শিগগির চলে যাই, কেউ কেউ ভাবছে, আমার এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোনো কিছুর উপর নির্ভর করি না, একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা। কে কাজ করছে? আমার ভিতর দিয়ে প্রভুই কাজ করছেন।'

ষোলই আর তেইশে নভেম্বর আরো দুটো বক্তৃতায় উপস্থিত হল মার্গারেট। সঙ্গে খাতা পেনসিল নিয়ে গিয়েছিল, টুকে নিল বক্তৃতার সারাংশ। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত মনে অলৌকিক আলোড়ন আনে। বক্তৃতাও তেমনি নিয়ে এল কম্পনস্পন্দন। সেই অনুভূতির আশায় খাতা খুলে পড়তে লাগল বারে বারে।

বক্তৃতার মধ্যে কতবার সন্দেহবাদীর মত 'কেন' আর 'কিন্তু' ছুঁড়ে মেরেছে, কিন্তু নড়াতে পারেনি স্বামীজিকে। মানবে না বলেও মেনে নিয়েছে। কিছুতেই বুঝি খণ্ডন বর্জন করা যায় না। কী নিদারুণ ভালোবাসেন গুরুকে, দেশকে, ঈশ্বরকে। এমন ভালোবাসা দেখিনি, শুনিনি, কোনোখানে। বাণী শুধু পুঁথি থেকে আহরণ করা নয়, নিজের উপলব্ধির থেকে ছেঁকে নেওয়া। তাই এই দুর্ভেদ্য বিশ্বাস এই অনন্য দৃঢ়তা।

মনে মনে আনুগত্য স্বীকার করল মার্গারেট। 'এ আনুগত্য আর কোথাও নয় শুধু তাঁর মহৎ চরিত্রের কাছে।'

তাঁর মহৎ চরিত্র গীতার জ্বলন্ত ভাষ্যে। ইংলণ্ডের ক্লাশে গীতাই শেখাচ্ছেন, তারই তত্ত্বমূর্তি স্বামীজি।

ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, কর্তৃত্বাভিমান নেই, আর আছে ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ। যোগস্থ হয়ে কাজ করো। যোগ কী? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাই যোগ। কর্মের কৌশলই এই যোগ। জল অবিশুদ্ধ বলে জলপান ত্যাগ করা যায় না, কৌশলে জল বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। কামনাই কর্মের অশুদ্ধতার কারণ। যে কামনা ত্যাগ করেছে সেই স্থিতধী।

আর কী উপায়?

অনভিস্নেহ, মমত্বশূন্য থাকো, পেলেও আনন্দিত হয়ো না, না পেলেও অসন্তুষ্ট হয়ো না। দুঃখে নিরুদ্বেগ, সুখে নিস্পৃহ, আসক্তি নেই, ভয়ও নেই, তারই প্রজ্ঞা স্থির। তারই প্রজ্ঞা স্থির যার বিষয়বাসনার নাশ হয়েছে। ঐ স্থিরত্ব পেতে হলে ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করো, ঈশ্বরে সমাহিত হও। এরই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। ঈশ্বরে একনিষ্ঠা।

ষোলই নভেম্বরের বক্তৃতার সারাংশ :

'উপাসনায় প্রতীক আর আচার বিচারের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করাই বিধেয় যেহেতু সেই পথেই আত্মোপলব্ধির গভীরতায় পৌঁছুবার সম্ভাবনা। তাই আমরা বলি : গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মানো ভালো, মরা ভালো নয়। চারাগাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয় বাঁচিয়ে, কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন বেড়াই বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রাচীন পদ্ধতিগুলিকে নিন্দা করে লাভ নেই। কে না জানে ধর্মের জগতেও বর্ধন আছে বিবর্তন আছে।

প্রথমে ব্যক্তিক-ঈশ্বর ভাবনা করি, তাকে স্রষ্টা বলি, বলি সর্বজ্ঞ শক্তিমান। কিন্তু তারপরে যখন প্রেম আসে ঈশ্বর অর্থই প্রেম হয়ে ওঠে। প্রেমিক গ্রাহ্যও করে না ঈশ্বরের স্বরূপ কী, যেহেতু তার কাছে সে কিছু যাচ্ঞা করে না। 'আমি ভিখিরি নই।' এই ভারতের সাধুর

সম্ভাষণ। আর তার ভয় বলতেও কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে তার অগ্রসর হবার চেষ্টা নয়, ঈশ্বরের কাছে তার সরল চলে আসা।

প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত পাঁচ রকম উপায় আছে। শান্ত—ঈশ্বরে পিতৃত্ব আরোপ করে সর্বসমর্পণ। দাস্য—ঈশ্বরে সেবা, অনুগতি, তার হাত থেকে পুরস্কার-তিরস্কার নেওয়া। বাৎসল্য—ঈশ্বরকে মা বা শিশু বলে মনে করা। ভারতবর্ষে মা কখনো তার শিশুকে তাড়ন তর্জন করে না। সখ্য—ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবা, সমান ভাবা, একসঙ্গে খেলাধুলো করার সহচর ভাবা। তারপরে মধুর ভাবা—ঈশ্বরকে স্বামী বা স্ত্রী ভাবা। টেরেসা ও দিব্যভাবময় সাধুরা এর উদাহরণ। পার্শীদের মধ্যে ঈশ্বরকে স্ত্রী ও হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বামী বলে আরাধনাই বেশি প্রচলিত। আমাদের রানী মীরাবাঈকে মনে করুন, তার কাছে ঈশ্বর স্বামী, দৈবত স্বামী।

এই মধুর ভাব থেকে অনেক অপচার ঘটেছে, কিন্তু এ ভাবের কত সাধু মহত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে নেই অপচার? ভিক্ষুক আছে বলে কি তুমি রান্নাই করবে না? চোর আছে বলে কি কোনো জিনিসই রাখবে না তোমার দখলে? 'হে প্রিয়তম তোমার ওষ্ঠাধরের একটি চুম্বন আস্বাদ করেই আমি পাগল হয়েছি।'

এই মধুর ভাবের ফল হচ্ছে এই উপাসক কোনো সম্প্রদায় মানবে না, সইবে না সে কোনো আদেশবিধির কড়াকাড়ি। ভারতীয় ধর্মের পরিণাম স্বাধীনতায়। এও বাহ্য যখন সমস্তই প্রেম, প্রেমের জন্যেই প্রেম, আর কোনো লাভক্ষতির জন্যে নয়।

প্রেমকে বর্ণনা করেছে সাধু: চারচোখে মিলন হোল। দুই প্রাণে অদল বদল হয়ে গেল। এখন বলতে পারছি না সে পুরুষ কিনা কিংবা আমি মেয়ে কিনা, কিংবা সে মেয়ে আমি পুরুষ। এই শুধু মনে আছে, শুধু দুই প্রাণ। কিন্তু প্রেম যখন এল তখন দুই প্রাণ এক হয়ে গেল।

ঝিনুক বালিকেই মুক্তো করে। তেমনি প্রেম মানুষকেই ঈশ্বর করে তোলে। এই প্রেমে কিছু নেওয়া নেই কেবল দেওয়া। কাকে দিচ্ছি তা দেখবার দরকার নেই, দিচ্ছি, দিতে যে পারছি, এতেই আমি

কৃতার্থ। বলবে এমন ভাবে মানুষকে ভালোবাসা অসম্ভব, কিন্তু এমন ভাবে ভালোবাসা যায় ঈশ্বরকে, একমাত্র ঈশ্বরকে। আমাদের ছেলেরা রাস্তায় পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যদি ঈশ্বরের নাম ধরে, অপরাধ হয় না। আমরা বলি, আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়বেই, তেমনি যে ভাবে হোক ঈশ্বরের নাম করলে হতেই হবে সুফল।

প্রেমের তিন কোণ : এক—প্রেম কিছু প্রার্থনা করে না। দুই—প্রেম ভয়শূন্য তিন—প্রেম সব সময়েই আদর্শতমের উপাসনা।

কে বাঁচত, কে নিশ্বাস ফেলতে পারত, যদি না ঈশ্বর তাঁর প্রেমে এই চরাচর বিশ্ব পরিপূর্ণ করে রাখতেন!

নিজের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত করো, মৌমাছি নিজের থেকে ছুটে আসবে। আগে নিজেকে বিশ্বাস করো পরে ঈশ্বরকে। হৃদয়, মস্তিষ্ক আর বাহু এই তিন নিয়ে মানুষ। অনুভব করবার জন্যে হৃদয়, উদ্ভাবন করবার জন্যে মস্তিষ্ক আর সম্পাদন করবার জন্যে বাহু। হৃদয় আর মস্তিষ্কে যদি বিরোধ হয় হৃদয়কে অনুসরণ করো।

তোমার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব, যেমন অণুর মধ্যেই সমস্ত শক্তি। কাজ করো কিন্তু মনে রেখো তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরই কাজ করছেন।

আগে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এখন সহযোগিতাই বিশ্বনীতি। কাল দেখবে কোনো নীতি নেই—একমাত্র তুমি। নিন্দা স্তুতি শুনো না, সম্পদ-দারিদ্র্য দেখো না, ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ো না, শুধু নিজেকে অনুসরণ কোরো।'

আর তেইশে নভেম্বর বললেন, আরো অনেক কথার মধ্যে :

'পাওহারী বাবা চোরের পিছু ছুটল পুঁটলি নিয়ে তাকে ধরে তার পায়ে পড়ে বললে, প্রভু তোমাকে চিনতে পারিনি, আমার যা কিছু আছে সব তুমি নাও, আমাকে তোমার সেবা করতে দাও। আর এই সাধুকেই যখন বিষধর সাপে কামড়াল, আর সন্ধের দিকে সাধু যখন জ্ঞান ফিরে পেল, বললে, আমার প্রিয়তমের দূত এসেছিল।

অনন্তে যদি সরলরেখা নিক্ষেপ করো সেটা শেষ পর্যন্ত এক বৃত্ত রচনা করবে। ঈশ্বর সন্ধান তেমনি ফিরে আসবে আত্মসন্ধানে। ঈশ্বর

নামক যে সমগ্র রহস্ত সে আমি। প্রভাতে সূর্য যেমন একটা লাল থালা তেমনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিভ্রান্তি। বিকৃত দেখা মানেই দৃষ্টি বিকৃত। পৃথিবীতে যে পাপ আর নীচাশয়তা দেখে সে নিজের দুর্বলতাকেই দেখে। ভালোকে বিকৃত করে দেখার নাম মিথ্যে।

কেন মানুষ সৎ হবে, পবিত্র হবে? শুধু শক্তিমান হবার জন্যে। যা সকলকে বলশালী করে তাই সৎ। যা তা না করে তাই অসৎ।

এই পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ আর যীশুর ইতিহাস। যারা নিরাসক্ত নিরাকুল তারাই মহৎ কর্মের অধিকারী। দরিদ্রদের বস্তির মধ্যে যীশুকে কল্পনা করো। দারিদ্র্যের বাইরে সে তাকাতে জানে। সে বলে তোমরা আমার ভাই, তোমরা ঈশ্বরের।

মায়ার জগৎ পেরিয়ে চলো। শরীর হচ্ছে রথ, আত্মা আরোহী, বহিরিন্দ্রিয়গুলি ঘোড়া আর অন্তরিন্দ্রিয়ই সারথি। মায়ার জগতের বাইরেই ঈশ্বর দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশে ততক্ষণ মানুষ মর্তের। যখন ইন্দ্রিয় তার বশে তখনই সে ত্যাগী, ঈশ্বরাভিমুখী।

যুদ্ধ অনেক ভালো, ক্ষমার অর্থ যদি দৌর্বল্য হয়। যখন জয় করতলগত তখনই ক্ষমার মর্যাদা। তুমি কি জ্ঞানী? তুমি কাপুরুষ। এই কথাই অর্জুনকে বলেছিল কৃষ্ণ। জীবন যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়। ত্যাগের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যে সঙ্কল্প, জীবনকে তারই উচ্চারণ করে তোলো। জলের মধ্যে থেকেও পদ্মপাতায় যেমন জল লাগে না তেমনি করে থাকো পৃথিবীতে।

আনন্দ, আনন্দই লক্ষ্য। বৈরস্য-বৈরাগ্য অর্থহীন। প্রার্থনা করার চেয়েও উচ্চহাস্য মহত্তর। হাসো, গান গাও। বিষাদ খেদ উড়িয়ে দাও, নস্যাৎ করো। অন্যকে তোমার মালিন্যে সংস্পৃষ্ট কোরো না। ভেবো না ঈশ্বর দোকানদারের মত ঠোঙায় করে সুখ-দুঃখ বেচতে বসেছেন। কে বলে অল্প সুখ ও অল্প দুঃখ নিয়ে কারবার মানুষের। অনন্ত সুখ অনন্ত বৈভব। পাহাড়ের চূড়ায় এসে ওঠো যদি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চাও। ঈশ্বরই একমাত্র উপভোগ।

পবিত্র হও। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে অসত্যকে খেদিয়ে দাও।

দেখ চেয়ে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। একবার মনে করো তুমিই ঈশ্বর, দেখ তোমার কী শান্তি কী সুখ। আর যদি মনে করো তুমি ঈশ্বর নও, দেখবে তোমার কত ভয়! তুমি দুর্বল বলেই তোমার নিন্দক তোমার ঘাতকের মধে৷ ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছ না, তাই তোমার যন্ত্রণা। গরিবের যদি কখনো কোনো উপকার করে থাকো, জানবে তুমিই ধন্য, ঈশ্বরই কৃপা করে তোমাকে দয়ালু করে তাঁর সেবা করবার সুযোগ দিচ্ছেন।

কোনো আচার অনুষ্ঠান বা বিধিনিষেধ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। মানুষের মধ্যে যদি এই দেবত্ব না থাকত তাহলে পৃথিবী এতদিনে ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও অনুতাপের কোলাহলে পাগল হয়ে যেত।

কিছুই থাকবে না কিছুই যাবে না। সকলেই পূর্ণতম হবে। কে বলে তুমি শরীরী? শরীর কুসংস্কার। তুমিই একমাত্র ঈশ্বরচেতনা। সেই চেতনা সকলকে দিয়ে বেড়াও, অজ্ঞানীকে, দরিদ্রকে, পদদলিতকে, নির্যাতিতকে। ধর্ম বিদ্যা নয় ধর্ম উপলব্ধি। যার বিদ্যা নেই সেও শুধু ভক্তি দ্বারা কর্ম দ্বারা প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরে এসে পৌঁছুতে পারে।'

তাই শুধু কাজ করো, কাজ করো।

কাজ করা কেন? পরের হিত ও নিজের মুক্তি এরই জন্যে কর্মধর্ম।

রাজা রন্তিদেবের কথা মনে করো। আটচল্লিশ দিন উপবাসের পর শেষ পানীয়টুকু খাবে এক আর্ত চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু প্রার্থনা করল। রন্তিদেব তা দিয়ে দিল অকাতরে। বললে, আমি ঈশ্বর সন্নিধানে অষ্টসিদ্ধিযুতা গতি বা মুক্তির কামনা করিনা। আমার প্রার্থনা এই, আমি যেন অন্তঃস্থিত হয়ে সমস্ত দেহীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, আমার থেকেই যেন সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। এই আর্ত জীবনধারণের বাসনা করছে। জীবিতকামী এই আর্তজীবের জীবন রক্ষার জন্য জলার্পণ করলেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি কাতর্য বিষাদ ও মোহ সমস্তই অপসৃত হবে।

রন্তিদেব ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কোনো ফলের প্রতীক্ষা না করে চিত্তকে ঈশ্বরাবলম্বী করল। চকিতে গুণময়ী মায়া স্বপ্নবৎ বিলীন হয়ে গেল।

এই ভারতের সনাতন ধর্ম।

এই সনাতন ধর্মের কথা নারদ বলছে যুধিষ্ঠিরকে। যে ধর্মদ্বারা মনের প্রসন্নতা হয় তাই সমস্ত ধর্মের মূল। সত্য দয়া তপস্যা শৌচ তিতিক্ষা সদসৎবিচার শম দম অহিংসা ব্রহ্মচর্য দান স্বাধ্যায় আর্জব সন্তোষ সেবা নিবৃত্তি নিষ্ফলতাজ্ঞান, দেহে অনাত্মবুদ্ধি আর মানুষে মানুষে সর্বভূতে দেবতাবুদ্ধি। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ ও কীর্তন, তাঁর সেবা অর্চনা প্রণাম ও দাস্য, তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা ও তাঁতে আত্মসমর্পণ। এ সবই পরম ধর্ম। এ ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করো। তারপর ক্রমে ক্রমে, কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ হলে অগ্নি যেমন শান্ত হয়, সর্বকর্ম থেকে বিরত হয়ে নির্গুণত্ব লাভ করবে।

জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। যে তাকে মানুষ মনে করে তার সকল শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের মত নিরর্থক। যে চিত্তবিজয়ে যত্নবান সে নিঃসঙ্গ ও অপরিগ্রহ হবে। পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর ও সমতল আসন স্থাপন করে ঋজুকায় হয়ে বসবে এবং ওম্ এই প্রণব উচ্চারণ করবে। পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও আপন বায়ুকে নিরুদ্ধ করবে আর নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখবে যে পর্যন্ত না মন সকল কামনা পরিত্যাগ করে। তারপর কামহত ভ্রমণশীল মনকে হৃদয়মধ্যে কুড়িয়ে এনে বন্দী করে রাখবে। যে নিরন্তর এ প্রকার অভ্যাস করে তার চিত্ত অল্পকাল মধ্যেই কাষ্ঠহীন অগ্নির মত নির্বাণ ব শান্তিপ্রাপ্ত হয়। যে মন কামনা দ্বারা অক্ষুব্ধ তা আর বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্মসুখসংস্পৃষ্ট হওয়াতে তার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হয়ে যায়। যে অচ্যুত-বিচ্যুত তাকে তার শরীর-রথের ইন্দ্রিয়-অশ্ব বিপথে নিয়ে বিষয়-দস্যু মধ্যে মৃত্যুময় সংসাররূপে নিক্ষেপ করে। প্রবৃত্তিতে পুনরাবৃত্তি, নিবৃত্তিতে বন্ধনমুক্তি। প্রবৃত্তিতে পিতৃযান, নিবৃত্তিতে দেবযান। কৈবল্যনির্বাণদাতা ব্রহ্মাই একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র লভ্য একমাত্র অন্বেষণীয়। আর, ভগবান ভক্তাধীন—মৌন ভক্তি আর উপশম দ্বারাই তিনি সুপ্রসন্ন।

সাতাশে নভেম্বর স্বামীজি ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকা। আবার আসবেন ইংলণ্ডে। আবার আসবেন।

যা কিছু অদৃশ্য তাও পূর্ণ। যা কিছু দৃশ্য তাও পূর্ণ। পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উৎপত্তি। পূর্ণ হতে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই বর্তমান থাকে।

আমরা যেন কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় বাক্য শ্রবণ করি। যজ্ঞকর্মে সমর্থ হয়ে যেন নেত্রদ্বারা সর্বশুভ দর্শন করি। স্থির অঙ্গে স্তুতিশীল আমরা দেবোপাসনার জন্যে যেন হিতকর আয়ু ভোগ করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আমাদের ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীপ্রমথনাথ বসুকৃত স্বামী বিবেকানন্দ

মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী

সরলাবালা সরকার লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

The Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)

The Master as I saw him by Sister Nivedita

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থপরিচয়

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকৃত স্বামীশিষ্যসংবাদ